উৎসর্গ

আমার অন্তরে বসি
কবিতা রচনা
করিছেন যিনি—
তাঁর শ্রীচরণে
উৎসর্গ হইল মোর
"কাব্যতরী"-খানি!

প্রকাশকের নিবেদন

গত বছরের মাঝামাঝি কঠিন রোগভোগের ফলে এবং চিকিৎসা বিভ্রাটে আমার মায়ের শরীরের অবস্থা খুবই খারাপ হয়ে পড়ে। ডাক্তারদের কথায় বুঝতে পেরেছিলাম যে এবার হয় তো মা আর হাসপাতাল থেকে ফিরে আসবেন না। তাই সেই ভাবে মনকে তৈরি করে নিয়েছিলাম। অসহ্য শারীরিক কষ্টের মধ্যে মা-ও এই কথাটা মনে মনে বুঝেছিলেন। তাই তিনি আমাকে ডেকে বলতেন যে আমিই তাঁর একমাত্র মায়ার বন্ধন এবং আমি সেই বন্ধন কেটে না-দিলে তিনি শরীর ছেড়ে যেতে পারছেন না— আমি যেন তাঁর সেই বন্ধন মুক্ত করে দিই। মনের কষ্ট মনে চেপে তাঁকে শান্ত করলাম আর সেইদিনই শ্রীশ্রীবাবাঠাকুরকে মায়ের অবস্থা জানাবার সময় আমি তাঁকে বললাম, "মা হয়তো থাকবে না, তুমি মাকে দেখো"। তার উত্তরে তিনি বললেন, "সে তো হল, তুমি কিন্তু তোমার দিক থেকে সব চেষ্টা চালিয়ে যাও।"

এর পরে মায়ের প্রবল ইচ্ছায় আমি ডাক্তারকে অনুরোধ করে হাসপাতাল থেকে অসুস্থ অবস্থাতেই মাকে বাড়িতে নিয়ে আসি। যে দিন সন্ধ্যায় মা বাড়িতে এলেন সে দিন রাতেই স্বল্প-পরিচিত ডাক্তার দেবাশিস্ রায়কে ফোনে ডাকা হলে তিনি রাত এগারটার সময় ঠিকানা ধরে বাড়ি খুঁজে এসে মাকে দেখলেন, ওষুধ বদলে দিলেন। নূতন চিকিৎসায় দুই দিন পর থেকে মায়ের রোগযন্ত্রণা কমতে থাকল এবং অল্প কিছু দিনের মধ্যে তিনি সেরে উঠলেন। আরও কিছুকাল পরে আমরা লক্ষ্য করলাম যে মা ছোট ছোট কবিতা রচনা করতে শুরু করেছেন। এই পরিবর্তনে আমরা খুব খুশি হলাম, অবাকও হলাম। মায়ের ৭৬ বৎসরের জীবনে ইতিপূর্বে মা মাত্র দুটি কবিতা লিখেছেন তাও প্রায় ষাট বছর আগে।

তাঁর কবিতা লেখা ক্রমেই বেড়ে চলল এবং মাত্র আট মাস সময়ে ২৯৮টি কবিতা রচনা করে মায়ের কবিতা লেখা থামল। আমার মনে হয়েছে যে মায়ের মৃত্যুর মুখ থেকে ফিরে আসা এবং তার পরেই তাঁর মধ্যে দিয়ে বিভিন্ন ভাবের এত কবিতা এত অল্প সময়ের মধ্যে নেমে আসা এবং তার পরে সেই কাব্যস্ফূর্তির বেগ যেমন হঠাৎই এসেছিল তেমন হঠাৎই স্তব্ধ হয়ে যাওয়া—এই সমস্ত ঘটনাই আমাদের প্রতি শ্রীশ্রীবাবাঠাকুরের অহেতুক করুণারই প্রকাশ। তাই মহতের অহেতুক এই করুণার প্রতি আন্তরিক কৃতজ্ঞতা নিবেদনের জন্য সেই সঙ্গে মায়ের রচিত কবিতাগুলিকে স্থায়িত্ব ও কাব্যগ্রন্থের মর্যাদা দেবার জন্য আমি এই গ্রন্থ প্রকাশনার কাজে ব্রতী হয়েছি।

এই পুস্তক প্রকাশনার ব্যাপারে শ্রদ্ধেয় শ্রীমুরারি সাহা এবং পি. এম. বাক্‌চি অ্যান্ড কোম্পানির কর্ণধার শ্রদ্ধেয় শ্রীজয়ন্ত বাক্‌চির উপদেশ ও সাহায্য কৃতজ্ঞতার সঙ্গে স্মরণ করি।

যদি কখনও কেউ এই কাব্যগ্রন্থ পাঠে আনন্দলাভ করেন, মহতের অনুভূতি লাভে তার মন ভরে যায়, তবে আমি কৃতার্থ হব।

"জয় গুরু জয় মা"

শান্তনু দাস

বিষয়সূচী

শ্রীরামকৃষ্ণ

জয় জয় রামকৃষ্ণ যুগ-অবতার—
জয় মা সারদামণি অর্ধাঙ্গিনী তাঁর।
স্থাপিয়া যুগল মূর্তি হৃদি-পদ্মাসনে—
পূজিব দিবস-নিশি একনিষ্ঠ মনে।
কৃপা করি দেহ দেখা এ-জীবনে মম
পূর্ণ হোক মনস্কাম, সার্থক জীবন!

জীবনের ধ্রুবতারা

মোর জীবনের ধ্রুবতারা তুমি—
হে রামকৃষ্ণ, সারদা-জননী,
পথহারা আর হবো না।
জয় জয় মাতা, জয় পিতা জয়,
এ-জীবন যেন ব্যর্থ না হয়—
কৃপাহীন মোরে কোরো না।
নিয়েছি শরণ জীবনে-মরণে
অবিরাম তব নাম জপি মনে—
দেখা দিতে মোরে ভুলো না।
এই বিশ্বাস আছে মোর মনে
দেখা পাবো তব অন্তিম ক্ষণে—
কৃপা-বঞ্চিত হবো না।
সুখ-দুঃখ যেন সমভাবে সহি
তব দান জেনে নতশিরে বহি।
সকলি তোমার করুণা!
জেনেছি তোমারে ওগো দয়াময়—
এই আশ্বাসে হৃদি ভরে রয়।
আর কিছু আমি চাহি না।

জীবন সরণি

চলেছে অনন্ত যাত্রী দীর্ঘ পথ বাহি
সম্মুখের পানে—
জন্মক্ষণ হতে শুরু এ-চলার শেষ কোথা,
কেহ নাহি জানে।
ঊর্ধ্বে রবি-শশী-তারা নিঃসীম আকাশে—
চাহিছে নীরবে।
নিম্নে ধরা সে-চলার গতি
দেহে অনুভবে।
জীবন সরণি বাহি এ-চলার মাঝে
কোথায় পড়িবে যতি কাহার জীবনে—
কাল তাহা জানে।
কালের চরণধ্বনি শুনেছে যে-জন—
তার মন ঊর্ধ্বপানে চলে
জগৎপতির পদতলে।
যাহারা অক্ষম শুনিতে সে-ধ্বনি,
করে হানাহানি তুচ্ছ স্বার্থ লয়ে—
দেবতা চাহেন ফিরি তাহাদের পানে,
ক্ষণে ক্ষণে আসেন নামিয়া
তরিতে তাদের, ধরিয়া মানব-দেহ।
যুগে যুগে তাই অবতার-রূপে মোরা
শ্রীপ্রভুরে পাই!
প্রভুর কল্যাণ-মূর্তি এই ধরাধামে
চিরদিন নামে।
দুর্বল মানব প্রতি এই কৃপা তাঁর—
নহে ভুলিবার!

স্মৃতি-মুকুর

'রামকৃষ্ণ' এই নামে
এসেছিল ধরাধামে
কেবা সেই যুগ অবতার?
নাহি জানি পরিচয়
তবুও আকাঙ্ক্ষা হয়
পূজিবারে চরণ তাঁহার।
অপূর্ব জীবন-কথা
শুনিবারে ব্যাকুলতা
জাগে হৃদিমাঝে অনিবার,
আকুল হৃদয়-মনে
খুঁজে ফিরি সেই স্থানে—
যেথা ছিল লীলাভূমি তাঁর।
কামারপুকুর গ্রামে
তাঁর শুভ জন্মদিনে
দরশন করি ঘুরিফিরি—
স্মৃতির মুকুরখানি
সুমুখে টানিয়া আনি—
মন চলে দৃশ্যপট ঘিরি।
যুগীদের শিবতলা,
শিক্ষাস্থান পাঠশালা,
দরশন করিয়া অবধি—
দেখিনু আনুড় গ্রাম
সেই পুণ্য পীঠস্থান—
যেথা হোল প্রথম সমাধি।
ধীরে দিবা অবসানে
ফিরে আসি পূর্ণপ্রাণে
দিব্য এক শান্তিময় চিতে।
মনে ওঠে বারবার—
পেয়েছি কৃপা তাঁহার,
ধন্য আমি ধন্য এ-জগতে।

জগৎপতি

খেলিছ আপন মনে আপনার সনে
হে জগৎপতি।
সৃষ্টি-স্থিতি-প্রলয়ের খেলা
নাহি তার যতি।
চন্দ্র-সূর্য-গ্রহ-তারা আবর্তিছে
চরণে তোমার—
সে-বিরাট খেলা ভাঙিছ গড়িছ তুমি
শতশত বার।
কোথা সে-লীলার শুরু কোথা তার শেষ
জানে না মানব।
শুধু নিজ জীবনের সীমা মাত্র
করে অনুভব।
এই সীমানার মাঝে আপনি জুড়েছে খেলা—
সংসারীর সাজে।
সীমিত জীবনে তার বাসনা তরঙ্গ-রূপে
ওঠে বার বার।
(তাই) জন্ম হতে জন্মান্তরে আসে ফিরে ফিরে—
সে-বাসনা পূর্ণ করিবারে
নব নব কলেবরে।
সেই সব জনমে আবার কর্মফল ওঠে জমে—
শেষ নাহি তার।
জগতের পিতা নিজে খেলিছেন খেলা
সারা বেলা।
মহাশক্তি-রূপে তিনি খেলেন আপনি
সেই খেলা।
জীবের মাঝারে অবিরত, সে-শক্তি চেতনারূপে
হয় প্রকাশিত।
সৃষ্টির রহস্য খোঁজে মানবের মন, অনুক্ষণ।
যখন বুঝিতে পারে—
কোন মহাশক্তি এক সৃষ্টির কারণ,
তখন সে-মহাশক্তি লভিবার তরে
সাধনা সে করে।
যুগ যুগ পরে,
তার সাধনার বিরতি নামিয়া আসে

যখন সে নিজের মাঝারে অনুভব করে—
যে-বিপুল মহাশক্তি বিরাজিছে সর্বব্যাপী
চেতনার রূপে,
তিনিই জগৎপতি!
তাঁর অনুভূতি জীবনের পরম পাওয়া।
ঘুচে যায় সব চাওয়া, চিরশান্তি নেমে আসে প্রাণে!

যুগ অবতার

সরযূর তীরে শ্রীরামচন্দ্র এসেছিল ক্ষিতি করিতে ধন্য
ত্রেতাযুগ অবতার।
যমুনার কূলে হেরি শ্রীকৃষ্ণে দ্বাপর-লীলা যাঁহার।
কুরুক্ষেত্র প্রান্তর মাঝে
হরিলেন ধরাভার।
ভাগীরথী-কূল করিয়া উজল এলো কে জীব-তারণ।
কলির পাপ-মোচন!
ত্রেতা-দ্বাপরের যুগ অবতার
একদেহে এবে এলো কি আবার
কলির কালিমা মুছাতে?
কলি-তমোঘোরে ডুবে আছে যারা
দানিতে তাদের পথের ইসারা
সংসার-জ্বালা ঘুচাতে?
যন্ত্র করিয়া প্রধান শিষ্যে
অমৃত-বার্তা ছড়ালো বিশ্বে
কলির তমোহরণ।
সত্যযুগের করিতে সূচনা,
নবীন জগৎ করিতে রচনা—
আগমন তাঁর বিশ্বে।

সার্থকতা

কাঞ্চনবরন সুন্দর গড়ন
তব রূপে কর মনেরে হরণ,
মধুকর যত করে অবিরত
মধুলোভে বিচরণ।
ক্ষণে ক্ষণ।
নামগোত্রহীন কুসুম তোমারে
রূপ লাগি সবে সমাদর করে,
আহরণ করে দেবতার তরে
করিয়া অতি যতন।
যবে পায় দরশন!
অজানা কুসুম পরিচয়হীন।
কী ভয় তোমার, নহ তুমি দীন,
পেয়েছ শরণ চরণে যাঁহার
পায় তাহা কোন জন?
ধন্য তব জীবন!

কাঞ্চন ফুল

শ্বেতবর্ণ পুষ্প এক,
নামেতে 'কাঞ্চন'—
নাহি বুঝি ইহার কারণ।
কানাপুত্র নাম ধরে
পদ্মলোচন—
এ-ও কি তেমন?
কে দিয়েছে এই নাম?
কবে কোথা হতে?
জন্মের আদিতে?
সেই কাল হতে
বহিতেছে এই নাম—
দ্বিধাহীন চিতে।

ভাবে বুঝি মনে—
নামেতে কি আসে যায়
পুষ্পের জীবনে?
দেবতার পূজা-তরে
এ-জীবন তার—
দেবতা-চরণস্পর্শ
শেষ উপহার।

মিতারানী

তুমি মিতা, কলির সীতা—
আমি তেমার পিসী,
তোমায় ভালোবাসি।
করছো সেবা গুরুজনে
মিতা, তুমি হৃষ্টমনে—
দেখে আমি হাসি।
তোমায় ভালোবাসি।
মিতা, তোমার নেই তুলনা—
নিত্যকর্ম তাই ভুল না।
জেনে আমি খুশি।
তোমায় ভালোবাসি।
সন্ধ্যাবেলা পূজার ঘরে
দেবতারে তোমার তরে—
ডাকতে আমি বসি।
তোমায় ভালোবাসি।

কুসুম

কুসুমের জীবনের ব্যাপ্তি একদিন—
কিংবা শুধু একটি প্রহর,
তবু তার জীবন সুন্দর।
জন্ম তার সুন্দরের পূজার লাগিয়া—
নাহি চাহে হিয়া
অন্য কোন প্রয়োজন আর।
জীবন-ব্যাপিয়া চলেছে সাধনা—
দেবতার চরণ-বন্দনা।
সার্থক তাহার আরাধনা।

আকাশ

আকাশ, তোমার সীমানা কোথায়?
ভাবি আমি দিনে রাতে—
বিস্ময়-ভরা চিতে।
'অসীম' কথার নাই অনুভূতি
ভাবনার তাই হয় না বিরতি—
ব্যাকুলতা বাড়ে নিতি।
চাহিয়া চাহিয়া সন্ধ্যা-গগনে,
কোথা তার শেষ, ভাবি একমনে—
আকুল পরানে।
সাগর-পাহাড়-প্রান্তর ভরা
বিপুল প্রসার এ-বসুন্ধরা
সীমানার মাঝে দিয়েছে ধরা।
কোটি কোটি গ্রহ-তারকা লইয়া
যুগ যুগ ধরে চলেছে ধাইয়া—
সৌরজগৎ দৃষ্টির শেষে চলিয়া।
ক্লান্ত হৃদয়ে ব্যাকুলতা আর রয় না—
প্রাণের মাঝারে অনুভব করে
আকাশের সীমা হয় না।

মেঘ

আকাশ জুড়ে মেঘেরা সব
চলছে ভেসে ভেসে—
অজানা কোন দেশে।
খেয়ালী সেই মনে
রূপ যে তাদের হচ্ছে বদল
প্রতি ক্ষণে ক্ষণে।
বৃষ্টি দিয়ে শ্যামলিমা
জাগায় ধরার বুকে—
নিত্য মনের সুখে।
বৃষ্টিধারার গানে
অতীত দিনের মধুর স্মৃতি—
জেগে ওঠে প্রাণে।
দিনের শেষে সন্ধ্যা যখন আসে—
মেঘেরা কি দল বেঁধে সব
ফিরে নিজের দেশে?

সত্যের পূজারী

সত্যের পূজারী রূপে,
হে তারাচরণ, দিয়েছিলে দরশন
আমার জীবনে, শৈশবের দিনে।
আজি জীবনের শেষক্ষণে
পড়িতেছে মনে পুরাতন সেই দিনে।
যেথা ভকতের গৃহে ছিলে তুমি,
ভকতের লাগি সংসার বিরাগী।
ওগো, সত্যের পূজারী,
সত্যেরে করিয়া ধ্রুবতারা
পেয়েছিলে আলোর ইসারা।

সত্যের সন্ধানে ফিরি
মন্দিরের দেবীমূর্তি মাঝে,
দেখিলে তা হৃদয়ের
গহনে বিরাজে।
ধোয়ালে চরণ তাঁর
বিগলিত অশ্রুধারা দিয়ে।
চিরশান্তি নেমে এলো
তোমার হৃদয়ে।

সত্য

আশৈশব মোর মন জানে,
সত্যেরে পূজিব সযতনে।
মোর জীবনের ধ্রুবতারা—
সত্যেরে হবো না কভু হারা।
মিথ্যা যেন পশিতে না পায়
মোর জীবনের আঙিনায়।
সত্যরক্ষা করিবার তরে
প্রাণবলি দিব অকাতরে।
জীবনের অন্তিম লগনে—
প্রণাম রাখিয়া যাব
সত্যের চরণে।

আশিস

মিতা, তোমার মুখখানি মোর
পড়েছে মনে বারে বারে—
ঘুরে ফিরে।
শুধু, তিনটি দিনের তরে
ছিলেম তোমার ঘরে
সমাদরে।
নিলে আমায় আপন করে
তোমার সেবা দিয়ে—
অকাতরে।
মিষ্টি তোমার স্বভাবখানা
সরলতায় ভরা
প্রাণকে পাগল করা।
সারাটা দিন প্রাণপণে
করলে সেবা হৃষ্টমনে
সযতনে।
তোমার মধুর স্বভাব দেখে
ভাবি আমি এলো একে
পুত্রবধূ রূপে?
ভাগ্য আমার ভাল যে তাই
তোমা হেন বধুরে পাই,
আপন জনার রূপে।
বিধি, তোমায় এই মিনতি
জানাই আমি দিবারাতি—
আশিস দিও তারে,
সারা জীবন ভরে।

ভোট

(৩রা অক্টোবর, ১৯৯৯)

ভোট ভোট ভোট।
সকাল হতে পথে পথে চলছে জনস্রোত।
ভোট ভোট ভোট।
একই ভাবনা সবার মনে
কাকে দেবো ভোট?
গদি পাওয়ার পরে
সবাই যে, হায়,
মুখোশ বদল করে।
আগে যারা দিচ্ছে আশা
তাদের কথায় নেই ভরসা,
মনে লাগে চোট।
ভোট ভোট ভোট।
এমন পোড়া দেশে প্রকাশ্য দিবসে,
ভোটের নামে চলছে চুরি
ভদ্র সাধু বেশে।
ভাবনা আসে তাই ভোট দিয়ে কাজ নাই।
মিথ্যা খেলার পিছু পিছু
কেন ছুট্‌তে যাই?

জীবনসন্ধ্যা

আজি মোর জীবনের সায়াহ্ন লগনে
ভাবি মনে মনে—
সুদীর্ঘ জীবন-পথ আসিয়াছি বাহি
আমি তো একাকী।
কে আমারে নিয়ে এলো শৈশব-যৌবন হতে
বার্ধক্যের পথে?
তারে আমি জানি বা না-জানি
সে তো রহিয়াছে মোর সাথে
দিবস-রজনী।
জীবনের শেষ প্রান্তে এসে তাই আজি
তারে আমি খুঁজি।
আশৈশব মোরে সযতনে করিছে লালন—
কেবা সেই জন?
কেমনে জানিব তারে আমি?
সহসা অন্তরতলে উদ্ভাসিল
চকিতের প্রায়—
যাঁরে আমি খুঁজিতেছি, হায়,
তিনি জন্ম হতে জন্মান্তরে—
রয়েছেন আমার অন্তরে
চেতনার রূপে।
যে-মহাচেতনা হতে এ-বিপুল বিশ্ব
প্রসবিত—
তাঁরেই নিয়ত খুঁজিছে আমার মন।
সেই ক্ষণ,
শান্তি আসে ফিরি
হৃদি মাঝে তাঁহারে নেহারি।
মানিনু তখন,
সার্থক জীবন।

বন্যা

এলো ধেয়ে বন্যা বর্ষার কন্যা—
সহসা এ-ভাদরের অন্তে।
জলে জলে ঘরদ্বার ভেসে গেল সবাকার
কী যে হবে পারে না জানতে!
ঘরছাড়া হোল সব দিকে দিকে কলরব—
হাহাকার ওঠে ক্ষিতিপ্রান্তে।
কোথা আছে আশ্রয় যেতে হবে নিশ্চয়
খোঁজে লোকে অশান্ত চিত্তে।
ঘোটকে হয়ে সওয়ার মা'র আগমন এবার
ধরাতে—
তার ফলে দেখি এবে ছত্রভঙ্গ হল সবে
একি দশা সকলের বরাতে।
বড় আশা ছিল মনে জননীর আগমনে
হবে ধরা আনন্দ-মুখরা ;
এ কী হোল, হায় হায়, বিপরীত দেখি তায়—
ক্রন্দন-রোলে এবে বিধুরা!
জয় জয় মহামায়া, এবে তুমি কর দয়া
অবোধ তোমার যত সন্তানে—
সব দুঃখ দূর করি আন শান্তি দুখহরা—
তোমার অমৃত-বারি সিঞ্চনে!

জন্মদিন

বর্ষে বর্ষে ফিরে ফিরে আসে জন্মদিন—
পুরাতন মাঝে সে নবীন!
নূতনের জয়বার্তা ঘোষণা সে করে—
বৎসরের পরে।
আমার জীবনে কত বর্ষ হল গত
তাই ভাবি মনে।
কত জন্মদিন এলো গেল ফিরে ফিরে—
হিসাব কে করে?
কর্মব্যস্ত জীবনে আমার
মেলেনি সে অবকাশ
চিন্তা করিবার।
জীবনের প্রান্তভাগে আসিয়া এবার
পাইনু সে-অবকাশ
হিসাব নেবার!
ভাবি বসে মনে, কী কাজে কেটেছে দিন
শৈশবে যৌবনে?
কত শুভকর্ম আর কত কি অন্যায়—
জমে আছে পর্বতের প্রায়
দীর্ঘ এ-জীবনে!
এ-কর্মের ফলে বহু জন্ম নিতে হবে
নব কলেবরে।
অবশিষ্ট জীবনের দিনগুলি তাই
দেবতা-স্মরণ করি
কাটাইয়া যাই!
যিনি মোর জীবনের কর্ণধার—
পরজন্ম লাগি আমি
তাঁরে দিনু ভার।
ঠাঁই দেন তিনি যেন
চরণে তাঁহার।
সমগ্র হৃদয় দিয়ে পূজি যে তাঁহারে—
অশ্রুধারে নিয়ত ধোয়াই
যুগল-চরণ তাঁর।
এই শেষ সংকল্প আমার।

লীলা হতে নিত্য আর নিত্য হতে লীলা,
সৃষ্টির এ-খেলা আবর্তিছে যুগে যুগান্তরে
বিশ্বচরাচরে।
নিত্যরূপ সীমাহীন কারণ সাগরে
উঠিয়া বুদ্বুদ স্ফুরিতেছে
লীলারূপ তরঙ্গ আকারে—
অন্তহীন একই সৃষ্টি লীলা
প্রকাশিছে নবীন আকারে—
যুগ যুগ ধরে।
এ-সৃষ্টির নিয়ন্তা যে-জন
তাঁর মন আত্মানন্দে রয়েছে মগন,
আপন স্বরূপে।
শক্তিরূপে তিনিই আবার
সত্ত্ব-রজঃ-তমোগুণে স্বরূপ আবরি,
মেতেছেন এ-খেলায়—
জীবরূপ ধরি।
সত-ত্রেতা-কলি ও দ্বাপরে—
চলিছে তাঁহার লীলা
বহি যুগান্তরে।
এ-সৃষ্টি লীলার শেষ কোথা?
শুরু আছে কিন্তু শেষহীন—
বিচিত্র এ-সৃষ্টি লীলা
বিরামবিহীন।

প্রার্থনা

হে রামকৃষ্ণ, সারদা-জননী,
শরণ মাগিনু চরণেতে আমি,
জপি তব নাম দিবস-যামিনী—
ব্যর্থ কখনও করো না।
ধ্রুবতারা সম জীবনে আমার
উদয় হইল তোমা দোঁহাকার—
সহসা কেমনে জানি না!
কৃপা করি যদি উদিলে জীবনে
জনম ভরিয়া রাখিও চরণে,
বঞ্চিত কভু করো না।
অন্তরতলে যেন অহরহ
তব রূপ হেরি না-হয় বিরহ—
ভব-কোলাহল সহে না।
জন্মান্তরে না-ভুলি দোঁহারে—
স্মরণে থাকিও যুগ যুগ ধরে,
কৃপাহীন যেন করো না!

দোল-পূর্ণিমা

আজি শুভদিনে জগত-তারণ
চৈতন্য প্রভুর হইল জনম,
ধরণীর এই ধূলিতে!
পূর্ণিমা-নিশি করিয়া উজ্জ্বল
প্রেম-অবতার ভকত-বৎসল
উদিলেন এই ধরাতে!
শিশুকাল হতে হরির লাগিয়া
কাঁদেন শ্রীপ্রভু ব্যাকুল হইয়া—
দরবিগলিত নয়নে!

আচণ্ডালে দিয়া নিজ কোল
হুংকারি বলে 'বল হরিবোল'—
কৃতাঞ্জলিপুটে তৃণ লয়
নিজ দশনে।
অতি পাষণ্ড জগাই-মাধাই
তাদেরও জীবনে উদ্ধার চাই—
দয়াময় প্রভু স্মরিল।
গৌরাঙ্গ-নিতাই মিলি দু'জনায়
জগাই-মাধায়ে কোল দিতে যায়—
হরিনামে দিক্ পুরিল।
ক্রোধে পাষণ্ড ভ্রাতারা মিলিয়া
রক্ত-বন্যা দিল বহাইয়া—
আঘাত হানিয়া নিত্যানন্দ দেহেতে।
প্রেমিক প্রভুরা বেদনা ভুলিল
নিঠুর দু'ভায়ে প্রেমে কোল দিল—
'বল হরিবোল' রবেতে।
বিস্মিত চিতে ভাই দুইজন
প্রেমের মহিমা বুঝিয়া তখন
অশ্রুধারায় তিতিল।
সার্থক হোল প্রভুর চেষ্টা—
হরিনাম রোলে পুরিল দেশটা,
কলির পাতক ঘুচিল।
প্রেমিক ঠাকুর ধরণীতে আসি—
বিলালো জগতে প্রেম রাশিরাশি,
জাতি-অভিমান মুছিল।
প্রেম-বন্যায় প্লাবিল জগত,
হৃদয়ে বহিল আনন্দস্রোত—
জগত-জনের প্রাণেতে শান্তি আসিল।

আগমনী

শরতের সোনালী প্রভাতে—
ধরণীতে মা'র আগমনী
দেয় আনি
মধুময় আনন্দের বার্তাখানি।
বৃষ্টিধৌত শ্যামল বনানী
জাগায় শৈশবস্মৃতি
কত পুরাতনী।
শেফালী ফুলের মধুঘ্রাণে—
প্রাণে আনে আগমনী সুর—
আনন্দবিধুর।
নদীতীরে কাশবনে কাশফুলগুলি
উঠে দুলি বায়ুভরে—
জাগাইয়া শিহরণ।
প্রাণ-মন অকারণ পুলকে ভরিয়া ওঠে।
শরতের সোনার আলোতে—
মায়ের চরণ-ছায়া
ঝলকে চকিতে।
বিনম্র প্রাণেতে
প্রণাম জানাই আজি
মা'র চরণেতে।

জগত-তারণ বুদ্ধ

বোধি-তরুমূলে বসি একাসনে—
সুদীর্ঘকাল কাটাইলে ধ্যানে,
দয়া অবতার বুদ্ধ!
হিংসা ত্যজিয়া দয়ার বিধান
জগতবাসীরে দিলে ভগবান,
হৃদয় করিলে শুদ্ধ।
দয়ার সমান পুণ্যকর্ম
নাহি কিছু আর দয়াই ধর্ম,
দুঃখ-তাপিত জগতে।

জীবেরে শিখালে দয়ার মর্ম—
দীনজনে সেবা জীবের ধর্ম
শান্তি আনিলে মরতে।
প্রণমি তোমারে আজি করজোড়ে—
তোমার সমান নাহি দেখি কারে
দয়ার মুরতি ভুবনে!
দয়াময় প্রভু, কর উদ্ধার
কাতর পরাণে ডাকি বারবার—
শরণ লইনু চরণে!

গুরু

জগতের গুরু যিনি,
তাঁহারেই জানিয়াছি আমি—
জীবনের গুরুরূপে!
মন্ত্র তাঁর লভিয়াছি সুগোপনে—
অন্তরের অন্তঃপুরে,
নিভৃতে বিজনে!
দিনের প্রথমে
প্রণাম জানাই মোর
গুরুর চরণে।
সারাদিন গুরুরে স্মরিয়া—
কেটে যায় দিন মোর
আনন্দে বহিয়া।
দিনের কর্তব্য-শেষে ক্রমে
বিশ্রামের পালা
যবে নামে—
হৃদয়ের যিনি অধিপতি
দিবসের শেষ নতি
রেখে যাই তাঁহার চরণে।

নিয়তি

শিশুকাল হতে মোর চিতে
বাসনা জাগিয়াছিল
প্রাণের নিভৃতে—
হবো না সংসারী কভু
সারাটা জীবন কাটাব
একেলা আনন্দেতে।
প্রাণেতে পোষণ করি এ-গোপন আশা,
কাটাইনু যৌবনের প্রথম প্রহর,
শান্ত চিতে।
তারপর একদিন পালা-বদলের পালা
এসে গেল আমার জীবনে—
আচম্বিতে।
প্রবেশিয়া সংসার জীবনে বুঝিলাম মনে—
নিয়তিরে রুধিবার সাধ্য নাহি কার
জীবনে-মরণে।
নিয়তির অমোঘ বিধান
মেনে নিতে হবে শান্ত চিতে
সবাকার।
নাহিক উপায় আর
মানব-জীবনে।
এই সার জানিলাম মনে।

মা কালী

কালী মাগো,
দিক্-বসনা মহাকালী তুমি-
মহাকাল-বুকে লীলা কর সুখে।
তোমারে প্রণমি।
একাধারে শান্ত-রুদ্র
দুই রূপ তব—
সৃষ্টি ও সংহার,
অভিনব।

ঘন ঘোর অমানিশা রাতে শ্মশানভূমিতে
প্রলয়ের অশনি সংকেতে—
হেরি তব রুদ্র-লীলা
কাঁপি ওঠে হিয়া।
মাগো, সে-রূপ আবরি এসো নামি
জ্যোতির্ময়ী মাতৃরূপে—
সন্তানের হৃদি আলোকিয়া!
দানো শান্তি প্রাণে।

নদী

পর্বত-শিখরে গুহার আঁধার গর্ভ হতে
হিমানী-শয্যারে অতিক্রমি
চলিয়াছি নামি—
নদী আমি!
হৃদয়-আবেগে থরথরি
দুই তীরে চেতনা সঞ্চারি
চলিতেছি সানুদেশে নামি,
নাহি থামি।
সে-চলার বেগে
প্রাণে জাগে অনাহত
গতির মূর্ছনা—
চলার সাধনা!
শ্যামল বনানী
প্রাণে দেয় আনি
যৌবনের অজানা বেদনা।
সে-বেদনা হৃদয়ে বহিয়া
চলেছি ধাইয়া
অজানার ইসারায়।
সুদীর্ঘ প্রান্তর ছাড়াইয়া
চলি প্রবাহিয়া
মিলিবারে সাগর সঙ্গমে।
সাগরের সুগভীর ধ্বনি
শ্রবণেতে পশিল যখনি
আকুল করিল প্রাণ মনে।

অধীর আবেগে
ঝাঁপাইয়া পড়িলাম
সাগরের বুকে।
হইল মিলন—
মানিলাম সার্থক জনম।

সূর্যদেব

জগতের আদিদেব তুমি,
হে সূর্য-দেবতা—
তোমারে প্রণমি!
পৃথিবীর প্রাণ তুমি, সৃষ্টির কারণ।
তোমার বিরহে নাহি রহে
এ-ধরার বুকে—
জীবের জীবন।
উদয়-অচল হতে অস্তাচল পথে
প্রতিদিন তোমার গমন—
অরুণের রথে।
ধরণীতে দিন, পক্ষ, ঋতু ও বৎসর,
তোমার কারণে আসে-যায়
নিরন্তর।
তব তেজে পাইয়া জীবন,
এ-সৌরজগৎ অনুক্ষণ,
প্রকাশিছে মহিমা তোমার!
প্রণমি তোমারে বারংবার।

নিশানাথ

পুরব গগন উজলিয়া উদিলেন নিশানাথ—
পূর্ণিমা সন্ধ্যায় ধরণীর সীমানায়!
অনাবিল আলোকধারায় প্লাবিত করিয়া
ভুবন গগন, হল তাঁর আগমন।

যেন কোন অকারণ পুলকে মাতিয়া
স্নাত হয়ে জল-স্থল রজত ধারায়—
রহিয়াছে রহস্যমগন।
পূর্ণিমার আকাশে চাহিয়া
কত পুরাতন স্মৃতি জাগে—
হৃদি আকুলিয়া।
বিমুগ্ধ বিস্ময়ে ধরণীর অপরূপ রূপ নেহারিয়া
অসীমের মাঝে মন
যায় হারাইয়া।
কোন আদি কবি যাঁর এ-অপূর্ব জগৎ সৃজন?
খোঁজে তাঁরে মন আকুল আগ্রহে
দিকে দিকে।
নাহি যায় তাঁরে জানা—
তিনি যে অজানা।

হিমালয়

ভারতের পিতা তুমি,
হে মহিমময় হিমালয়।
তুমি বিশ্বের বিস্ময়!
সমুন্নত ললাটে তোমার
শোভিতেছে হিমানী কিরীট—
অপরূপ শোভাময়।
কত শত নদী-নদ
জনম লভিয়া তব ক্রোড় হতে—
মিলিবারে চলিয়াছে
সাগরের সাথে।
তোমার স্নেহের ধারা—
দানিয়াছে শ্যামলিমা
ভারতের বুকে নব নব রূপে
সর্বদিকে।
তোমার দুহিতা, পুণ্যতোয়া ভাগীরথী ধারা—
চলেছে ধাইয়া সাগর সঙ্গমে,
হয়ে আত্মহারা।

হে মহান্‌, পর্বতের পিতা,
ধ্যান-মৌন রহিয়াছ যুগ যুগ ধরি
অনাদি সৃষ্টির শুরু হতে!
মহাযোগী ধূর্জটি সমান
তোমারে নেহারি।
বিমুগ্ধ অন্তরে স্তব্ধ নতশিরে
তোমার চরণে রাখিলাম
আমার প্রণাম!

সমুদ্র

হে সমুদ্র, হে মহাসুন্দর,
ধরণীর জন্মলগ্ন হতে আছ তারে ঘিরে—
সুগভীর পিতৃস্নেহে আকুল অন্তরে!
ঊর্ধ্বে তরঙ্গের বাহু তুলি
জানাইছ অবিরত অমিত শক্তির পরিচয়—
যার নাহি ক্ষয়!
নিম্নে সুগভীর তলদেশে, দৃষ্টি-অগোচরে
কত শত জলচর পাইয়া আশ্রয়
হয়েছে নির্ভয়।
ক্ষুদ্র ও বৃহৎ শত শত নদী-নদ
দীর্ঘপথ করি অতিক্রম নিয়েছে শরণ
চরণে তোমার।
ভয়াল বিশাল রূপে তোমার বিস্তার—
আনে প্রাণে শঙ্কা অজানার!
বিরাটের সুমহান রূপ
জাগায় হৃদয়ে অপরূপ
অরূপের অনুভূতি!
চেতনা মাঝারে জেগে ওঠে ধীরে
বিশ্ব-রচয়িতা মহাশিল্পীর
মুরতি।

মন

জগৎ মাঝারে বায়ু হতে দ্রুতগামী
আছে কোন্ জন?
মানুষের মন সবচেয়ে দ্রুতগামী—
নহে অন্য জন
এই আছে গৃহকাজে হয়ে এক মন—
নিমেষে চলিয়া গেল বন্ধুর সদন,
বহু দূর দেশে।
মনের ঠিকানা নাহি যায় জানা—
কখন কোথায় থাকে হয়ে অন্যমনা।
চঞ্চল মনেরে নিষ্ঠাভরে স্থির করিবারে
যদি পারে কোন জন—
বায়ুহীন ঘরে দীপশিখার মতন,
সেই ক্ষণে অতি সহজে হইবে
তার ব্রহ্ম-অনুভূতি।

জননী

অনাদি এ মহাবিশ্ব রচেছেন যিনি—
তিনিই জননী।
স্মরি তাঁরে দিবস-যামিনী মাতৃরূপে—
দুঃখে-সুখে।
বিশ্বজোড়া তাঁর অযুত সন্তান তরে—
ধরিত্রী-সমান সহিষ্ণুতা
বহেন জননী অকাতরে।
এই বিশ্বজননীর অণুমাত্র স্নেহ
প্রকাশিছে জন্মদাত্রী প্রতি জননীতে—
এই পৃথিবীতে।
শৈশব হইতে সন্তানের যত অপরাধ,
জ্ঞানে বা অজ্ঞানে—
সহেন জননী অকুণ্ঠিত মনে।
জননীর 'পরে যদি করে অবিচার আপন সন্তানে-
তখনও তাহারে ক্ষমা করেন জননী
দ্বিধাহীন প্রাণে।

এ জগতে জননীর তুলনা যে নাই—
কে আছে তাঁহার মত
ভাবিয়া না পাই।
কৃতজ্ঞ হৃদয়ে তাই প্রণাম জানাই
আনত নয়নে—
জননী চরণে!

কাব্যতরী

জীবনের শেষপ্রান্তে এসে
সহসা কী খেয়ালের বশে
করে চলি কবিতা রচনা
অনুরাগ ভরে!
এই রচনার পথপ্রদর্শক যিনি মোর
তাঁরে বারংবার করি নমস্কার—
কৃতজ্ঞ অন্তরে!
তাঁর পথ অনুসরি—
চলেছে বহিয়া মোর
রচনার তরী।
জীবনের এই সায়াহ্ন বেলায়
ভাবি বসে তাই—
জীর্ণ এ কাব্যের তরী মোর
যাবে বহি আর কতদূর?
অন্তর গহনে বসি যন্ত্রমাত্র আমারে করিয়া—
চলেছে সে কোন্ জন
এই কাব্যতরণী বাহিয়া?
অন্যথায় কী সাধ্য আমার
জীবনসন্ধ্যায় বসি
নিত্য নব কাব্য রচিবার?
কৃতজ্ঞ অন্তরে আজ তাই
প্রণাম জানাই চরণেতে—
সেই চিরজানা
চির অজানার!

তুমি

আমার প্রাণের প্রান্তে বসি
নিত্য নব কবিতা সম্ভার
সৃষ্টি করি চলিয়াছ তুমি।
বিস্ময় মানিয়া রয়েছি চাহিয়া
অপরূপ সে সৃষ্টির পানে।
দিনে দিনে কবিতার ডালি—
উঠে ভরি অভিনব রচনায়
নব নব ভাবে ও ভাষায়।
আমি শুধু নিমিত্ত হইয়া
রয়েছি চাহিয়া
তব মুখপানে।
অন্তর-গহনে বসি মোর
বাহিয়া চলেছ এই
কাব্যের তরণী।
কতদূরে কোন্‌খানে হবে শেষ
এ চলার?
নাহি জানি।
ওগো কর্ণধার,
তাহা জান তুমি।
স্থিরনেত্রে প্রশান্ত অন্তরে
তোমার সৃষ্টির দ্রষ্টারূপে—
চেয়ে আছি আমি।

শিল্পী

আপন প্রাণের কল্পনারে রূপের মাঝারে
প্রকাশ করেন যিনি—
শিল্পী তিনি।
এ বিপুল বিশ্ব-ব্রহ্মাণ্ডের রূপকার যিনি—
তাঁরে শ্রেষ্ঠ শিল্পী
বলি মানি।

সভ্যতার উষালগ্নে প্রথম যেদিন—
আদিম মানব নিজ প্রিয়জনে
সাজাইল পুষ্প আভরণে,
অস্ত-রবির কিরণে,
সেই ক্ষণে প্রকাশ পাইল—
মানবের হৃদয়ের সৌন্দর্য পিপাসা
যুগ যুগ ধরে বিকাশিছে
নব নব শিল্পের আকারে।
বিশ্ব-শিল্পী আপনার লীলায় মাতিয়া
প্রবেশিয়া সামান্য আধারে
ধরেছেন মানব মুরতি।
মানুষের সৃষ্টি-প্রাতিভায় দেখি তাই,
উদ্ভাসিত তাঁহারই প্রতিভা
নবীন আকারে।
শিল্প-সৌন্দর্যের মাঝে নেহারিয়া
জগৎ-পিতার অভিনব
জ্যোতির স্ফুরণ—
বিস্ময় মানিয়া নরগণ—
যুগে যুগে করে তাঁর
চরণ-বন্দন।

ভাগীরথী

হিমাদ্রিশিখর প্রান্তে গোমুখি হইতে উৎসারিয়া—
দীর্ঘপথ প্রবাহিয়া সিন্ধুর চরণে মিলিবারে
চলেছ ধাইয়া ত্বরা করে।
তোমার মিলনভূমি সিন্ধুর সঙ্গম—
যেথায় স্থাপিত ঋষি কপিল আশ্রম
সুপবিত্র তীর্থরূপে মানে সর্বজন!
শ্রীহরি চরণচ্যুত অতি পূত তোমার সলিল—
স্পর্শমাত্র সর্বপাপ হয় বিদূরিত,
পুণ্যস্নানে মুক্তিলাভ করে ভক্ত যত।
দূর-দূরান্তর হতে পুণ্যার্থীসকল
স্নান করি পবিত্র হইয়া—
তীর্থবারি লয়ে যায় গাগরী ভরিয়া।

পুণ্যতোয়া ভাগীরথী তুমি,
তোমার পরশ লভি ধন্য হ'ল
এ ভারত ভূমি।
তোমারে প্রণমি।

দয়া ও মায়া

ভগবত-কৃপা যবে আসে নামি ধরণীতে
জীবের অন্তরে—
দয়া বলি তারে।
মায়াতে আবরি তাহা হয় বরষিত
শুধু নিজ প্রিয়জন 'পরে—
মায়া নাম ধরে।
দয়ারূপ কৃপাবারি নাহি চাহে পর কি আপন—
বরষিত হয় সমভাবে
সকলের 'পরে!
দীনদুঃখী অধম যাহারা—
অপরূপ এ দয়া লভিয়া ধন্য হয়
নির্বিচারে সকলে তাহারা!
মায়া স্বার্থে অন্ধ হয়ে বাসে ভালো
শুধু নিজ জনে করিয়া বিচার
সর্বক্ষণে।
দুঃখে ও দুর্দিনে যাহা স্নেহ-প্রেম-ভালোবাসা রূপে
হয় বরষিত সর্বজীবে নিঃস্বার্থ আকারে—
তাহারেই শ্রেষ্ঠ মানি জগৎ ভিতরে!
তাহারেই জানি জগৎ-কারণ বিধাতার দান—
সীমাহীন অফুরান বিশ্বপ্রেম রূপে
প্রবাহিত হয়ে চলে যুগ হতে যুগে!

কর্ণধার

ওগো মোর জীবনের কর্ণধার,
আজি কেন হরিলে আবার
কাব্য রচিবার ক্ষমতা আমার?
কেন বা দানিয়াছিলে সে অপূর্ব ক্ষমতা আমারে?
ভাবি তাই বারে বারে—
বিস্মিত অন্তরে।
ওগো, কে তুমি গোপনে
খেলিছ আমারে লয়ে
আপনার মনে?
ক্রীড়নক করিয়া আমারে
চলিছে তোমার লীলা
বহি জন্মান্তরে।
চিনি না তোমারে তবু খুঁজি বারে বারে
হৃদি অন্তঃপুরে।
দরশন নাহি পাই তব
শুধু পরশ রাখিয়া যাও
নিত্য নব নব কাব্যের আকারে।
কৌতুক করিছ তুমি আমারে লইয়া—
অনুভবে বুঝি তাহা
বিস্ময় মানিয়া।
হে অদৃশ্য কর্ণধার,
তোমার পরশ যেন অনুভব করি
বার বার জন্ম-জন্মান্তর।
এ প্রার্থনা মোর।

নিত্য ও লীলা

চিদাকাশে সৎ-চিৎ-আনন্দরূপে
অবস্থান যাঁর—
তিনিই আবার লীলায় মাতিয়া
তাঁরই সৃষ্ট বিশ্ব চরাচরে করিছেন খেলা-
চেতন ও জড়ের আকারে,
চারিযুগ ধরে।
সত্য-ত্রেতা-কলি ও দ্বাপরে
আবরিয়া আপন স্বরূপ—
লীলায় মাতিয়া ধরেছেন জীবরূপ
এই বিশ্ব জুড়ে।
স্রষ্টার মায়াতে জীবগণ হয়ে অচেতন
জানিতে পারে না আপনারে।
দুঃখে-সুখে সংসারীর সাজে
মাতিয়াছে সংসার খেলায়—
চারিযুগ ধরে ভুলিয়া নিজেরে।
কলি-শেষে তারা অতি তুচ্ছ স্বার্থ লাগি
হয়ে দিশাহারা—
করে হানাহানি জনে জনে
আত্মপর সকলের সনে।
ভুলিয়া রয়েছে সেই নিত্যসত্য স্বরূপ তাহার—
যাহা জানিবার চির অধিকার
আছে তার।
সেই তো সাধনা আপনারে জানা,
আপন অন্তরে খোঁজা
আপনারে।
যখনি হইবে সেই আত্মদরশন
যাইবে ডুবিয়া সেই চেতন-সাগরে—
পাবে না খুঁজিয়া আপনারে
স্বতন্ত্র আকারে—
তখনই জানিবে তার সাধনার শেষ
এইবারে।
লবণ পুত্তলী যাবে গলি
পশি লবণ সাগরে।

সারদা জননী

সারদা জননী, তুমি লক্ষ্মী-রূপ ধরে—
লইতেছ পূজা আজি পুণ্য-কোজাগরে,
প্রতি বাঙালীর ঘরে ঘরে।
তোমার মাঝারে জগৎ-জননী
এসেছিল নামি মানবী আকারে—
লীলা করিবারে।
জগৎবাসীরে আদর্শ জননী-রূপ
শিখাবার তরে।
মর্ত্যতনু ত্যজিয়া এখন রহিয়াছ
জ্যোতির্ময় পরমাত্মা-রূপে,
বিশ্বময় পরিব্যাপ্ত হয়ে—
জগৎ-জনের অন্তরে-বাহিরে।
লক্ষ্মী-সরস্বতী আর ভগবতী-রূপে তোমার মহিমা
বিরাজিছে মহাবিশ্বে শক্তির আকারে,
বিচিত্র প্রকারে।
সারদা জননী মাগো, পবিত্রতা-স্বরূপিনী,
এসো নামি আমার হৃদয়ে—
পুরাও বাসনা কৃপাকণা দিয়ে।

মা লক্ষ্মী

লক্ষ্মী মাতা, মহাদেবসুতা,
জননী তোমার দুর্গামাতা—
যাপিয়াছ সুখে হিমালয় বুকে অকাতরে।
বিষ্ণুরে পাইয়া পতিরূপে—
চলি গেলে গোলোক মাঝারে
বাস করিবারে।
তোমার কৃপার দানে ভরিয়াছ বিশ্বের ভাণ্ডার—
শ্রী-সৌন্দর্য-ঐশ্বর্য ও আনন্দ অপার।
তব কৃপাকণা লভিবারে ব্যাকুল হইয়া—
পূজে তোমা ঘরে ঘরে বিশ্ববাসী
প্রাণ-মন দিয়া।

সমস্ত রজনী জাগে বিনিদ্র হইয়া
তব পুণ্য দর্শন মাগিয়া।
সংসারের দুঃখ-কষ্ট-বেদনা সহিয়া
আছে যারা অতি দীন
জীবনে মরিয়া—
না পারি সহিতে এত জীবন-যন্ত্রণা—
অন্তরে লভিতে চাহে
তব কৃপাকণা।
স্মরে তোমা নিশিদিন হয়ে একমন—
পূর্ণতা ও আনন্দের মাঝে
পাইবারে তব দরশন।
জগৎবাসীর এই বেদনা যখন
করে পরশন তব প্রাণে—
সেই ক্ষণে মর্ত্যভূমে এসো নেমে
পুরাতে বাসনা কৃপাকণা দানে।
তোমার করুণা, যার না-হয় তুলনা,
লভিতে যে পারে তার
সার্থক সাধনা।

রাজপথ

জন্মক্ষণ হতে এ পথের
কত শত যাত্রী চলিয়াছে দিনরাত্রি
তার কে করে বিচার।
প্রভাত রবির আলো যবে
ধরণীর বুকে ওঠে ফুটি সবে—
পাখির কূজনে জাগে সাড়া প্রাণে,
সেই ক্ষণ হতে যে-চলার শুরু এই পথে,
হয় না বিরতি সে-চলার
ঘন ঘোর অন্ধকার রাতে।
দূর-দূরান্তর হতে যাত্রীবাহী-মালবাহী—
কতশত গাড়ি যায় চলি
উড়াইয়া ধূলি।

পথের দু'ধারে রহিয়াছে কত
মাঠ-বন-গ্রাম-নদী—
যেন সাথী হয়ে এ পথের,
সুদীর্ঘ দিনের।
নগর-নগরী সারি সারি ঘরবাড়ি নিয়ে
আছে চেয়ে পথ পানে—
অবাক নয়নে।
জানে না তাহারা এ পথের জন্মকথা—
কবে কোন্ জন রেখেছিল প্রথম চরণ
এ মাটির ধূলি 'পরে,
চিহ্নিত করিয়া নব-পথ রেখা
দুঃসাহস ভরে।
সেই ক্ষণ হতে লক্ষ লক্ষ চরণ পরশে
পবিত্র হয়েছে এ পথের ধূলি—
পুণ্য-তীর্থ হেন।
তাই এ ধূলিরে তীর্থসম জানি—
নতশিরে আমি
প্রত্যহ প্রণমি।

পাহাড়

প্রকৃতির অনুপম সৃষ্টি এক,
পাহাড়ের রূপে আছে চেয়ে—
জন্মলগ্ন হতে নিঃশব্দেতে।
বন-নদী-পশু-পাখি এরা তার সাথী
দিবারাতি—
নাই কোন মানব-বসতি!
ধীরে ধীরে বহু বর্ষ পরে
মানুষ রচিল সেথা বাসস্থান,
নিজ প্রয়োজনে নানা স্থানে।
ক্রমে হল পথের সৃজন
বৃক্ষ-লতা করিয়া ছেদন।
প্রকৃতির শ্যামলিমা বিনষ্ট করিয়া
মানব-বসতি ক্রমে উঠিল গড়িয়া।
জনজীবনের প্রয়োজনে
স্তব্ধ-শান্ত পাহাড়ের বুক—

অবিরল কোলাহলে পূর্ণ হয়ে
না-রহিল চুপ।
প্রকৃতিকে ধ্বংস করি
গড়িয়া উঠিল এইরূপে—
সভ্যতার ইতিহাস
পৃথিবীর বুকে।
প্রকৃতিকে করি পরাজিত
আসুরিক জয়বার্তা হইল ঘোষিত।

সন্ধ্যা

দিনশেষে যবে রবি চলে অস্তাচল পথে,
পশ্চিম গগনে রাঙা আবির ছড়িয়ে—
গোধূলির ধূসর আকাশে
দেখা দেয় সন্ধ্যাতারা সকরুণ হেসে,
সেই ক্ষণে সন্ধ্যা আসে নেমে
ধীর পদে পৃথিবীর বুকে—
এক হাতে ধরি দীপশিখা
ধূনা অন্য হাতে, অপূর্ব শোভাতে!
দিকে দিকে জাগি ওঠে
আরতির সুমধুর ধ্বনি—
শঙ্খ-ঘণ্টা-কাঁসর নিনাদ!
ধীরে দেখা দেয় চাঁদ
আকাশের সীমানায়—
উজ্জ্বল আভায়!
সন্ধ্যার এ অপূর্ব মাধুরী
নেয় প্রাণ-মন হরি—
নির্বাক বিস্ময়ে শুধু থাকি চেয়ে!

অগ্নি

তুমি অগ্নি, তুমি হুতাশন—
ব্রহ্মা বলি পূজে তোমা
মর্ত্যবাসীগণ!
যাগ-যজ্ঞ-বিবাহাদি প্রতি শুভ কাজে
নিত্য তব প্রয়োজন হয় ধরা মাঝে।

তোমার প্রকাশে হয় সভ্যতার
প্রথম সৃজন—
তোমা বিনা সুসাধ্য যা হত না কখন।
মিত্রভাবে সভ্যতারে যতখানি অগ্রগতি
করিয়াছ দান—
শত্রুরূপে বিধ্বংসী তাণ্ডবে
নহে কেহ তোমার সমান।
শান্ত-রুদ্র দুই রূপে
বন্ধু আর শত্রুভাবে
রয়েছ জগতে।
বিশ্বজন মানে তোমা
হিতকারী বন্ধু বলি
সকৃতজ্ঞ চিতে।
শত্রু বলি জানে তোমা
অরণ্যের জীবজন্তুগণ—
মূর্তিমান মৃত্যুরূপী তুমি যে শমন।
মর্ত্যে ব্রহ্মারূপী দেব,
তুমি হুতাশন—
পঞ্চভূত মধ্যে তুমি হও অন্যতম।

বায়ু

বায়ু জীবজগতের প্রাণ—
সৃষ্টির প্রথম দিন হতে
পৃথিবীরে ঘিরে আছে বিদ্যমান।
প্রতি শ্বাসে তার অনুভূতি
হইতেছে জীবদেহে জন্মক্ষণ হতে।
সর্বশেষ বার ত্যাগ হয় তাহা
জীবনের অন্তিম ক্ষণেতে।
শান্ত-রুদ্র দুইরূপে রয়েছে ধরায়—
সুশীতল সমীরণে
আর ঝটিকায়।
ধরণীরে পরিণত করে ধ্বংসস্তূপে।
বায়ুরে দেবতা-রূপে পূজে নরগণ।
মানে আর জানে তাঁকে
দেবতা পবন।

আমি

আমি আমি করি শুধু
ভাবি না কখনও, কে আমি—
কেন বা এসেছি, কবে কোথা হতে?
পুনঃ যাব কোথা?
একবারও ভাবি না এ কথা!
এই আমিটারে
কেন এত ভালোবাসি?
আজ বারবার
একথা উঠিছে মনে—
আমার স্বরূপ জানিবার।
ভাবি তাই মনে—
চর্ম-মেদ-অস্থি-মজ্জা
জড়ায়ে এ দেহ—
এর মাঝে আমি কোন্‌খানে?
মৃত্যু যবে হয়
দেহ ছাড়ি কে চলিয়া যায়?
তারেই কি আমি বলে জানি?
প্রাণ বলি যারে, তাহাই কি আমি?
প্রাণ আসে দেহে
পুনঃ বাহিরিয়া যায়
জন্ম-মৃত্যুরূপে।
এই প্রাণের স্বরূপে
জীবাত্মা বলিয়া জানি।
যেই মহাশক্তি হতে
বিশ্ব প্রসবিত—
তাঁরই পরমাণু হতে
জীবাত্মা সৃজিত।
খুঁজিতে খুঁজিতে শেষে
আমার মাঝারে
দেখি আমি তাঁরে।
তিনিই তো রয়েছেন
আমার অন্তরে।
তিনি ছাড়া আমি কোথা নাই।
আমারে খুঁজিতে গিয়া
তাঁহারেই পাই।

অদৃশ্য চালক

জীবনের শেষ সীমানায়
দাঁড়াইয়া একা
এ ভাবনা মনে দেয় দেখা—
প্রবেশ করিতে হবে
মরণের আঙিনায়
দেরি নেই তায়।
অজানা সে জগতের মাঝে
কেমনে পশিব একা?
দূর হতে নাহি যায় দেখা
কী আছে সেথায়?
সেই অজানায়?
সহসা চমক জাগে মনে,
একেলা তো নই আমি
সারাটা জীবনে—
যে আমায় চালিত করেছে রাতে-দিনে
দুঃখে-সুখে সর্ব অবস্থাতে
তারে আমি পাই না দেখিতে,
তবু সে তো আছে
আমার পশ্চাতে।
তার ইচ্ছাক্রমে চলেছি যে আমি
সারাটা জীবনে—
জেনে বা না-জেনে।
সে অদৃশ্য চালকের হাতে
রয়েছে আমার
চালনার ভার।
নিজের আমার
নাই আর কোন অধিকার।
এ ভাবের উদয় হইতে—
শান্তি আসে চিতে।
মৃত্যুরে লাগে না ভয় আর।
অদৃশ্য সে চালকেরে
করি নমস্কার—
বারংবার।

বাড়ি

আমার জন্মের দিন হতে
ছিলাম আমরা যে-বাড়িতে
আশৈশব কেটে গেল যেথা
খেলাধূলা লেখাপড়া নিয়ে—
সেই প্রিয় পুরাতন বাড়ি
আসিতে হইল ছাড়ি।
দেশবিভাগের বিড়ম্বনা
এনে দিল দেশে এ যন্ত্রণা।
পূর্ববঙ্গে নিজ বাড়ি হতে
প্রবাসী হইয়া আসি
পশ্চিম বঙ্গেতে।
ভাড়াটে বাড়িতে সামান্য ভাড়াতে
বাস করি বহু কষ্টে
নিরুপায় চিতে।
দিন-মাস-বৎসরে বৎসরে
চল্লিশটি বৎসর গেল ঘুরে।
বহু পালাবদলের মাঝে ততক্ষণ
কেটে গেল আমার যৌবন।
অবশেষে সহসা যে-দিন
নিজ বাড়ি তৈয়ারীর শুভক্ষণ
আসিল জীবনে—
ভুলিব না কভু সেই দিনে।
চিরদিন রাখিব স্মরণে
অভাবিত সেই আনন্দের দিনে।
তারপর এল গৃহপ্রবেশের পালা—
নূতন বাড়িতে মহা আনন্দেতে।
আমার জীবনে ততদিনে
দেখা দিল বার্ধক্যের সীমা,
জীবনের শেষের প্রহর
সম্পূর্ণ অজানা।
ভাবি মনে না-হয়ে কাতর
মরণ তো হবে একদিন—
সে-মরণ নিজের বাড়িতে
মেনে নেব আনন্দিত চিতে।

বাগান

সৃষ্টিকর্তা ঐ ভগবান রচেন বাগান—
পৃথিবীর বুকে আপনার সুখে!
এই ধরণীর দিকে দিকে!
অরণ্যে-পাহাড়ে সর্বধারে
তাঁর সৃষ্ট জগৎ মাঝারে—
সে-বাগান প্রকাশিছে বিচিত্র আকারে!
মরুভূমি মাঝে মরুদ্যান—
মরুবাসী প্রাণী তরে পরম করুণাভরে
রচেছেন এই ভগবান।
তাঁর রীতি অনুসারি দেশে দেশে
যত মানবেরা হয় যত্নবান—
সৃজিতে বাগান।
জীবনের প্রয়োজন তরে তারা যত্ন করে
উৎপাদন করিবারে বিভিন্ন প্রকারে
ফল-শস্য-সব্জী আদি
বৎসরে বৎসরে!
প্রাণধারণের এই প্রয়োজন
হৃদয়ের ক্ষুধা তাহাদের
মিটাইতে পারে না কখন!
তাই দেখি নানা পুষ্পে সুশোভিত
বিচিত্র বাগান—
সৃজি তারা জুড়ায় পরান!
কৃতজ্ঞ হৃদয়ে সেই ফুল তুলি—
পূজা করে দেবতারে
ভরিয়া অঞ্জলি!

দীঘি

দীঘির খনন, পুরাকালে করিতেন
জমিদারগণ!
এখন যা নাহি প্রচলন।
সুশীতল দীঘির সে জল
আনিত গ্রামের বধূগণ
মিটাইতে নিত্যপ্রয়োজন।

গৃহজন তরে, সযত্নে রাখিত উহা ধরে
প্রতি ঘরে ঘরে।
প্রচণ্ড গ্রীষ্মের দিনে অতিথি আসিলে
নিবারিত তৃষ্ণা সেই সুশীতল জলে।
দীঘির বদলে আজিও সকলে
পুষ্করিণী কাটাইছে যত্ন-সহকারে—
গ্রামে গ্রামান্তরে।
সংসারের নিত্য প্রয়োজন
সেই জলে মিটাতো তখন।
প্রতিদিন গ্রামবাসীগণ
সেই জল করি আহরণ
রাখিতেন ধরে নিজ গৃহ তরে।
তারপরে—
নব আবিষ্কারে নলকূপ দেখা দিল
গ্রামবাসী ঘরে স্নান-পান তরে।
পুষ্করিণী যত কৃষি ও মাছের তরে
হল ব্যবহৃত।
পুরাতন গ্রামেতে আজিও
গ্রামের সৌন্দর্য রক্ষা করি
বহু দীঘি রহিয়াছে ঘিরি।
যত দিন দেশে দেশে
গ্রাম আর গ্রামবাসী আছে—
দীঘি আর পুষ্করিণী তাহাদের কাছে
রবে বন্ধুর মতন,
মিটাতে তাদের প্রয়োজন
সর্বক্ষণ।

অরণ্য

নিবিড় গহন অরণ্যানী বহু পুরাতন
রহিয়াছে নিশ্চল নিশ্চুপ—
ধ্যান-মৌন ঋষির মতন।
কত পুরাতন কাহিনীর সাক্ষী হয়ে আছে তারা—
প্রকাশের ভাষাহারা।

তারকাখচিত নীলাকাশ
নির্বাক বিস্ময়ে আছে চেয়ে
নিম্নে ধরা পানে
আনত নয়নে!
গম্ভীর নির্ঘোষে সমুদ্র প্রকাশে
নিজ হৃদয়ের ভাষা—
চাহি তার পানে!
বিশ্বের মহান সৃষ্টি যত তাহারা সতত—
মহাকালে করে স্তব
হৃদয়ের নীরব ভাষায়—
যাহা স্পর্শ করি যায়
অন্তরের অতল প্রদেশ!
বাণী হয় হারা স্তব্ধ-মৌন মহাশূন্যতায়—
যার নাহি শেষ!

টুনটুনি

ছোট্ট পাখি টুনটুনি
তোমার গলার স্বর শুনি
বেড়ালছানার প্রাণে চমক লাগে।
কোমল তোমার শরীরটা
খেতে হবে খুব মিঠা—
ভেবে ভেবে বেড়ালছানার লোভ জাগে।
আশায় আশায় রোজ ভোরে
যায় চলে সে খুব দূরে
বেগুনপাতায় তৈরি তোমার বাসাতে।
মিউ মিউ সুর তুলি
ডাকে তোমায় প্রাণ খুলি—
দেখা কভু মেলে না তার বরাতে।
লোভের বসে শেষকালে
মাকে নিয়ে যায় চলে—
লাফিয়ে তোমায় বাসা থেকে ধরতে।
কিন্তু হায়, একি হল—
টুনটুনি যে পালিয়ে গেল!
বেড়াল ছানার কপাল বুঝি পুড়ল!

জীবন-মরণ

জীবন ও মরণ একসাথে আসে দুইজন—
ধরণীর পরে জীবের আকারে।
অভিন্ন তাহারা—
বিচ্ছেদ তাদের হয় না কখনও।
একই সাথে রহে দোঁহে আমরণ—
দুঃখে-সুখে সর্বক্ষণ।
সংসার-লীলার অবসানে
বিদায়ের বেলা যবে নামে—
আনন্দে চলিয়া যায় মরণের পারে
চিরদিন তরে।
অজ্ঞান মানব বুঝিতে পারে না এতসব—
দেহের বিকারে ভাবে মরণের রূপ।
জানে না তাহারা জন্ম-মৃত্যু অভিন্ন আকারে
জীবের স্বরূপ।
মৃত্যুরূপে আসে যাহা
তাহা শুধু পালাবদলের পালা
নবীন জীবন লভে পুরাতন জীর্ণবাস ত্যজি
নববস্ত্র রূপে।
বহু জন্ম পরে জীবলীলা অবসানে—
জীবাত্মা তাহার পুনঃ যায় ফিরে
চেতনসাগরে মিলনের তরে।
লবণ-পুত্তলী যথা—
যায় গলি লবণ-সাগরে।

বাসনা

বাসনা জীবেরে নিয়ে যায়
এক জন্ম হতে জন্মান্তরে।
বাসনার বশে, জীবগণ
সংসারেতে বারবার আসে।
জন্ম-মৃত্যু-আবর্তন—
বাসনাই তাহার কারণ।

"নির্বাসিনা" হতে যদি পারে কোনজন—
পুনঃ তার সংসারেতে না-হয় গমন।
ক্ষুদ্র বাসনার এক কণা—
এনে দেয় সংসার-যন্ত্রণা।
জ্ঞানীগণ তাই বিধাতায়
"নির্বাসিনা" প্রার্থনা জানায়।
জন্ম-মৃত্যু আবর্তন হতে মুক্তি লভিবার,
পথ নাই আর।

জন্মান্তর

জীবগণ এ জগতে এসে ভালমন্দ যত কাজ করে—
তার ফল ভোগ করিবারে
জন্মে জন্মে আসে ফিরে ফিরে।
"জন্মান্তর" ইহাকেই বলে।
ভাল কর্ম ফলে শান্তি-সুখ লভে ধরাতলে—
রোগ-শোক অশেষ যন্ত্রণা
ভোগ করে কুকর্মের ফলে।
বহুদিন ধরে সুখ-শান্তি, রোগ-শোক
ভুগিবার পরে—
জন্ম-মরণের হাত হতে মুক্ত হইবার
ইচ্ছা জাগে তার।
তখন সে বিধাতারে সকাতরে
জানায় মিনতি—
জন্ম-মরণের বৃত্ত হতে দানিবারে
তাহারে নিষ্কৃতি।
গুরুরূপে আসেন বিধাতা
জানাতে তাহারে মুক্তির বারতা।
গুরুর নির্দেশে সুকঠোর সাধনার শেষে—
জন্ম-মৃত্যু-বৃত্ত অতিক্রম
করিবারে হয় সে সক্ষম।

জল

জলরূপী নারায়ণ জীবের জীবন—
জল বিনা কোনও প্রাণী বাঁচে না কখনও।
জল পান, জলে স্নান, জলেতে রন্ধন—
জীবনের যত প্রয়োজন, জল বিনা হয় না সাধন।
উত্তপ্ত বালুকাপূর্ণ মরুর মাঝারে
জলের অভাবে প্রাণী বাঁচিতে না পারে।
হ্রদ-নদী-স্রোতস্বিনী-সাগরের তীরে—
নগর-বন্দর যত গড়ে ওঠে ধীরে।
বর্ষায় যখন উচ্ছ্বসিত জলের প্লাবন
বন্যার আকারে ধায় ভাসাইয়া লোকালয়—
তখন জলেরে মনে হয়, মূর্তিমান অভিশাপ ছাড়া
অন্য কিছু নয়।
জীবন-স্বরূপ যেই জল,
তাহারই প্রলয়রূপে ধরণী বিকল।
সৃজন-প্রলয়রূপে মহাকাল লীলা করে—
নিত্যসত্য জানি জীব মানি লয় তারে—
প্রশান্ত অন্তরে।

মেদিনী

সৃষ্টির প্রথম দিন হতে জীবগণ
পেয়েছে আশ্রয় এই মেদিনীর বুকে—
মেদিনী তাহার জননী-স্বরূপ
স্বর্গ হতে উচ্চতর তাহার আসন।
প্রতি দেশে দেশবাসীগণ
নিজ নিজ স্বদেশেরে জানে
যেন জননী আপন।
মেরুপ্রদেশের অধিবাসী
কিংবা মরুচারী বেদুইন—
মেরু আর মরুভূমে আপন স্বদেশ বলি জানে।
জীবনধারণ তরে বহু কষ্ট সহ্য করে
নিজ নিজ স্থানে।

তথাপি সে-দেশ ছাড়ি আসে না তাহারা
শস্যপূর্ণ সমতল ভূমে।
মেদিনী মায়ের মায়া কাটাইতে নাহি পারে
দেশবাসীগণ।
কার্যান্তরে গিয়া যদি ঘটে কারো বিদেশে মরণ—
হতভাগ্য বলি জানে নিজেরে সে-জন।
জন্ম আর মৃত্যু যেন স্বদেশেতে হয়—
ইহাই বাসনা তার অন্য কিছু নয়।

বৃক্ষ

তুমি বৃক্ষ, তুমি হে তাপস—
রহিয়াছ যুগ যুগ ধরি
নিস্তব্ধ নীরব সাধনায়,
আপনা বিস্মরি।
তোমার সাধনা নাহিক তুলনা—
প্রকাশিছে সাধনার যথার্থ স্বরূপ,
কিবা অপরূপ।
সৃষ্টির প্রথম দিন হতে
দানিতেছ শ্যামলিমা পৃথিবীর বুকে—
আপনার সুখে!
মেঘবারি করি আকর্ষণ
ভিজাইছ ধরণীরে করিয়া বর্ষণ।
তোমার প্রভাবে বাঁচিয়া রয়েছে যত প্রাণী
জগতের বুকে দুঃখে-সুখে।
ঊষর হইত ধরা তোমার অভাবে—
সরস-শ্যামল-স্নিগ্ধ করিয়াছ তুমি
আপন স্বভাবে!
স্নিগ্ধ ছায়া দানে অবারিত
প্রাণীকুলে দিতেছ আশ্রয়
জননীর মত।
দিয়াছ তোমার শাখা-প্রশাখা বিস্তারি—
পক্ষিগণ বাসতরে
মাতৃরূপ ধরি।

তুষার আবৃত মেরুদেশ হইয়াছে অভিশপ্ত
তোমার বিহনে।
বালুকা-আবৃত মরুভূমি জীবন বাঁচাতে ব্যর্থ
শুধু সে কারণে।
হে মৌন সন্ন্যাসী,
ধ্যানরত ধূর্জটি সমান—
তোমার চরণে রাখিলাম
সশ্রদ্ধ প্রণাম।

প্রাণের দেবতা

ওগো মোর প্রাণের দেবতা,
আমার হৃদয়ে দাও সেই ব্যাকুলতা—
যেইরূপ গাভী ধায় বৎসের পিছনে
ব্যাকুল হইয়া—
যাহাতে লভিতে পারি তোমার চরণ
হয়ে একমন।
ডুবাইয়া মোরে তব জ্যোতির সাগরে
ভরি দাও মোর প্রাণমন।
যেন অনুক্ষণ হৃদয় মাঝারে পাই
তোমার স্পর্শন।
তুমি থাক হয়ে ধ্রুবতারা
মোর সারা জীবন ভরিয়া।
সারা রাত্রিদিন যেন সর্বকাজে
প্রাণমন তোমারেই খোঁজে—
না ভুলি কখনও।
ওগো মোর প্রাণের ঠাকুর,
হৃদয়ের সর্ব আবিলতা
করি দাও দূর।
তোমার করুণা দানে ধন্য কর এ জীবনে—
কর আনন্দ মধুর।
হে আমার প্রাণের ঠাকুর।

শক্তিরূপা মা

সারদা জননী, বিশ্ব-প্রসবিনী মহাশক্তি তুমি!
জগৎ জুড়িয়া যত প্রাণীর মাঝারে
তব শক্তি বিরাজিছে চেতনা আকারে!
কাতরে স্মরণ করি তোমা—
লভিবারে পারি যেন তব কৃপাকণা।
হৃদয় ভরিয়া রাখ তোমার পরশে—
অন্য কোন চিন্তা যেন মনেতে না আসে।
দয়াময়ী মাগো, ধ্রুবতারা সম দেখাও সে-পথ মোরে—
যেন পারি জানিবারে আপন স্বরূপে!
জীবন সর্বস্ব তুমি, তুমি শ্রেষ্ঠ ধন
দিবানিশি করি যেন তোমার চিন্তন।
তুমি থাক অন্তর মাঝারে
আপনার হতেও আপন!
অন্য কিছু নাহি চাহে মন।

ভালবাসা

ভালবাসা স্বর্গের জিনিস
যাহা জাগে বিশ্বজন তরে—
নিজ জনে অন্ধ ভালবাসা
স্বার্থপর মানুষেরা করে।
জগৎ-কল্যাণ তরে যেই ভালবাসা
দেখা যায় সেবার আকারে—
নাহি কিছু তাহার উপরে।
এইরূপ জীবসেবা জগৎ মাঝারে
সন্ন্যাসীরা করে—
'ধর্ম' বলি জানিয়া তাহারে।
একই ভালবাসা এই 'প্রেম' আর 'স্বার্থ' নামে
রহিয়াছে পৃথিবী ভিতরে।
প্রেম বিধাতার দান স্বর্গীয় বিভব,
অন্তর সম্পদ!
ক্ষুদ্র স্বার্থ সংকীর্ণ আকারে
হৃদয়ের দীনতা প্রচারে।

জগতের আবিলতা—
হিংসা-দ্বেষ দুঃখের আকারে,
সহিতে না-পেরে
বিধাতার ভালবাসা নেমে আসে
মহাপুরুষের ছদ্মবেশে—
অফুরান প্রেমদান তরে।
স্নেহ-প্রেম-দয়ামায়া আদি—
হৃদয়ের অমূল্য সম্পদ
বিতরিতে জগৎবাসীরে,
আর দেখাইতে তাহাদের
চিরশান্তি-চিরমুক্তি-চিরকল্যাণের পথ—
রচিবার তরে নবীন জগৎ।

পাখি

পাখিরা সকালে আপনার বাসা ছাড়ি চলে-
আকাশের পথে দূর হতে দূরে দলে দলে!
আহার সন্ধান করি সারা দিনমান
কাটায় পাখিরা।
সন্ধ্যায় তাহারা আসে ফিরে দলে দলে
আপন কুলায়ে।
আকাশের পথে যায় আর আসে
পথ ভুল হয় না কখনও—
এর কী কারণ?
সাগরের পথে কিংবা আকাশের পথে
চলিতে চলিতে—
দিক্-নির্দেশক যন্ত্র ব্যবহার করে মানুষেরা
যেন দিক্‌ভ্রান্ত না-হয় তাহারা।
পাখিরা কীরূপে দিক্‌ভ্রান্ত না-হইয়া ফিরে
আপনার নীড়ে?
মনে মনে ভাবিয়া কারণ
এ বিস্ময় জাগে অনুক্ষণ!
ইতর জীবের অনুভূতি
মানুষের হতে তীব্র অতি।

বুঝি সে-কারণে বিভ্রান্তি জাগে না
তাহাদের মনে।
অন্য কোন কারণ তো তার
দেখিতে পাই না আর।
ইহাই কি যথার্থ কারণ
কিংবা ইহা ভ্রম?
এ-সংশয় মিটে না কখনও।

ইচ্ছাময়ী

বৃক্ষ হতে শুষ্কপত্র ঝরি যায় পড়ি
চক্ষুর সম্মুখে—
সকলেই দেখে।
কিন্তু নাহি জানে উহার পিছনে
কোন শক্তি করে কাজ অক্ষু-অন্তরালে
কার ইচ্ছাবলে?
ইচ্ছাময়ী মহাশক্তি তিনি—
সৃষ্টি-স্থিতি-প্রলয়ের তিনি নিয়ন্ত্রী,
জগতের মঙ্গলদায়িনী।
চন্দ্র-সূর্য-গ্রহ-তারা লয়ে
জগতের যত জীবগণ
তাঁর শুভ ইচ্ছাক্রমে
হতেছে চালিত অনুক্ষণ।
জগৎ ও জীবনের চেষ্টা-চিন্তা যত
সেই ইচ্ছাময়ীর ইচ্ছায়
নিয়ত হতেছে সংঘটিত।
মানুষেরা ভাবে—
বিজ্ঞানের অভিনব কৌশল সকল
করি উদ্ভাবন আপন বুদ্ধিতে
প্রকৃতিরে করিয়াছে জয়।
বুঝিতে পারে না তারা—
কোন মহা ইচ্ছাশক্তি চালিত করিছে
তাহাদের জীবন ভরিয়া,
কাহার ইচ্ছায় সংঘটিত হয়
জীবন-মরণ।

অজ্ঞান মানবগণ—
ইচ্ছাময়ী জননীরে তারা
জানে না কখনও।
ইচ্ছাময়ী মাতা—
আপনার মঙ্গল ইচ্ছায়
আবরিয়া আপন স্বরূপ
দেখাইছে লীলা অপরূপ।

মশা ও মাছি

মশা আর মাছি থাকে কাছাকাছি—
রাত আর দিবসের দুই প্রতিবেশী।
উৎপাতে তাহাদের সীমা যায় সহ্যের
মানুষেরা হয়ে ওঠে তিক্ত-বিরক্ত।
দিনে পাত পেতে বসে যারা খেতে—
মাছিদের উৎপাতে হয় প্রাণান্ত।
মশাদের কামড়ে ঘুমাইতে না-পেরে
রাতে প্রাণ হয় অশান্ত।
মাছিদের তাড়াতে পাখা হয় চালাতে,
ধূপ-ধূনা জ্বালাইয়া মশা হয় তাড়াতে।
মশারী আবিষ্কারে হল মশা জব্দ।
'হিট্' ছড়াইতে ঘরে মাছি সব স্তব্ধ।

দীপান্বিতা

ঘোর কৃষ্ণা যামিনী—
দীপের মালায় সজ্জিতা হয়ে
ঝলমল করি হাসিল,
অন্ধকারের বিরাট মহিমা গ্রাসিল।
প্রদীপের আলো অন্ধকারের
সব অহমিকা নাশিল।
দীপান্বিতার রজনীতে আজ
ঘরে ঘরে হল প্রদীপের সাজ—
আলোর বন্যা সারা দিক্‌দেশ ভাসাল,
আঁধারের বুকে আলোর জোয়ার আসিল।

আজি ঘোর রজনীতে—
মহাকাল-বুকে লীলারতা মাতা
নামিলেন এই মহীতে।
সন্তান সবে অভয় দানিতে
নামিলেন মাতা আজি ধরণীতে—
প্রসন্না তিনি বরদা।
কালীমাতা তিনি শুভদা।
নমো নমো নমঃ কালিকা জননী,
সন্তানে কভু ভুলোনা কো তুমি—
শরণ মাগিছে চরণে তোমার তাহারা,
কৃপা-কটাক্ষ দানো তাহাদের
শরণ লইছে যাহারা।

অমানিশা

নিবিড় নিকষ আঁধার রজনী
স্তব্ধ নিথর সারা বনভূমি—
বিশ্বভুবন নিদ্রামগন রয়েছে!
যেন মহাযোগী সন্ন্যাসী এক
মহাযোগে লীন হয়েছে!
তারকাখচিত অসীম আকাশ
রয়েছে চাহিয়া রোধ করি শ্বাস—
গভীর আঁধারে দৃষ্টি রয়েছে আবরি।
অন্ধকারের অপরূপ রূপে
অধীর আবেগে ধরি নিল বুকে—
বিশাল সাগর তরঙ্গ-বাহু প্রসারি!
অমাবস্যার গভীর নিশাতে—
কালের কামিনী মাতিয়া লীলাতে
মহাকাল-বুকে হরষিত চিতে
লীলা-নিমগন রয়েছে।
অমানিশা রাতি লীলার প্রকাশে
সার্থক হয়ে উঠেছে।
ঘন ঘোর অমানিশাতে।

মা

'মা' এই সুধামাখা নাম—
একাক্ষর মন্ত্র-সম জপি অবিরাম।
সদ্যোজাত শিশু
জন্মের প্রথম লগ্নে উচ্চারে এ নাম।
শিখাতে হয় না—
প্রাণের গভীরে আছে, নয় তা অজানা।
বিশ্বের জননী—
বিশ্বজুড়ি রয়েছেন তিনি।
জীবগণ
তাঁহারই চেতনা হতে লভিছে জনম।
ধরণীর যতেক রমণী
জন্মিতেছে সহজাত মাতৃভাব লইয়া সতত।
বয়সের অগ্রগতি সাথে
বিকশিত হয়ে যাহা পরিণতি লভিতেছে—
পরিপূর্ণ মায়ের আকারে, অতি ধীরে ধীরে।
এ মাতৃভাবের সর্বশ্রেষ্ঠ পরিণতি বিশ্ব-মাতৃত্বের রূপে—
যাহা আসে বিধাতার আশীর্বাদ হয়ে
জগৎ-কল্যাণ তরে মাতার স্বরূপে।
রমণীর জীবনের পূর্ণ সার্থকতা এই মাতৃভাবে।

গরু

পোষা প্রাণী যত আছে গৃহস্থের ঘরে
গরু হতে বেশি উপকারী নেই কেহ তাদের ভিতরে।
গ্রামে-গ্রামান্তরে দুগ্ধবতী গাভী—
দেখা যায় প্রতি ঘরে ঘরে।
প্রাণ-দান করে দুগ্ধ সকল লোকেরে।
মাতৃহারা শিশুগণ—
গাভী-দুগ্ধ পান করি বাঁচায় জীবন।
দধি-সর-ক্ষীর আদি যত
স্বাদু আর মিষ্ট খাদ্য সবই দুগ্ধজাত।
অন্যরূপ কোন খাদ্য না-করি গ্রহণ—
শুধুমাত্র দুগ্ধ-পানে বাঁচিবারে পারে কোনজন।

গাভী হতে যতবিধ উপকার হয়—
বলদের উপকার সে-ও ন্যূন নয়।
রোদে জলে ধানক্ষেত চষিবার
আর লাঙ্গল-টানার সর্ববিধ কাজে
বলদের হয় ব্যবহার।
কৃষকের ঘরে—
শ্রমসাধ্য যত কর্ম বলদেরা করে।
গাভী যদি গণ্য হয় জননীর মত
বলদেরে পিতারূপে দেখি যে সতত।
এত উপকারী বন্ধু এই গরু হেন—
জগতের মধ্যে আর না-হয় কখনও।

কৃপাভিক্ষা

মাগো, কেন টেনে আনিতেছ মোরে—
বারে বারে এ-সংসারে?
বুঝিতে অক্ষম আমি উদ্দেশ্য তোমার।
যন্ত্র করি মোরে, কোন সে উদ্দেশ্য নব
চাহ সাধিবারে?
সংসার মাঝারে—
বাসনাতরঙ্গ মনে জাগে বারে বারে।
সে বাসনা পুরাইতে
হয় পুনঃ জন্ম নিতে।
কিন্তু মোর মন—
জন্ম-মরণের আবর্তন
চাহে না সহিতে আর।
কাতর অন্তরে তাই
তব কৃপাকণা ভিক্ষা চাই।
বাসনা হইতে মুক্ত করি—
'নির্বাসনা' করি দাও মোরে।
এ-মিনতি জানাই তোমারে।

কুকুর

কুকুরের প্রভুভক্তি তুলনারহিত।
পরম বিশ্বাসী-রূপে জগতে বিদিত।
পৃথিবীর সব দেশে দেশে
বন্ধু আর ভৃত্য-সম কুকুরেরে পোষে।
তীব্র ঘ্রাণশক্তি সহকারে
প্রভু কিংবা অন্য কেহ চিনিতে সে পারে।
যে-দেশের জনগণ যেই খাদ্য করেন গ্রহণ
সে-দেশের কুকুরেরা সেই খাদ্য করিবে ভক্ষণ।
গৃহের প্রহরী-রূপে কুকুর সতত—
দিবারাত্র প্রভুগৃহে পাহারায় রত।
কভু শূন্যঘর রাখি প্রভু যদি বাহিরিয়া যায়—
বিশ্বস্ত দ্বারীর মত কুকুরেরে দেখি পাহারায়!
কিন্তু যদি কখনও সহসা উন্মাদ হইয়া যায়—
সুমুখে যাহারে পায় তীক্ষ্ণ দাঁতে তারে কামড়ায়
কুকুরের সে-কামড়ে ভয়ংকর জলাতঙ্ক রোগ
দেখা দেয় প্রাণীর শরীরে।
জল দেখি আতঙ্কে লুকায়
জলাতঙ্ক রোগ বলে তায়।
জলাতঙ্ক রোগ হলে পরে
কোন চিকিৎসায় নাহি সারে।
যদি রোগ প্রকাশের আগে
কামড়ের সাতদিন পূর্ণ না-হইতে—
সুচিকিৎসা হয়,
তবেই সে রোগ হয় পূর্ণ নিরাময়।
গুণ আর দোষের বিচারে—
দোষের অধিক গুণ কুকুরেরা ধরে।

কৃতজ্ঞতা

জীবনের শেষের বেলায়
কবিতা লেখার আকস্মিক যে-শকতি
দিয়াছ আমায়—
প্রত্যাশা ছিল না যাহা,
হে জীবননাথ,
সে কৃপার তরে মোর হৃদয়ের কৃতজ্ঞতা
নতশিরে জানাই তোমারে।
আমার মনের মধ্য হতে
ভাল-মন্দ কবিতার রাশি—
সহসা কেমনে আজি উঠিল উচ্ছ্বসি!
নব চিন্তা নব ভাবরাজি
ভাষার মাধ্যমে আজি
চায় প্রকাশিতে আপনায়
মোর এই জীবন সন্ধ্যায়!
ভাবিতে পারিনি কোনদিন—
মনের গহন কোণে এত সব ভাবরাশি
কেমনে লুকায়ে ছিল এতদিন?
মোর হৃদয়ের কৃতজ্ঞতা
গ্রহণ করিয়া, হে দেবতা,
কৃতার্থ কর আমারে।
জীবনের শেষের প্রহরে—
এ মিনতি জানাই তোমারে।

ভাইফোঁটা

দীপান্বিতা মহানিশা শেষ হলে পরে—
দ্বিতীয়া তিথিতে বোনেরা ভায়েরে
ফোঁটা দেয় তাহাদের কল্যাণের তরে।
ফোঁটা পরাবার এই রীতি
রহিয়াছে প্রতি ঘরে ঘরে।
ভায়ের কপালে দিয়া ফোঁটা—
যমের দুয়ারে দেয় কাঁটা।
বোনের হাতের ফোঁটা গ্রহণ করিয়া
ভাইদের পরমায়ু যাইবে বাড়িয়া।

সুদীর্ঘ জীবন আর মঙ্গল লভিতে—
ভগিনীরা ফোঁটা দেয় হরষিত চিতে।
এইরূপে হৃদয়ের আদান-প্রদানে
মধুর সম্পর্ক জাগে উভয়ের প্রাণে।
স্বার্থগন্ধহীন এই সুপবিত্র হৃদয়-বন্ধনে
উভয়ে আবদ্ধ রহে জীবনে-মরণে।
ভাই ভগিনীর আর ভগিনী ভ্রাতার
সর্বশ্রেষ্ঠ বন্ধু হয়, নহে কেহ আর।
উভয়ের মঙ্গলের তরে
উভয়ে প্রার্থনা করে—
কাতর অন্তরে বিধাতারে স্মরে।
ভাই-বোন সম্পর্কের মত
এমন সম্পর্ক আর নাই এ জগতে
যাহা তুলনা রহিত।

নির্ভরতা

হে মোর বিধাতা,
তুমি যে আমার আপন হইতে আপনার—
এই অনুভূতি দাও মোরে।
অনুক্ষণ এ চঞ্চল মনে—
পারি যেন রাখিবারে তোমার চরণে,
না-ভুলি তোমারে।
কচ্ছপ-মাতার মন
যেইরূপ সর্বক্ষণ পড়ে থাকে নদী-বালুচরে,
আপনার ডিমের উপরে।
সমস্ত জীবন ভরে একান্ত নির্ভর
যেন পারি রাখিবারে
তোমার চরণ 'পরে।
ঝড়ের মাঝারে উচ্ছিষ্ট পাতার মত—
বায়ু উড়াইয়া লয় যখন যেখানে
পড়ে থাকে সেইখানে নিশ্চেষ্ট হইয়া।
সেইরূপ নিশ্চেষ্ট হইতে পারি যেন তোমারে স্মরিয়া।
সকল নির্ভর পারি যেন রাখিবারে
চিরস্থির তব শ্রীচরণ 'পরে।

ব্যাকুলতা

ভগবান, তুমি রহিয়াছ সকলের হৃদয় মাঝারে—
এই সত্য জানি মনে কিন্তু তোমা দর্শনের তরে
ব্যাকুলতা নাহি জাগে প্রাণের ভিতরে।
মোর চিত্তে জাগাইয়া দাও সেই তীব্র ব্যাকুলতা
লভিবারে তোমার দর্শন—
সার্থক করিতে এ জীবন।
হৃদয়ের সেই ব্যাকুলতা আনি দাও আমার মাঝারে—
জাগে যাহা বৎসের লাগিয়া
গাভীর অন্তরে।
ব্যাকুল হইয়া—
তোমারে খুঁজিব নিরন্তর
সব মন দিয়া।
সন্তানের তরে জননীর প্রাণে
জাগে যেই ব্যাকুলতা,
সতী নিজ পতি লাগি যেমন আকুল হয়—
সেই ব্যাকুলতা দিয়া প্রাণ দাও ভরি,
যেন রাত্রি-দিন কোথা দিয়া যায় কাটি
বুঝিতে না পারি!
সুতীব্র সে ব্যাকুলতা যার অনুভূতি
সংসারীরে গৃহছাড়া করে—
যায় চলি তপস্যার তরে অরণ্য-ভিতরে।
যতক্ষণ তোমার দর্শন না পাই হৃদয় মাঝে
আকুল হইয়া তোমা খুঁজিবার তরে—
সীমাহীন ব্যাকুলতা জাগাইয়া দাও
আমার অন্তরে।

অন্য আমি

জীবনের শেষের বেলায়
মরণের দ্বার হতে ফিরি আসিলাম পুনঃ
পুরাতন আমিরূপে—
কিন্তু অন্য আমি!

অন্তরে-বাহিরে ভিন্ন মন ভিন্ন ভাব লয়ে।
এ পরিবর্তন শুধুমাত্র বুঝিলাম আমি—
নহে অন্যজন!
পুরাতন আমিরে লইয়া করিছে কৌতুক
এই অন্য আমি
সংসারের কাজে মাতি কেটে গেছে মোর
এই সুদীর্ঘ জীবন।
কবিতা লেখার চিন্তা মনে মোর
জাগেনি কখন।
আজ কী কারণে জীবন-সন্ধ্যায় বসি—
লিখিতেছি এ সব কবিতা
রাশি রাশি?
তাই মনে জানি—
আমার মাঝারে বসি
লিখিতেছে সকল কবিতা
অন্য এক আমি!
নতুবা হইত অসম্ভব—
এত অল্প সময়েতে শতাধিক
কবিতা লিখন।
ভাবি তাই অনুক্ষণ!
কিন্তু কেন সেই অন্য আমি
পুরাতন আমিরে লইয়া
করিতেছে নিত্য নব খেলা কৌতুকে মাতিয়া
অন্তহীন এ বিস্ময় মনে
রহিল জাগিয়া!

গোপন আশা

মা মা বলিয়া অবিরাম চলিব ডাকিয়া
সুগোপনে মনের গহনে—
এই আশা রহিয়াছে মনে!
ক্ষুদ্র এই জীবন ভরিয়া প্রাণ-মন উজার করিয়া
অর্পণ করিতে যেন পারি
তোমার চরণে—
এই আশা মনে!

তোমার উপর সমস্ত জীবন ভরি
পারি যেন করিতে নির্ভর।
এই আশা জাগে মনে মোর।
আশা করি মনে—
ধ্রুবতারা সম রবে তুমি
আমার জীবনে।
অশান্ত এ মনে তোমার স্মরণে
যেন শান্তি আনে—
এই আশা জাগে সর্বক্ষণে।
সংসারের কাজে জড়াইয়া
তোমার চরণ হতে মন মোর
না যায় সরিয়া।
কাটে দিন এ আশা লইয়া।
সুদীর্ঘ এ জীবনের অন্তিম লগনে—
মনস্কাম পূর্ণ হবে তোমার দর্শনে।
এ অপূর্ব আশা জাগে মনে।
আশায় আশায় জীবনের বেলা বয়ে যায়—
আশা পূরণের আশা
রাখিলাম তব শ্রীচরণে,
হৃদয়ের নিভৃত গহনে!

করুণা

যুগে যুগে তোমার করুণাধারা
বর্ষিত হতেছে জগতের 'পরে—
জীবগণ তরে।
কৃতজ্ঞতা জানাইতে তব পূজা করে মানুষেরা
বৎসরে বৎসরে—
নানা উপচারে।
অন্য প্রাণীসব তোমার করুণারাশি
করে অনুভব প্রাণে প্রাণে—
প্রকাশের ভাষা নাহি জানে।
অরণ্যের পশুপাখি আর জীবগণ
তোমার করুণা অনুক্ষণ করিছে স্মরণ—

আপনার হৃদয়ের তলে
কৃতজ্ঞতা-দীপ রাখি জ্বেলে।
স্থলে-জলে-আকাশে-বাতাসে
তোমার করুণাধারা
সর্বত্র প্রকাশে।
পৃথিবীর যত উষ্ণদেশে বারিধারা বেশে—
তব অকৃপণ করুণার ধারা
ঝরিছে নিঃশেষে।
তুষার আবৃত মেরুদেশে জলচর জীবের জীবন
বাঁচাবার তরে—
সাগরের জলে আবরিয়া রাখিয়াছ
কঠিন তুষারে।
জীবের কল্যাণ তরে ঋতুচক্র আবর্তন করে
বৎসরে বৎসরে।
তব সৃষ্ট এ জগৎ জুড়ে
যে-দিকে ফিরাই দৃষ্টি
তব অনুপম করুণা প্রচারে।

কর্ম্মফল

জীবগণ নিজ কর্মফলে আসিয়া সংসারে—
সহিতেছে সুকঠিন জীবন যন্ত্রণা।
ফিরে ফিরে।
বুঝিতে পারে না কোন মতে—
কীরূপে লভিবে মুক্তি এই জন্ম-মরণের
সুকঠিন আবর্ত হইতে।
বাসনার বশে নব নব ইচ্ছার তরঙ্গ
মনে আসে।
ইচ্ছা-পূরণের তরে সংসার মাঝারে
শতবিধ কর্ম-কোলাহলে
জড়াইয়া পড়ে।
নিত্য নব আশা জাগে মনের মাঝারে—
মিটাইতে সেই সাধ জন্মে জন্মে ঘুরে
আসে ফিরে ফিরে।

ভাল-মন্দ নানাবিধ কর্ম প্রচেষ্টায়—
জীবনের উদ্দেশ্য ভুলিয়া
আপনারে বন্ধনে জড়ায়।
সংসারে আসিয়া জ্ঞানীগণ—
অবিরত করেন যতন
কায়মনে ডাকি বিধাতারে
কর্মফল খণ্ডনের তরে।
কিন্তু ভবিতব্য কারও হয় না খণ্ডিত—
নিষ্ফল হইতে থাকে
তার চেষ্টা যত।
জীবন ভরিয়া যদি পারে বিধাতার শরণ লইতে—
অংশমাত্র কর্মফলে পারে নিবারিতে।
সুকর্ম ও দুষ্কর্মের ফল ভোগ হয় এই পৃথিবীতে
যার তরে জীবগণ জন্মে জন্মে
আসে এ জগতে।
কর্মফল ভোগ বিনা নাহি পরিত্রাণ—
নতশিরে চিরদিন মেনে নিতে হবে
বিধির বিধান।

বিধিলিপি

জন্মের আদিতে বিধিলিপি লয়ে জীব
সংসারেতে আসে।
জন্মের মুহূর্ত হতে সেই বিধিলিপি
জাতকের জীবন নির্দেশে।
মাতাপিতা শিক্ষকাদি শুভাকাঙ্ক্ষী যত—
শত চেষ্টা করি তারে পারে না
করিতে মনোমত।
বিধিলিপি অনুসারে হয় তার
জীবন গঠিত।
ধনী কিংবা দরিদ্র আবাসে—
বিধির বিধান সমভাবে আসে।
পক্ষপাতশূন্য তাহা উচ্চ-নিচ
সুখী-দুঃখী সকলের তরে।

সমভাবে ধরা দেয় নির্বিচারে
সকলের ঘরে।
দরিদ্র-সন্তান যারা সৌভাগ্য লইয়া
পৃথিবীতে আসে—
ধন-মান সুখ-শান্তি লভিবারে
পারে অবশেষে।
দুর্ভাগ্য লইয়া যবে আসে
উচ্চবংশে বিত্তবান ঘরে—
ভাগ্যের নিষ্ঠুর চক্র পেষণ করিয়া
তারে মারে।
একনিষ্ঠ হয়ে রাতে দিনে ভগবানে
করিলে স্মরণ
দুর্ভাগ্য হইতে পারে আংশিক খণ্ডন।
ভাগ্যবান ভুলি বিধাতারে
নিজভাগ্যে মত্ত হয়ে যবে করে অহংকার,
দুর্দশার শেষ নাহি হয় জীবনে তাহার।
দেবতার শরণ লইয়া সৌভাগ্য-দুর্ভাগ্য দুই
সমভাবে যারা সহিবারে পারে—
দেবতা সদয় হন তাহাদের 'পরে।
শক্তি দেন তাহাদের সুখ-দুঃখময়
এই জীবনেরে সহ্য করিবারে।

একাগ্রতা

একাগ্রতা জীবনেতে অতি প্রয়োজন।
উহা বিনা সফলতা
আসে না কখনও।
শিশুদের বিদ্যাভ্যাস হতে আরম্ভ করিয়া
জীবনের সর্বকর্ম সুসম্পন্ন হয়
একাগ্রতা দিয়া।
সংসারীর মনে কিংবা সন্ন্যাসীর মনে—
একাগ্রতা না-থাকিলে সফলতা
আসে না জীবনে।
চিন্তা-চেষ্টা যতকিছু মানুষেরা করে
একাগ্রতা বিনা উহা
ব্যর্থ হয়ে ফিরে।

নিষ্ঠা সহকারে যেই একাগ্র অন্তরে
চেষ্টা চালাইতে থাকে
বহু ধৈর্য ধরে—
সুনিশ্চিত সফলতা করিয়া অর্জন
মহানন্দে কাটায় জীবন।
পুরাণে বর্ণিত আছে একলব্য কথা—
লভেছিল জীবনে যে
শ্রেষ্ঠ সফলতা।
গুরু দ্রোণাচার্য-মূর্তি সম্মুখে স্থাপিয়া
অস্ত্রশিক্ষা করেছিল একাকী বসিয়া—
অন্তরের সুগভীর একাগ্রতা নিয়া।
অপূর্ব সাফল্য লভি আচার্য দ্রোণেরে
বিস্মিত করিয়াছিল
কৃতজ্ঞ অন্তরে।

ব্যর্থতা

ব্যর্থতার গ্লানি
জীবনেরে দগ্ধ করে জানি।
ব্যর্থতার বিড়ম্বনা
মরণ-যন্ত্রণা সম মানি।
জগৎ মাঝারে বহু মানুষের
করুণ কাহিনী শুনি
ব্যর্থ জীবনের।
বিফল জীবনে মরণ-অধিক ব্যথা
সহিতে না-পেরে
বহু লোক আত্মহত্যা করে
মুক্তিলাভ তরে।
ধৈর্যশীল নিষ্ঠাবানগণ
ব্যর্থতারে মনে করে
সার্থকতা লভিবার
প্রথম সোপান।
ধৈর্য-সহকারে পুনঃপুনঃ চেষ্টা করে
সফলতা লভিবার তরে।

অবশেষে ভাগ্যলক্ষ্মী প্রসন্ন আননে—
করেন তাহারে তুষ্ট
অভীষ্ট প্রদানে।
সার্থকতা জীবনের শ্রেষ্ঠ আশীর্বাদ।
ব্যর্থতা বাহিয়া আনে ঘোর পরমাদ।

আনন্দ

(বিষয়ানন্দ—ভজনানন্দ—ব্রহ্মানন্দ)

ত্রিবিধ আনন্দ আছে জগৎ মাঝারে—
বিষয় আনন্দ সংসারীরা ভোগ করে।
ভজনে আনন্দ পান সাধুসন্ত আর মহাজন—
ব্রহ্মানন্দ লভিবারে সচেষ্ট রহেন জ্ঞানীগণ।
এ তিনের মধ্যে শ্রেষ্ঠ ব্রহ্মানন্দ যাহা,
ভজন-আনন্দ মধ্যপথে রহে তাহা।
বিষয়-আনন্দ রহে সর্বনিম্ন স্থানে—
সে আনন্দ শুধুমাত্র সংসারীরা জানে।
বিষয় লাভের তরে সচেষ্ট রহেন যত্ন সহকারে—
বিষয় পাইলে উহা শ্রেষ্ঠ পাওয়া বলি গণ্য করে।
মধ্যপন্থীগণ
কীর্তন-ভজন করি কাটান জীবন।
সে আনন্দে অনুক্ষণ রহেন মগন।
মহাজন-পথ অনুসারি
ধীরে ধীরে যান অগ্রসরি
শ্রেষ্ঠ পথ পানে—
ব্রহ্মানন্দ লভিবার সহজ উপায় ইহা, জানে।
ব্রহ্মচারী হয়ে যারা সন্ন্যাস-জীবন
যাপন করিয়া চলে সারাটা জনম—
নির্মোহ হইয়া সংসার ত্যজিয়া
অরণ্য-পর্বতে ফিরে সাধন করিয়া।
একনিষ্ঠ মনে সুকঠোর সাধনের ফলে
আত্ম-অনুভূতি লাভ হয় তার কালে।
এ অপূর্ব অনুভূতি বর্ণনা না হয়
ইহারেই ব্রহ্মানন্দ বলি জ্ঞান হয়।

ব্রহ্ম অনুভূত হয় অন্তরে বাহিরে—
ব্রহ্ম বলি অনুভব হয় আপনারে।
ব্রহ্মের স্বরূপ লভি শেষে
ব্রহ্মের সাগরে যায় মিশে।

স্বপ্ন

স্বপ্ন সত্য নহে কভু ভ্রমমাত্র তাহা—
সত্যরূপে মনে হয় যাহা।
মনের গভীর-তলে সুপ্ত চিন্তারাজি
সত্যের আকারে ওঠে জাগি
নিদ্রার মাঝারে।
আকস্মিক ভাবে ক্বচিৎ কখনও
কোনও কোনও স্বপ্ন দেখি
ঘটনার রূপে সত্য হয়ে ওঠে।
কখনও বা দেখা যায় ভগবৎ কৃপা
কতিপয় মানব-জীবনে—
আসে স্বপ্নের মাধ্যমে
ক্ষণে ক্ষণে।
সে কৃপা লভিলে জনম সার্থক হয়—
"স্বপ্নসিদ্ধি" উহারেই কয়।
স্বপ্নেরে ঘটনা ভাবি বিভ্রান্ত হইয়া
কোন জন দুঃখ পায় জীবন ভরিয়া।
সুস্বপ্ন দেখিয়া কেহ
আনন্দেতে হয় আত্মহারা।
দুঃস্বপ্ন বহিয়া আনে নয়নেতে ধারা।
সুস্বপ্নে গোপন রাখে মনের গহনে—
সফল হইতে পারে ভাবি মনে মনে।
দুঃস্বপ্নে প্রচার করে সকলের কানে
বহু-প্রচারিত স্বপ্ন ব্যর্থ বলি জানে।
আপন জীবন সফল করার স্বপ্ন
দেখে যেই জন—
আত্ম-অনুভূতি লভিবার চেষ্টা মাঝে
রহেন মগন।
কঠোর সাধনে রত থাকি অবিরত—
সে জীবন-স্বপ্নে করে সত্যে পরিণত।

শতবর্ষ আগে

এসেছিলে দুইজনে ভিন্নরূপে ভিন্ন নামে
এই ধরাধামে।
এক প্রাণ-মন লয়ে দুই ভিন্ন গ্রামে!
ঘুচাইতে কলির তমসা বিকীর্ণ করিয়া প্রেমজ্যোতি
জানাতে বিশ্বেরে পথের সন্ধান—
লভিবারে জীবনের উদ্দেশ্য মহান।
আপনারে আমরণ রাখি সুগোপন
সামান্য ক'জন ত্যাগীর মাঝারে—
প্রকাশিলে আপন স্বরূপ
মানব আকারে।
শিখাইলে তাহাদের সুকঠোর সাধনা করিয়া
জীবনের যথাযথ উদ্দেশ্য লভিতে—
আপনার স্বরূপ জানিতে।
ছড়াইতে বিশ্বময় তব অমৃত-বারতা অভিনব—
জগৎবাসীরে উদ্ধারিতে
কলির তমসা বিদূরিতে।
শিক্ষাদান করি সমাপন মর্ত্যতনু ত্যজিয়া তখন—
প্রবেশিলা সূক্ষ্মদেহে জননীর অন্তর মাঝারে
বিশ্বজনে উদ্ধারের তরে।
ষোড়শী-জননী রূপে পূজিয়া যাঁহারে
মাতৃমন্ত্রে করিয়া দীক্ষিত—
রাখি গেলে জগৎবাসীর তরে
অপূর্ব প্রতিমা এক করিয়া চিহ্নিত।
উদ্ধারিতে যত অশিক্ষিত দীনহীন
দুঃখী ও পতিত।
দীর্ঘকাল ধরি জননী তোমারে স্মরি
করিলা সাধন—
জীব-উদ্ধারের ব্রত তিল তিল করি
নিঃশেষিয়া আপন জীবন।
শিখালেন জগৎবাসীরে
শান্তি লভিবার পথ,
জানালেন তাহাদের অমৃত-বারতা—
পরমাত্মা রয়েছেন সমভাবে সবার মাঝারে
উচ্চ-নীচ প্রভেদ না-করে।

তাই সকলেরে পরমাত্মাস্বরূপ জানিয়া
আপন করিয়া নিতে অকৃপণ ভালবাসা দিয়া।
শান্তির এ সুমহান পথ নির্দেশিয়া
গেলেন মিশিয়া আপন স্বরূপে।
নশ্বর এ মরদেহ ত্যজিয়া পলকে।

শ্রীকৃষ্ণ

দোর্দণ্ডপ্রতাপ মথুরার রাজা কংস—
তার অত্যাচার সহিতে না-পেরে,
প্রজাগণ সকাতরে প্রার্থনা জানায় বিধাতারে—
এই অত্যাচার হতে মুক্তি দান তরে।
মথুরাবাসীর এই কাতর ক্রন্দন করিয়া শ্রবণ
ধরণীর পাপভার করিতে হরণ—
অবতীর্ণ হইলেন নিজে নারায়ণ।
কংস-কারাগারে দেবকীর পুত্র রূপে
জন্মিলেন তিনি শুভ অষ্টমী তিথিতে—
কংসেরে বধিতে।
কিশোর বয়সে মল্লযুদ্ধে নাশিলেন কংসের জীবন।
এ মহৎ দৈবকার্য করি সমাপন—
দেখিলেন নারায়ণ,
কংস-হেন বহু অত্যাচারী নৃপতির অত্যাচারে
জর্জরিত এই ভারতের জনগণ।
জগতের পাপভার করিতে হরণ
উদ্ধারিতে জগজ্জন তাঁর আগমন
এই ধরণীতে মানব রূপেতে।
দেখিলেন তিনি, হায়,
সাম্রাজ্যের লোভবশে
করিতেছে হানাহানি ভ্রাতায় ভ্রাতায়।
অধর্মের বিনাশ সাধিতে—
ধর্মপক্ষ সমর্থন করি
কুরুক্ষেত্র মহারণ রচিলেন হরি।
মায়াবশে আত্মজ্ঞানহীন অর্জুনেরে
ভ্রাতৃবধে অনিচ্ছুক হেরি—
ভাগবত গীতা-উপদেশ দানিলেন হরি।

মহাজ্ঞান লাভ করি অর্জুন তখন
একান্ত আগ্রহী হয়ে যুদ্ধে দিল মন।
কুরুক্ষেত্র মহাযুদ্ধ অবসান হলে
ভারতের বুকে ধর্মরাজ্য করিয়া স্থাপন—
বুঝিলেন নারায়ণ জগতে থাকার
আর নাহি প্রয়োজন।
মুনিবর-অভিশাপ সফল করিতে
অজানা ব্যাধের শর নিলেন দেহেতে—
বৃক্ষ 'পরে হইয়া আসীন
মহা সমাধিতে দেহ করিলেন লীন!

ছবি

প্রথম চিত্র ঃ
দক্ষিণেশ্বরে পঞ্চবটী-ধারে
ন'বতের দোতলার ঘরে—
জ্যোৎস্না-ধৌত পূর্ণিমা নিশিতে
সারদা জননী আছেন আসীন—
আত্মমগ্না সমাধিতে লীন!
অপূর্ব এ ধ্যানচিত্রখানি
মনের মুকুরে মোর
রবে চিরদিন!

দ্বিতীয় চিত্র ঃ
দক্ষিণেশ্বর, দেবী ভবতারিণী মন্দির,
সম্মুখের দীর্ঘ নাটমন্দির ভিতরে
ক্ষীণ দীপালোকে—
আত্মারাম রামকৃষ্ণ প্রভু
দীর্ঘ পদক্ষেপে করিছেন বিচরণ
আত্মানন্দে হইয়া মগন!
গভীর অরণ্য-মাঝে পশুরাজ
সিংহের মতন।
অভিনব এই চিত্র
জাগরূক রবে মনে আজীবন।

তৃতীয় চিত্র ঃ

রামকৃষ্ণ ঠাকুরের ঘরে
অমানিশা রজনী-গভীরে
মাতা সারদারে
নববস্ত্রে ধূপ-দীপ জ্বালি—
যোড়শী-জননী রূপে পূজারত

পূজক-পূজিতা দোঁহে
আত্মমগ্ন সমাধি-বিলীন।
ভাবময় এই চিত্রখানি
কোনদিন ভুলিব না আমি।

সূর্যমুখী

সূর্যমুখী ফুল, তুমি মেলিয়া নয়ন—
করিছ দর্শন
প্রভাতরবির সোনালী কিরণ।
সার্থক করিছ প্রাণমন।
প্রভাতের রবি, দেখিছে তোমার ছবি—
কুসুমিত বনে, মুখরিত বিহগ কূজনে,
আনত নয়নে।
কলকল তানে স্রোতস্বিনী
শুনাতেছে তোমার কাহিনী
সাগরের কানে।
শ্যামল বনানী,
বহুবর্ণ ফুলসাজে সাজিয়া আপনি—
তোমার রূপেতে হার মানি,
রয়েছে নিশ্চুপ।
তোমারে হেরিয়া প্রাণ আকুলিয়া
করিছে গুঞ্জন ভ্রমর-ভ্রমরীগণ।
ওগো সূর্যমুখী,
তুমি বিতরিছ সূর্যের সৌরভ
জগৎজনেরে।

প্রকাশিছ তাঁহার করুণাকণা
যিনি রচেছেন তোমা
অনুরাগ ভরে।
ধন্য তুমি পুষ্পের মাঝারে।

অহংকার

অহংকার মনের বিকার
জাগে মানুষের মনে—
ভাগ্যেরে করিয়া হীন
আপনারে বড় বলি জানে।
মত্ত হয়ে অহংকারে ন্যায়-অন্যায়ের
বিভেদ ভুলিয়া যায় তলাইয়া
ধীরে দীরে পাপের তিমিরে।
বুঝিতে চাহে না—
ভাগ্য মানুষেরে করে বড়
নহে অহংকার।
ভাগ্যেরে মানিতে হয় শ্রদ্ধা সহকারে
নতশিরে সবাকার।
সৌভাগ্যের উচ্চভূমি আরোহণ করি
অহংকার ভরে যারা ভাগ্যেরে করিবে অস্বীকার—
অচিরে পতন হবে
দুঃখভোগ হবে অনিবার।
জ্ঞানীদের মন অশেষ সৌভাগ্য লাভে
অহংকারী হয় না কখন।
কৃতজ্ঞ হৃদয়ে অনুক্ষণ
ভাগ্যেরে মানিয়া চলে
সমস্ত জীবন।
মানুষের বড় শত্রু এই অহংকার—
সর্বনাশ বহি আনে জীবনে তাহার।

লোভ

লোভ মানুষের অন্যতম বড় শত্রু।
লোভের কারণে জীবন বিনষ্ট হয়,
মৃত্যু ডেকে আনে।
লোভী মানুষের জন্ম হয় এ সংসারে—
প্রতি পদে দুঃখ ভোগ তরে।
জীবন-বিধ্বংসী যুদ্ধ যত দেশে দেশে
অবিরত হয়.
তাহার কারণ একমাত্র লোভ ছাড়া
অন্য কিছু নয়।
পরের সাম্রাজ্য গ্রাসিবারে
এক দেশ অন্য দেশ-সহ যুদ্ধ করে।
সমষ্টি জীবনে আর ব্যষ্টি জীবনেতে—
লোভের স্বরূপ দেখা যায়
চারি ভিতে।
লোভরূপী মহাশত্রু বিনাশ করিতে—
সংযম-অভ্যাস অস্ত্র
হয় হাতে নিতে।
নিষ্ঠাভরে সংযমের অভ্যাস করিলে—
ধীরে ধীরে মন হতে লোভ যায় চলে।
অন্তরে বাহিরে শান্তি লভিবার
এই একমাত্র পথ—
সর্বত্র স্থাপিয়া শান্তি পূর্ণ কর
নিজ মনোরথ।

ঘৃণা

ঘৃণা মানুষেরে ঠেলি লয় নরকের দ্বারে।
ঘৃণা হতে ঘৃণ্য আর কিছু নাই
লোকের অন্তরে।
দীন-দুঃখী পীড়িতের প্রতি ঘৃণা আসে যদি
অহংকারে মাতি—
অচিরে ভুগিতে হবে তাহাদের সমান
দুর্গতি।

দয়া যাহাদের প্রাণে বহিছে নিয়ত
ঘৃণারে ভুলিয়া থাকে তাহারা সতত।
দয়ালু হৃদয়ে ঘৃণা প্রবেশের পথ নাহি পায়।
দয়ারে দেখিলে ঘৃণা ভয়েতে লুকায়।
মানুষের মনে ঘৃণা আনে অভিশাপ—
পরিণামে পায় মনস্তাপ।
অতি ঘৃণ্য জনেরে যে ঘৃণা নাহি করে—
বিধাতার আশীর্বাদ বর্ষে তার শিরে।

বিজলি বাতি

যত রূপ বাতি জ্বলে মানুষের ঘরে—
বিজলী বাতিরে দেখি সবার উপরে।
মেঘের বিজলী হতে উদ্ভব ইহার
তাই এই নাম লোকে করে ব্যবহার।
রাতের আঁধারে যত পথচারী জন
বন্ধু বলি এ বাতিরে করেন যতন।
বিজলী মশাল ঘোর অন্ধকার পথে
উপকারী বন্ধু-সম চলে সাথে সাথে।
আকস্মিক প্রয়োজনে ব্যবহার তরে
রাতের শয্যাতে কেহ রাখেন ইহারে।
এ বাতির প্রচলন যখন ছিল না—
রাতের আঁধারে লোক ভুগিত যন্ত্রণা।
মহানগরীর যত পথ বাড়ি আজ
বিজলী আলোক পরি করিয়াছে সাজ।
সুতীব্র এ আলো জনমনে
দিবালোক সম ভ্রম আনে—
দিন আর রজনীর তফাত না জানে।
ছোটখাটো বহু গ্রামে আজও দেখা যায় —
বিজলী বাতির আলো ঢোকেনি যেথায়।
বিজলী মশাল যদি সেথা কেহ পায়
ভাগ্যবান বলি সেই জানে আপনায়।

চিন্তা

মনুষ্য জীবনে চিন্তা অতি বড় ধন—
জীবন মাত্রেরে উহা করে নিয়ন্ত্রণ।
এ জগতে যত কার্য সুসম্পন্ন হয়—
চিন্তারূপে আগে হয় মনেতে উদয়।
মানসে হইয়া সৃষ্ট সেই চিন্তা যত
বিবিধ কর্মের রূপে হয় প্রকাশিত।
নিত্য নব আবিষ্কার জগৎ ভিতরে—
জন্ম লয় প্রথমে তা চিন্তার মাঝারে।
সুচিন্তা ও কুচিন্তা লোকেরে—
স্বর্গ আর নরক মাঝারে
লয়ে যায় ধীরে!
দুশ্চিন্তা যাহারে গ্রাসে
মরণ-যন্ত্রণা তার আসে।
চিন্তাশীল মনীষীর চিন্তার ঐশ্বর্য যত
ধরা দেয় কাব্য আর শিল্পেতে সতত।
আত্মজ্ঞানী সন্ন্যাসী যাহারা
সুগভীর ধ্যান-চিন্তা হতে
সফলতা লভিছে তাহারা।

চেষ্টা

মনুষ্য-জীবনে চেষ্টা আনে সফলতা—
নিশ্চেষ্ট লোকের জন্ম এ জগতে বৃথা।
চেষ্টা হতে যত অসাধ্য সাধন হয়
জগতে নিয়ত।
চেষ্টা মানুষে বড় গুণ—
আর কোন গুণ নাই চেষ্টার মতন।
একান্ত মনের চেষ্টা
ব্যর্থতারে জয় করি আনে সফলতা।
জগতের যত সব মহৎ সৃজন—
ক্রমাগত চেষ্টা বিনা হত না কখন।
.ত-আকাশে
মনুষ্য-চেষ্টার ফল সর্বত্র প্রকাশে।

মনুষ্য-জগতে দেখি তাই—
চেষ্টার অসাধ্য কর্ম নাই।
নিরলস চেষ্টা দিয়া জ্ঞানীরা সতত
আপন স্বরূপ জানিবারে
রহেন নিরত।
মানুষের জীবনের এত বড় ধন—
নাই আর কিছু এই চেষ্টার মতন।

দৈব ইচ্ছা

আপন ইচ্ছাতে লোক সব কাজ করে—
এ ধ্রুব বিশ্বাস আছে সবার অন্তরে।
ছোট-বড় যত কর্ম সংসারেতে হয়—
নিজ ইচ্ছা ভিন্ন উহা অন্য কিছু নয়।
মনে করিলেই কাজ করিতে সে পারে—
ইহাকেই ধ্রুবসত্য বলি মনে করে।
এ স্বাধীন ইচ্ছা কিন্তু রয়েছে সীমিত—
দড়ির বাঁধনে বাঁধা ছাগ-গরু মত।
ইহার অধিক ইচ্ছা মানুষের যত—
দৈবের ইচ্ছাতে তাহা হয় নিয়ন্ত্রিত।
সহজ সময়ে কেহ মানে না দৈবেরে
বিপদে পড়িলে তবে দৈবে মনে পড়ে।
জগতের সব প্রাণী দৈব-ইচ্ছাধীন—
হেন কোন প্রাণী নাই সম্পূর্ণ স্বাধীন।
এই সত্য সাধারণে বুঝিতে না-পেরে
আপন ইচ্ছায় মেতে সব কাজ করে।
যে-বিরাট ইচ্ছা এই সৃষ্টির কারণ—
মানুষের ইচ্ছারে তা করে নিয়ন্ত্রণ।
এ সত্যের অনুভূতি যদি কারও হয়—
নিজ ইচ্ছা বলি তার
কিছু নাহি রয়।

খেলা

খেলা আর খেলা
সারাবেলা—
যেদিকে তাকাই
খেলা ছাড়া আর কিছু নাই।
এ বিশ্ব জুড়িয়া
সকলেই রহিয়াছে খেলায় মাতিয়া।
বিশ্বস্রষ্টা বিরাট শিশুর পানে
তাকাইয়া দেখি, হায়,
তিনিও আছেন মাতি আপনার
সৃষ্টির খেলায়!
রবি-শশী-তারকা খচিত
বিরাট ব্রহ্মাণ্ড তারই লীলায় রচিত।
অন্তহীন এ খেলা তাঁহার চিরদিন ধরে
বহিয়া চলেছে যুগ হতে যুগান্তরে।
প্রাণীজগতের মাঝে যেদিকে তাকাই—
বিভিন্ন রূপের খেলা দেখিবারে পাই।
পাখি আর কীট-পতঙ্গেরা সারাদিন ধরে—
খাদ্য-অন্বেষণ খেলা করে ঘুরে ঘুরে।
অরণ্যের হিংস্র পশু যত
জুড়িয়াছে শিকারের খেলা
নিরীহ পশুরে মারি মিটাইছে ক্ষুধা সারাবেলা।
তুষার-আবৃত শৃঙ্গ মহাগিরি সব
মৌনের খেলায় মাতি রয়েছে নীরব।
নদ নদী স্রোতস্বিনী মাতিয়াছে চলার খেলায়—
পর্বতের কোল ছাড়ি চলিয়াছে সাগর বেলায়।
সাগর তাহার তরঙ্গের বাহু প্রসারিয়া
সুগম্ভীর গর্জন-খেলায় রয়েছে মাতিয়া।
আকাশের খেলা চলে দিনে আর রাতে
মেঘ আর গ্রহতারা সকলের সাথে।
মানুষেরা ধরায় জন্মিয়া
সহস্র বিচিত্র খেলা করে মন দিয়া।
বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের স্রষ্টা যে বিরাট শিশু
রয়েছেন সারা বিশ্বজুড়ে—
তাঁর খেলা উপমারহিত এ বিশ্বের অন্তরে-বাহিরে।

স্রষ্টা হয়ে খেলিছেন জীব-সৃষ্টি খেলা,
জীবরূপ ধরি পুনঃ খেলিছেন নিজে জীবলীলা!
বিস্ময়ের উপরে বিস্ময়—
তাঁর খেলা বুঝে যারা
স্তব্ধ হয়ে রয়।

হাসি

মায়ের হাসি লুকিয়ে আছে
চাঁদের হাসির মাঝে—
মাকে মনে পড়ছে আমার
পূর্ণিমার এই সাঁঝে।
মাকে যখন পড়ে মনে
পুলক জাগে প্রাণে-মনে
আনন্দেতে ভাসি।
চাঁদের হাসির সাথে
আমার মা রয়েছে মিশি।
কত হাসি কত জনে
হাসছে দেখি সারাক্ষণে,
কিন্তু আমার মনকে টানে
কেবল মায়ের হাসি।
চাঁদের জ্যোৎস্না হয়ে
যায় মা আমায় ছুঁয়ে—
মায়ের মধুর কোমল পরশ
মনে জাগায় খুশি।
চাঁদের আলোর সাথে যে মা
মিশিয়েছে মা'র হাসি।

ঢক্কারাম

ছোট্ট খোকা এক—
আমার পাড়ায় থাকে,
সবাই তাকে 'ঢক্কা' বলে ডাকে।
শিক্ষকেরা ঠাট্টা করে
রেখেছে তার নাম—
শ্রীমান ঢক্কারাম।

আগ্রহেতে তার
নিতে হল
ছড়া লেখার ভার।
আসল নাম ধরে
ডাকে না কেউ তারে।
নাম যে তার তলিয়ে গেছে
ঢক্কা নামের ভারে।
ভালবাসে সবাই তারে—
তাই তো এত ঠাট্টা করে,
চটে না সে কারও 'পরে,
যতই হাস তায়—
আপন মনে ঢক্কা
চলে যায়।

নেশা

লেখার নেশায় মেতেছে প্রাণ—
লেখনীর আর নেই যে বিরাম,
পদ্য লিখে রাত কাটালাম—
ভোরের তারা হাসে,
পশ্চিম আকাশে!
লিখে লিখে কী যে পেলাম,
কোন আনন্দে হারিয়ে গেলাম—
নিজের মাঝে নিজে,
পেলাম আমি কী যে?
এ আনন্দের নেই তুলনা—
যার হয় না সে বোঝে না,
বুঝেছি শুধু নিজে—
কী পেয়েছি খুঁজে।

আশা

কোন আশা না-করে ভাই
আপন মনে পদ্য লিখে যাই—
আপন সুখে আপনি মেতে
আনন্দেতে হারিয়ে যেতে চাই।
আশা যদি থাকত মনে
ছড়া লিখে এতদিনে
দিতাম ভরে খাতাখানি তায়—
নেই যে আশা মনের কোণে, ভাই
আশা-ভরে লেখে যারা
আনন্দ যে পায় না তারা—
যে-আনন্দে ডুবে যেতে
আমিই শুধু চাই—
তাই তো মনে আশার যে
ঠাঁই নাই।

পেশা

পদ্য লেখা নয় তো আমার পেশা—
হঠাৎ কী খেয়ালের বশে
লেখনী ধরেছি এসে,
আজকে সাঁঝের বেলা—
এ যেন এক খেলা।
নেশার ঘোরে খেলতে থাকি—
হিজিবিজি কী যে লিখি
নিজেই বুঝি না তা,
কী যে আমার আশা।
এই নেশাতে মেতে শেষে—
যাব আমি কোথায় ভেসে,
বুঝি না কেন তা?
ভাবনা আসে বৃথা।
'পেশা' বলেই যদি মানি—
এই নেশাতে তবে আমি
তলিয়ে যেতে পারি।
ভাবনা রেখে মনের সুখে
কলম যে তাই ধরি।

ছড়া

ছোট শিশুদের তরে
ছড়া লিখি প্রাণ ভরে
মনের মুকুরে যত
ছবি খুঁজে পাই—
আনন্দেতে ছড়া লিখে যাই।
নতুন নতুন কত
লিখি ছড়া অবিরত—
মনের খেয়ালে।
আঁখির সমুখে দোলে
হাসিভরা শিশুদের মুখ
ছড়া লিখে তাই পাই সুখ।
লিখি ছড়া রাতে দিনে—
পুলকেতে অকারণে
নেচে ওঠে প্রাণ।
শিশুর সরল হাসি
কেন এত ভালবাসি,
লিখিতে লিখিতে আজ
তাই বুঝিলাম—
শিশুর হৃদয় মাঝে
আছে ভগবান।

খুশি

বেজায় হয়ে খুশি
ভাবছে বসে পুষি,
আসবে যবে নিশি
খাবো আমি বসি—
হোথায় মাচার 'পরে
আছে দুধের সর।
ঘুম নেই তার চোখে
অধীর আগ্রহে—
জেগে বসে থাকে
এদিক সেদিক দেখে।

এল যবে নিশি
অন্ধকারে মিশি
চলল কালো পুষি
আশায় হয়ে খুশি।
লাফিয়ে মাচায় উঠি
ধরল সরের বাটি,
বাটি ঢাকা ধাক্কা লেগে
পড়ল নিচে আসি।
'ঝনাং' শব্দে উঠে
গিন্নি এলেন ছুটে—
শক্ত লাঠির মস্ত ঘা এক
পড়ল পুষির পিঠে।
পুষির প্রাণের খুশি
ধুলায় গেল মিশি।

নিশি

ঘন ঘোর নিশি নিশ্চুপ দিশি—
আঁধারেতে চারিধার
হয়ে গেছে একাকার।
দূরের আকাশে তারা সব হাসে—
জোনাকির বাতি
জ্বলে সারা রাতি।
রাত্রির পাখি উড়ে থাকি থাকি—
আহারের তরে
দূর হতে দূরে।
নিশাচর প্রাণী করে হানাহানি—
জঙ্গলে ঘোরে
শিকারের তরে।
হরিণেরা জল খায় নদনদী কিনারায়—
বাঘেরা আসি
দেয় প্রাণ নাশি।

গান

মানুষের গানে অজানার পানে
মন ছুটে চলে দেহখানা ফেলে।
অসীমের পরশে অজানা হরষে
চারিধার মধুময় হয়ে আছে মনে হয়।
পাখিরা গান গায় শুনে সেই কলতান
মন করে আনচান ভরে ওঠে প্রাণখান।
তটিনীর কলতানে আনন্দ জাগে প্রাণে
মন চলে ছুটে অজানার তটে।
সাগর শোনায় গান গর্জনে সুমহান
ভীতি জাগে প্রাণে সে ভীষণ গানে।

মান

যার মনে নেই মান
তার নেই কোন দাম।
শ্রীরাধার মানে
কানু ভাল জানে—
ভাঙ্গাল সেই মান
ধরিয়া চরণখান।
অতি মানী যারা
ভোগ করে তারা।
মান আনে ভ্রান্তি
বাড়ায় অশান্তি।
যদি চাও শান্তি—
মানে দাও ক্ষান্তি।

অদৃশ্য কবি

হে অদৃশ্য কবি, আমার মাঝারে বসি
নিত্য নব কবিতার হার
গাঁথিয়া চলেছ তুমি—
নাহি বুঝি উদ্দেশ্য তোমার।

কেন বা আমারে লয়ে খেলিতেছ তুমি
এ নতুন খেলা—
মোর জীবনের এই
সর্বশেষ বেলা।

বুঝিতে অক্ষম আমি
তোমার এ অভিনব লীলা।
তবু জানি, তুমি মোর জীবন ভরিয়া
দানিতেছ সফলতা করুণা করিয়া।
জন্ম-জন্মান্তর ধরি
রহিয়াছ তুমি মোর অন্তর-প্রহরী।

তোমার স্মরণে
অনাবিল শান্তিস্রোত
বহে মোর প্রাণে।

হে মহান্ কবি,
অন্তর উজার করি আজি
মোর হৃদয়ের কৃতজ্ঞতারাজি
নিবেদিনু নয়নের জলে—
তোমার চরণতলে।

চিরসুন্দর

হে চিরসুন্দর,
আমার অন্তর ভরি দাও পবিত্রতা,
তোমার পরশ দানে।
সর্ব আবিলতা দূর করি
লহ তুলি তোমার চরণে।
হৃদয়ের মাঝারে সতত যেন লভি—
তোমার সুন্দর ছবি।
সুন্দরের স্পর্শদানে
সুন্দর করিয়া তোল আমার জীবনে।
সংসারের সুখভোগ তরে
বাসনা হইতে মোরে
রাখ সদা দূরে।
পরশমণির পরশনে
সোনা করি তোল তুমি
মোর মনপ্রাণে।

তোমার স্মরণে অনুক্ষণ
প্রাণ মোর রাখ ভরি—
বিচ্ছেদ পাশরি।
অশান্ত চঞ্চল মোর মনে
স্থির লক্ষ্যে রাখ সদা
তোমার চরণে।
জন্ম-জন্মান্তরে
ভুলিতে দিও না
কখনও তোমারে।
হে চিরসুন্দর,
অন্তরের আকুল প্রার্থনা—
পূর্ণ কর মোর।

হে অনুরাগী

ওগো মোর অন্তরের প্রভু,
কর মোরে চির-অনুরাগী
তোমার চরণে—
কৃপাকণা দানে।
তব অনুরাগ-অঞ্জনে রঞ্জিত করি
মোর দু'নয়ন,
পারি যেন ভালবাসিবারে—
বিশ্বময় সকল জীবেরে।
সকলের মাঝে যেন হয় অহরহ
তোমার দর্শন—
পাশরি বিরহ।
হে মহান্ অনুরাগী,
অনুরাগ ভরে সৃজন করেছ তুমি
বিশ্বময় সকল প্রাণীরে।
তব অনুরাগকণা দানে—
আনিয়াছ অনুরাগ সমভাবে
সকলের প্রাণে।
ওগো চির-অনুরাগী,
অফুরান অনুরাগ ভরে
রচিয়াছ তুমি এ অপূর্ব
ধরণীরে।

যুগে-যুগান্তরে
বহিয়া চলেছে তব অনুরাগধারা—
শ্রাবণের ধারাসম
সকলের তরে।
হে অনুপম,
লহ তুলি মোরে অনুরাগ ভরে
তোমার চরণে—
অন্তিম লগনে।

মামা

ওরে মোর মামা,
তোর গায়ে নেই জামা?
তোর রাগটা একটু কমা,
করতে শেখ ক্ষমা।
রাগী বলে তোকে
সবাই যখন ডাকে—
দিদার মনের মাঝে
কষ্ট লাগে কী যে?
দিদা যে তোর তরে
বসে একলা ঘরে
দুঃখেতে যায় মরে—
ভাবিসনা কেন রে?
তোর রাগের জ্বালা
করছে ঝালাপালা
বাড়ির সব লোকে—
শুনছে পাড়ার লোকে।
তাই তো বলি তোরে
তোরই ভালর তরে—
কমিয়ে রাগের চোট
ভদ্র হয়ে ওঠ।

মাসী

আমার বড় মাসী
তার যে বেঝায় কাশি—
ভুগছে দিবানিশি
জেগে থাকে বসি।

যখন চায় শুতে
ভীষণ কাশিতে—
লাফিয়ে ওঠে বসি
কেবল চলে কাশি।

ঔষধে ডাক্তারে
চেষ্টা করে করে
হার মেনে শেষটায়—
চলে গেছে ফিরে।

বর্ষাতে আর শীতে
বেজায় কাশিতে—
কষ্টের আর শেষ থাকে না
সারা দিনে রাতে।

কষ্ট দেখে মাসীর
প্রাণ থাকে না স্থির—
সদাই কাতর প্রাণে
ডাকি ভগবানে,
"মাসীর কষ্ট দাও না করি দূর,
হে দয়াল ঠাকুর!"

মেনকা সুন্দরী

দশ বছরের ছোট্ট খুকী
মেনকা সুন্দরী,
এসেছিল মোদের ঘরে
কাজের তরে—
নিজের বাড়ি ছাড়ি।
লেখাপড়া জানত না সে কিছু
থাকত কেবল কাজের পিছুপিছু।

দাদু তারে ধীরে ধীরে
হাতে ধরি ধরি—
অ-আ, ক-খ হতে শুরু করি
শিখাল যে কত
নেইকো হিসাব তত।
ক্রমে ক্রমে শেষে—
আরও বছর বারো
কেটে গেল তার
মোদের ঘরে বসে।
অবাক চোখে দেখলো সবাই, একি—
ছোট্ট সেই খুকী,
মেনকা সুন্দরী—
পরছে এখন শাড়ী
ছোট্ট জামা ছাড়ি।
নিজের জমা টাকা
ব্যাঙ্কে রাখে একা—
ইংরাজীতে পাকা
নিজের নামটি লেখা!
চৈত্র মাসের শেষে—
হঠাৎ বাবা এসে
নিয়ে গেল দেশে।
যেতে হবে তারে
এবার শ্বশুর ঘরে।
চোখের জলে বিদায় নিয়ে শেষে—
মেনকা সুন্দরী
চলে গেল দেশে!
বাড়ির লোকের চোখে
নেমে এলো অশ্রুর ঢল,
সেই দিনটি থেকে!

সত্যদ্রষ্টা (শ্রীতারাচরণ)

সত্যেরেই ধর্ম বলি প্রচারিলে—
সত্যদ্রষ্টা, হে গৃহী-সন্ন্যাসী।
নিত্যসত্যে করিলে দর্শন—
বিগ্রহ মাঝারে,
মন্দিরেতে বসি।

জননী বলিয়া সত্যে করিয়া গ্রহণ
ঘোষিলে জগতে—
'সত্য' হল সৃষ্টির কারণ।
বিশ্বস্রষ্টা নিত্যসত্য
রয়েছেন সব জীবের অন্তরে—
সত্য বিনা 'নিত্য' কিছু নাই
এই ব্রহ্মাণ্ড ভিতরে।
শিখাইলে জগৎবাসীরে—
স্রষ্টার মায়াতে
এই সত্য বিস্মৃত হইয়া
দুঃখকষ্ট করিতেছে ভোগ তারা
জীবন ভরিয়া।
চিরশান্তি লভিবার একমাত্র পথ—
সত্যে অনুরাগী হয়ে
চলিতে হইবে
ধরি সত্যপথ!
একনিষ্ঠ হয়ে সত্যে অনুরাগী হলে—
সত্যের স্বরূপ অনুভূত হবে
তার কালে!
আহ্বান করিলে জনগণে—
সত্যেরে করিতে ধ্রুবতারা
জনমে-মরণে।
বিশ্বজনে নিত্যসত্য পথ প্রদর্শিয়া
চলি গেলে এ নশ্বর
জগৎ ত্যজিয়া—
নিত্যসত্য ধামে!

তুষারলিঙ্গ অমরনাথ

অমরনাথের অমর কাহিনী শুনিয়া—
দর্শন তরে প্রাণের মাঝারে
আকুলতা উঠে জাগিয়া।
তুষারলিঙ্গ দর্শন করি
ফিরিল যাহারা স্মৃতিভারে ভরি—
অতি দুর্গম কঠিন পথের
সংবাদ তারা আনিল।

শ্রবণে পশিল বার্তা যখন
প্রাণেতে হইল ভীতি জাগরণ
মনের বাসনা মনেতে
গোপন রহিল।
বৎসর ঘুরি আবার আসিল—
নূতন যাত্রী অনেক জুটিল
যাত্রার তরে নব আয়োজন চলিল।
দুরুদুরু বুকে চলিলাম সুখে
মহাদেবে স্মরি ভাবের পুলকে—
ভয়ভীতি সব মিলাইয়া গেল চকিতে।
প্রতি শ্রাবণের শুভ পূর্ণিমা তিথিতে—
অমরনাথের পূজারী চলেন পূজিতে।
ছড়িদার যিনি সঙ্গে চলেন
মুসলিম তিনি জাতিতে।
পূজিতে চরণ অমরনাথের
বাধা নাহি তাহে জাতি-ধর্মের
মুসলিম আর খৃষ্টান-আদি সকলের।
সুদীর্ঘ তিন দিবস-রজনী ধরিয়া
ক্লান্ত চরণে উঠিয়া নামিয়া চলিয়া—
দুর্গম গিরি আরোহণ শেষ হইল।
যাত্রীরা আসি অমর গঙ্গা তীরে
গুহাতলে থামিল।
তুষারমৌলী গিরিগুহা মাঝে
নীলাভ-শুভ্র লিঙ্গ বিরাজে—
লিঙ্গে ঘিরিয়া অনুপম জ্যোতি ঝলিছে।
নীলকণ্ঠের নীলাভ দ্যুতিতে
বিস্ময় মানি হেরিনু চকিতে—
ধ্যান-নিমগন ধূর্জটি যেন
তৃতীয় নয়ন মেলিছে।
প্রশস্ত সেই গুহা-মন্দির মাঝেতে
অপরূপ দুই শ্বেত পারাবত
উড়িয়া আসিল চকিতে।
নীরব সে গুহা মুখরিত হল
ভক্তের জয়ধ্বনিতে।

জয় জয় জয় দেব আদিদেব,
হেন দর্শন পুণ্য বিভব—
দান করি মোর জীবন ধন্য করিলে।
হৃদয়-গভীরে বুঝিলাম আমি—
পলকে ঘুচালে মোহরাশি, স্বামি,
সার্থক করি জনম
হেথায় আনিলে।

বদ্রীনারায়ণ

ভ্রমণ-নেশায় মাতিয়া চলেছি অজানা
হিমগিরি-বন ভেদিয়া—
যাত্রীদলের সঙ্গ লভিয়া
যথায় বদ্রীনারায়ণ,
লভিলাম তাঁর দরশন।
শিলামন্দিরে কৃষ্ণ শিলায়
সুগঠিত সেই নারায়ণ—
মন্দিরতলে হইয়া আসীন
দানিছেন কৃপা সারা নিশিদিন,
ভক্তজনের হৃদয়-বাসনা পুরাতে—
তাপিত হৃদয় জুড়াতে।
দর্শনে দেহ হল পবিত্র
দিব্য-বিভব হল অনুভূত—
হৃদয় মাঝারে অনুপম জ্যোতি
ঝলকি উঠিল চকিতে।
অভাবিত এই দেবদর্শন লভিতে।
পুলকিত প্রাণ কৃতজ্ঞতায় পুরিল—
আসিয়া ভ্রমণে দেবদর্শন
কীরূপে আমার ঘটিল?
ভগবৎ-কৃপা লভিয়াছি আমি—
বুঝিলাম এক ঝলকে।
সার্থক হল ভ্রমণ আমার
অনুভব করি তাহা বার বার—
কাচ কুড়াইতে কাঞ্চন লাভ
হইল আমার পলকে।

কেদারনাথ

ভারতের বুকে হিমগিরি হিমালয়—
বহু তীর্থের জননী-স্বরূপ
ছিল তার পরিচয়।
যাহা সে আজিও বয়।
জ্যোতির্লিঙ্গ কেদারতীর্থ—
হিমালয় বুকে অতি পবিত্র
শরণ লভিয়া পরিতৃপ্ত
শৈব ভক্ত যত।
দুর্গম গিরি বাহি পদব্রজে—
ক্লান্ত চরণ যবে স্থিতি খোঁজে
পলকে মিলিল শিলামন্দির মাঝে—
দর্শন লভি অনুপম ওই
জোতির্লিঙ্গরাজে।
দেহ-মন ভাবে হল পরিপুর
হৃদয় ভরিল আবেশে মধুর—
দেব আদিদেব মহেশের পদতলে
মাগিনু শরণ বিগলিত আঁখিজলে।
অন্তরতলে হেরিলাম তাঁর জ্যোতি—
দিব্যবিভায় ভরিয়া রহিল স্মৃতি।
বুঝিলাম মনে কৃপাকণা দানে
ধন্য করিল জীবন মোর—
মৌলীভূষণ কৃপাময় শংকর।

যশোদাদুলাল

যশোদাদুলাল হয়ে আসিলে ধরায়—
বাল্যলীলা দর্শাইয়া
মুগ্ধ করি রাখিলে মাতায়।
বিগলিত বাৎসল্যের প্রতিমূর্তি
যশোমতী মাতা—
তব মায়া-আবরণে
তোমার স্বরূপ না-বুঝিয়া

রহিলেন হয়ে বিমোহিতা।
বারে বারে বিনাশিলে বহুরূপী কংস-অনুচরে—
স্বচক্ষে দেখিয়া মাতা
পারিল না তাহা বুঝিবারে।
মৃত্তিকা-ভক্ষণ-ছলে মুখ মাঝে
বিশ্বরূপ দেখালে মাতায়—
তব স্নেহে আত্মহারা মাতা
দেখিয়াও বুঝিল না তায়।
কালীয়দহেতে নামি
মল্লযুদ্ধে বিনাশিলে
কালীয় নাগেরে।
দুঃসাহসী সেই লীলা
দেখাইলে মাতাপিতা
আর যত গোকুলবাসীরে।
শৈশব-লীলার অবসানে
স্নেহময়ী যশোদারে
ভাসাইয়া অশ্রুর সাগরে—
ত্যজি গেলে মথুরাপুরীতে
আপনার কর্তব্য সাধিতে—
মল্লযুদ্ধে কংসেরে বধিতে।

লিঙ্গরাজ সোমনাথ

আরব-সাগর উপকূলে
সুপবিত্র মন্দিরের তলে—
লিঙ্গরাজ সোমনাথ
বিরাজিত আছেন সেথায়—
নিজ মহিমায়।
সুপ্রাচীন পবিত্র এ লিঙ্গ মহেশ্বর
সয়েছেন বৎসর বৎসর
যবনের লুন্ঠন ও অত্যাচার—
বহু বহু বার।
আশৈশব শুনিয়া এ কথা
জাগিয়াছে মোর মনে
দর্শনের তরে ব্যাকুলতা।

অবশেষে এক শুভদিনে
আনন্দ-পুরিত মনে —
বহু আকাঙ্ক্ষিত যোগীশ্বর মহেশ্বর
মন্দিরের সম্মুখেতে
পারিনু আসিতে।
স্নান করি আরব সাগরে
শুদ্ধ দেহে পবিত্র অন্তরে—
প্রবেশিয়া ভক্তিভরে আনত নয়নে
প্রণাম জানাই দেব শংকর চরণে।
ভাবাবেগে দেহমনে জাগে শিহরণ
মৌনী মহেশের পদতলে
আপনারে করিনু অর্পণ।
শিলাময় লিঙ্গমূর্তি দেব আদিদেব—
আপনার প্রভায় উজলি
রয়েছেন ধ্যানমগ্ন
আপনারে ভুলি।
একান্ত অন্তরে
প্রার্থনা জানাই তাঁরে—
দীননাথ হে প্রভু শংকর,
কৃপাকণা দান করি
ধন্য কর এ জীবন মোর।

দ্বারকানাথ

দ্বারকার অধিপতি তুমি নারায়ণ—
মাগিনু শরণ নতশিরে তোমার চরণে
কৃপাকণা দানে কৃতার্থ করহ তুমি
দাসের জীবনে।
অপরূপ তোমার মহিমা,
না-হয় বর্ণনা—
স্মরণে হৃদয়-মনে পবিত্রতা দানি
স্থান দাও তব শ্রীচরণে,
হে হৃদয়-স্বামি।

কৃপা করি আসিলে ধরায়—
উদ্ধারিলে নিজ মহিমায়
তব অনুরাগী যত জগৎবাসীরে
বিনাশিয়া দুষ্কৃতকারীরে
বারে বারে।
যুগে যুগে অত্যাচারী অসুরেরে
করিতে নিধন তব আগমন—
রাখিতে জীবন যারা মাগিছে শরণ
আকুল পরাণে
তোমার চরণে!
হে মোর হৃদয়-অধিপতি,
জানাই মিনতি—
মোর অন্তর-নিবাসী যত অসুরে বিনাশি
করহ উদ্ধার মোরে—
লহ তুলি তব শ্রীচরণে
অনুরাগ ভরে চিরদিন তরে।

আলোছায়া

আলো আর ছায়া—
বিশ্ব-চরাচর জুড়ি
এক অপরূপ মায়া।
যেদিকে ফিরাই আঁখি
সর্বত্রই ইহাদের দেখি—
যেন কায়া আর ছায়া।
আলোরে প্রকাশে ছায়া
বাড়াইয়া উজ্জ্বলতা,
ছায়ারে গভীর করি তোলে
আলোর তীব্রতা।
বিচিত্র এ লীলা
চ ছলিতেছে সারা বেলা—
জগৎ জুড়িয়া এক
অন্তহীন খেলা।

ছায়ারে দানিয়া আলিঙ্গন—
হরে আলো তার মন।
আলোরে বাঁধিয়া বাহুপাশে—
ছায়া মৃদু হাসে।
আলোছায়া দুই জন—
যেন ভাই আর বোন,
একেরে ছাড়িয়া অন্যে
থাকে না কখন।
অনাদি সৃষ্টির শুরু হতে—
আলোছায়া আছে
সাথে সাথে।
বাঁধা রবে তারা এ বন্ধনে—
জীবনে-মরণে।

আঁখি

বিধাতার শ্রেষ্ঠ দান
মানুষের আঁখি—
যাহার মাঝারে নিত্য
তাঁহারেই দেখি!
হৃদয়ের ছায়া পড়ে
আঁখির মাঝারে—
ভাল-মন্দ দেখা যায়
আঁখির ভিতরে।
চিন্তাশীল মনে আর
চঞ্চল মনেতে—
প্রভেদ রয়েছে দুই
আঁখির কোণেতে।
আঁখিতে লুকায়ে থাকে
মনের বেদনা।
আনন্দের অনুভূতি
তা-ও যায় চেনা।
ক্রোধ আর অভিমান—
তারাও আঁখিতে বর্তমান।
মনের মুকুর এই আঁখি—

সুখ-দুঃখ আনন্দ-বিষাদ
আঁখিতেই দেখি।
ধন্য বিধাতার এই দান—
এ জগতে কিছু নেই
আঁখির সমান।

বুড়ি

শীতের দুপুরে বসি একা ঘরে
পুরাতন ছেঁড়া শাড়ী জুড়ি—
সেলাই করিছে বুড়ি,
শীতের সম্বল তার
একমাত্র কাঁথা।
জানে বুড়ি ভালো করি
সেই সার কথা—
বর্ষার সম্বল তার
ছেঁড়া এক ছাতা,
আর শীত নিবারণে
এই কাঁথা।
এদের দু'জনে—
বুড়ি তার বন্ধু বলি জানে।
ঝুরঝুরে খড়ো ঘরে
একা বুড়ি বাস করে।
ঠুকঠুক লাঠি ভর করি
ধীরে ধীরে হাঁটে বুড়ি—
ভিক্ষার সন্ধানে
একবাড়ি হতে অন্যবাড়ি।
বুড়ির দুঃখের সীমা নাই
ভাবে বুড়ি তাই—
বেঁচে থাকা এক মহাপাপ
পেতে হয় শুধু মনস্তাপ।
তার চেয়ে মরণ সুখের—
দিন গোণে বুড়ি মরণের।

প্রকাশ

এই বিশ্বচরাচর অন্তর বাহির,
অণু-পরমাণু আর
চিদাকাশ-ভূতাকাশ,
দৃশ্য ও অদৃশ্য সবই—
তোমার প্রকাশ।
আপন লীলায় আছ আপনি মাতিয়া—
প্রকাশিছ আপনারে
সর্বত্র ব্যাপিয়া।
তোমার মোহিনী মায়া দিয়া
রাখিয়াছ সর্ব জীবে
মোহিত করিয়া।
আপনার আনন্দে মাতিয়া—
প্রকাশিছ অপরূপ
এই বিশ্বরূপ।
অনন্ত ব্রহ্মাণ্ড যাহা নিত্য-প্রকাশিত—
তোমারই অন্তর রূপ
তোমারই সৃজিত।
ইচ্ছাময় তুমি, আপন ইচ্ছায়
সৃজিছ নাশিছ বারবার—
অসীম ব্রহ্মাণ্ড
কভু হতেছে প্রকাশ,
কভু অপ্রকাশ।
যুগ যুগ ধরি—
অন্তহীন এই লীলাখেলার মাঝারে
প্রকাশিছ আপনারে
স্বরূপ আবরি।
মায়ামুগ্ধ জীবরূপে প্রকাশিয়া আপনারে
সুকঠোর সাধনায় নিমগ্ন রহিয়া—
জানিতে চাহিছ আপন স্বরূপ,
জীবগণে চাহে যেইরূপ।
অন্তর মাঝারে নিত্য-সত্য তোমার প্রকাশ—
অনুভব করিবারে করিছ প্রয়াস।
তাহা লভি পুনরায় নিত্য-রূপে
মিশিতেছ আপন স্বরূপে।

হে মহান্ স্বপ্রকাশ,
শক্তি দাও মোরে—
নিজের মাঝারে
তোমার প্রকাশ হেরিবারে।

যুগধর্ম

এ জগতে লভিয়া জনম—
জানে না মানবগণ
কী মহান্ উদ্দেশ্য সাধিতে
সংসারেতে তার আগমন!
ঈশ্বরে জানিতে—
নরদেহ লাভ তার এই ধরণীতে।
এই মহাসত্য না-জানিয়া
দুঃখ-ক্লেশ ভোগ করে
জীবন ভরিয়া।
কিন্তু জ্ঞানী যারা চেষ্টা করে তারা
জীবনের উদ্দেশ্য জানিতে—
প্রাণপণ চেষ্টা করে
সে মহান্ উদ্দেশ্য লভিতে।
ত্রিবিধ উপায়ে—
জ্ঞান কর্ম আর ভক্তি পথে
সাধন করিতে হয়
ভগবানে অনুভবে পেতে।
এ তিনের মাঝে
ভক্তিপথ সহজ সাধন।
জ্ঞান-কর্ম দুই পথ
কঠিন ভীষণ।
সুকঠিন জ্ঞানপথে সফলতা লভি—
নির্বিকল্প সমাধিতে হয়ে সমাহিত
অখণ্ড সচ্চিদানন্দ হয় অনুভূত।
কর্মপথ নহে সাধ্য এ ঘোর কলিতে—
যাগযজ্ঞ দানধ্যান-আদি
কর্ম বেদ-মতে
কলি-জীব পারে না সাধিতে।

ভক্তিপথে সাধনায় ভাবসমাধিতে
হইয়া মগন—
আপন অভীষ্ট দেবে
হয় দরশন।
এ ঘোর কলিতে অন্নগত প্রাণ
দুর্বল মানব—
কর্ম আর জ্ঞানপথে চলা
তার হয় না সম্ভব।
এ যুগের "যুগধর্ম" ভক্তির সাধন—
ভক্তিতে মিলিবে বস্তু
করি আরাধন।
ভক্তির রজ্জুতে বাঁধা পরে ভগবান—
আর কোন পথ নাই
ভক্তির সমান।
হৃদয়ের অনুরাগে অভিষিক্ত
"রাগ-ভক্তি" ভরে—
যেই জন ভগবানে স্মরে,
প্রসন্ন অন্তরে ভগবান
কৃপা দানে তারে ধন্য করে।

সগুণ-নির্গুণ

জ্ঞানীর ঈশ্বর নিরাকার ও নির্গুণ—
ভক্তের ঈশ্বর তিনি সাকার সগুণ।
পূর্ণ জ্ঞানে নির্বিকল্প সমাধি লভিয়া
ব্রহ্মের স্বরূপে জ্ঞানী রহেন মিশিয়া।
একুশ দিনেতে তার দেহনাশ হয়—
দেহ থাকিবার প্রয়োজন নাহি রয়।
ব্রহ্মের স্বরূপ মুখে না-যায় বর্ণন
দেহ ও মনের নাশ হইবে তখন
লবণ সাগর মাঝে লবণ পুত্তলি
ডুব দিলে যেইরূপ যায় মিশি গলি।
অনুরাগী ভক্তের হৃদয়—
ভক্তি ও ভাবেতে সদা পূর্ণ হয়ে রয়।
ভাবে বিগলিত সেই হৃদয় মাঝারে—
বাঞ্ছিত অভীষ্ট রূপ সতত নেহারে।

সগুণ-সাকার রূপে ঈশ্বরে দেখিয়া
ভক্তের অন্তর রহে পুলকে পুরিয়া।
ভাবসমাধিতে ভক্ত রহে নিমগন—
সমাধি মাঝারে ইষ্টে হেরে অনুক্ষণ।
সংসারের ভক্তি-আরাধনা শেষ করি
ভক্তেরে লইয়া যান ইষ্টরূপী হরি—
নিত্যবৃন্দাবন—
যথা কৃষ্ণরাধা অনুক্ষণ,
উভয়ে আছেন নিত্যলীলায় মগন।
লীলা-শুক রূপে ভক্ত বিচিত্র সে লীলা
করেন দর্শন আজীবন!
ভক্তের ঈশ্বর আর জ্ঞানীর ঈশ্বরে—
প্রভেদ রহে না কিছু গুণে ও অন্তরে।
ইষ্টদর্শনের পরে—
একেতে লইয়া যান তিনি উভয়েরে!
ভিন্ন পথ ধরি চলিয়া দু'জনে—
মিলিত হইবে শেষে একের চরণে!
সগুণ-নির্গুণ সেই একেরই স্বরূপ—
বহুরূপে বিরাজেন
তিনি বিশ্বরূপ!

একা

বাসনার বশে এ জগতে মানুষেরা আসে—
ভিন্ন স্থানে ভিন্ন পরিবেশে।
নিজ নিজ কর্মফল ভোগ করিবারে—
স্বতন্ত্র সংস্কারে—
আসিয়া সংসারে মিলিত হয় তাহারা
আপন আপন পরিজন সনে—
ভিন্ন গোত্রে ভিন্ন নামে।
ধীরে ধীরে তারা পরিচিত হতে থাকে
অনাত্মীয় পরিজন আর বন্ধু সনে—
যাদের সহিত সৌহার্দ্য
গড়িয়া ওঠে ক্রমে!

পরিচয় পরিধি বাড়িয়া ক্রমে ক্রমে—
সকলেরে একান্ত আপন বলি জানে।
বিচ্ছেদ চাহে না কভু
তাহাদের সনে।
প্রকৃতির অলঙ্ঘ্য নিয়মে
বিচ্ছেদ আসিয়া যায় ক্রমে।
হৃদয়ের অতি কাছে যেইজন আছে—
অনিশ্চিত মরণ সহসা
তাহারেই গ্রাসে।
ভাবে না কখনও কেহ—
আসিয়াছি এ জগতে একা—
পুনরায় যেতে হবে একা
হবে না আবার কারও দেখা।
জন্ম আর মরণ মাঝারে
সামান্য ক'দিন শুধু থাকি
এক ঘরে।
তার আগে পরে কেহই জানে না
আর কারে।
আসা কিংবা যাওয়া এই দুই
হইবে একেলা—
মানুষের জীবনের বিচিত্র এ খেলা।
প্রকৃতির অমোঘ বিধানে—
জন্ম ও মরণ
নিঃসঙ্গ দু'জন।
জন্মিতে হইবে একা
একাই মরণ—
সঙ্গী রহিবে না কোন জন।

সাথী

শৈশবের প্রথম লগনে
জননীরে শিশু তার সাথী বলি জানে।
দিনে দিনে বয়স বাড়িতে
অন্য সব শিশুদের সাথে
রহে সে খেলায় মাতি—
তাহারাই হয় তার সাথী।

আরও বড় হলে পাঠশালে
পায় যেই সহপাঠীগণে—
তাহাদেরই আপনার সাথী বলি মানে।
অতি ধীরে ধীরে সাথীর বদল হয়
শিশুর অন্তরে।
ক্রমে বড় হয়ে সে বালক
বিদ্যালয়ে সহপাঠীদের
সাথী বলি করে অনুভব!
এইরূপে দেখা যায় ক্রমে—
বয়সের পরিণতি সনে
সাথীর বদল হয় মানব জীবনে।
যৌবনের উন্মেষের পরে
জীবনের সাথী লভিবারে—
প্রবল আগ্রহে যত্ন করে।
সংসার জীবনে প্রবেশিয়া—
আনন্দ-বেদনা, দুঃখ-সুখ,
শোক-তাপ নিয়ত সহিয়া—
জীবনসত্যের সাথে হয়ে পরিচিত
বুঝিবারে পারে, অবিচ্ছিন্ন সুখভোগ তরে
নহে মানবের জন্ম
এ ভবসংসারে!
আরও পরে ধীরে বার্ধক্য যখন আসে
মানব শরীরে—
বয়োবৃদ্ধ জনেরে তখন আপনার যোগ্য
সাথী বলি করে নির্বাচন।
নিজ জীবনের অভিজ্ঞতা
অবিচ্ছিন্ন শান্তিহীন বহুতর ব্যথা—
সখেদে বর্ণনা করি চাহে বুঝাবারে
ভারাক্রান্ত আপন অন্তর-ভার
লঘু করিবারে!
অবশেষে ক্রমে—
জীবনের শেষের বেলায়,
খুঁজি পায় শ্রেষ্ঠ সাথী তাঁরে—
রয়েছেন যিনি অন্তর্যামী-রূপে
তার আপন অন্তরে!
নিত্যসত্য সেই শ্রেষ্ঠ সাথীর চরণে

সঁপি দিয়া আপনারে
জীবনেরে ধন্য বলি মানে।
চিরশান্তি নেমে আসে প্রাণে।

শৈশব স্মৃতি

আমার শৈশব স্মৃতি মনে জাগে আজ
বারে বারে—
বার্ধক্যের এই শেষের প্রহরে,
জাগাইয়া প্রাণে মধুময় গীতি।
কর্ণফুলী নদী তীরে সবুজ মাঠের ধারে
আম-জাম-কাঁঠালের বাগানেতে ঘিরি—
ছিল আমাদের শৈশবের বাড়ি।
সে বাড়ির ধারে—
টলটল জল-ভরা সুন্দর পুকুর—
রুই আর কাতল মৃগেল
সেথায় করিতে খেলা সমস্ত দুপুর।
আমরাও ভাইবোনে মিলি করিতাম খেলা
সারা বেলা "সুধা কুটীর"-এর ধারে—
মাঠের মাঝারে।
ওই নামে ছিল পরিচিত আমাদের
শৈশবের বাড়ি যাহা আসিয়াছি ছাড়ি—
পুরাতন অতি—
আজ তাহা শুধুমাত্র স্মৃতি।
নদীতে যখন আসিত জোয়ার—
সীমানা ছাড়িয়া কূল ছাপাইয়া
ফুলিয়া উঠিত জল বিপুল বিস্তার—
ডুবিয়া সবুজ মাঠ হয়ে যেত
নদীর আকার।
আমরা সকল ভাইবোন
মহানন্দে মাতিয়া তখন—
মাঠে নামি জোয়ারের জলে
খেলিতাম জলখেলা
মহাকোলাহলে।

কামরাঙা-পেয়ারা-ফলসা গাছে
দাদা-দিদি সব উঠিয়াছে—
আমাদের টানি উঠাইয়া
চালাইত গাছে-ওঠা-ওঠা খেলা।
ঘনঘোর বর্ষণের দিনে মাঠে ও বাগানে—
শ্রাবণের ধারায় ভিজিয়া স্নান করিতাম
মিলি সব ভাইবোনে।
আনন্দিত প্রাণে।
সুকঠোর মায়ের শাসনে
সহ্য করিতাম মোরা
অকাতর প্রাণে।
প্রবল প্রহারে অশ্রুধারা রোধিতাম
ডুবি সেই আনন্দের বানে।
শৈশবের স্মৃতি-ভরা সেই সব দিনে—
পড়ে আজ মনে
পারি না রোধিতে অশ্রুবারি
আনন্দ-বেদনা ভরা সেইদিনে স্মরি।
মানুষের জীবনের মহাসত্য
এই পালা-বদলের পালা—
শৈশব-যৌবন আর বার্ধক্য দানিয়া
নিয়তির খেলা!
ছায়াছবি সম এই মানব জীবন—
ভাবিয়া বিস্ময় জাগে
বিধাতার এই বিচিত্র সৃজন!

ভিখারি

ভিক্ষা মাগি ফিরে যারা দ্বারে দ্বারে ঘুরি
তাহারা ভিখারি!
এ জগত ভরি—
সর্বত্রই তাহাদের হেরি।
কোথায় ভিখারি নাই
বুঝিতে না পারি

অন্নের ভিখারি যারা
খাদ্যবস্তু মাগে—
ঘুমের ভিখারি যারা
তারা রাত জাগে।
সুখের ভিখারি যারা
সুখ খুঁজি ফিরে—
অর্থের ভিখারি যুঝে
সঞ্চয়ের তরে।
যার যাহা অভিলাষ অন্তর মাঝারে
সেই বস্তু লভিবারে
সদা চেষ্টা করে।
ঈশ্বরে মাগিয়া যারা ফিরে
জগৎ ভিতরে—
তাহারা ঈশ্বরপ্রেমী
মানব মাঝারে।
ভগবৎ কৃপা লাগি কাতর যে-জন—
কৃপার ভিখারি তারে
জানিবে তখন।
মানুষের প্রেমের ভিখারি
নিজে নারায়ণ—
ভিখারিগণের মাঝে
শ্রেষ্ঠ তিনি হন।

আলো

জন্মের প্রথমে যে-আলোতে মেলিয়া নয়ন
চিনিলাম স্নেহময়ী জননীরে
ভাই ভগ্নী আর স্নেহের পিতারে—
সে আলোতে স্নাত দু'নয়নে
চিনিলাম শৈশবের যত সাথী
আর কৈশোরের সব মোর সহপাঠীগণে।
যৌবনের উন্মেষের পরে সে আলোক ধারে
চিনিতে পারিনু আপনার
জীবনসাথীরে।

সংসারে প্রবেশ লাভ পরে সে আলোক
চিনাইল মোরে—
স্নেহের পুত্তলি-সম মোর প্রিয়তম
পুত্র-কন্যাগণে।
সে আলোক-স্নানে চিনিলাম সংসার জীবনে—
পরম সুহৃদ মোর যত বন্ধুগণে
আর আত্মীয়-স্বজনে!
জীবনসন্ধ্যায়—
নয়নের আলো যবে নির্বাপিত প্রায়,
চকিতে হেরিনু মোর হৃদয়-আকাশ
উদ্ভাসিয়া জ্যোতির্ময় রূপের প্রকাশ।
হেরিনু তখন মোর জীবনদেবতা
আমারই প্রতীক্ষারত রয়েছেন সেথা!
পরিপূর্ণ প্রাণে শরণ মাগিনু শ্রীচরণে—
তাঁর চির-জ্যোতির মাঝারে
ডুবাইয়া রাখিতে আমারে
চিরদিন তরে!

কথামৃতকার শ্রীমহেন্দ্রনাথ

হে মহেন্দ্রনাথ, লহ মোর প্রণিপাত—
চরণে তোমার
অন্তরের কৃতজ্ঞতা
জানাই আমার!
যে-অমৃতকথা সঞ্চিত করিয়া
রাখি গেলে বিশ্বজন তরে
অনুরাগ ভরে—
সে সৃষ্টির তরে রাখিলাম
মোর সশ্রদ্ধ প্রণাম।
তোমার সঞ্চিত সেই সুধার সাগরে
হয়ে নিমজ্জিত যেন পারি থাকিবারে—
এ জীবন ভরে।
দেবমানবেরে দর্শন-স্পর্শন করিবার
শুভযোগ ঘটেছিল
জীবনে তোমার!

সে পরশমণির স্পর্শনে
হয়ে গেলে সোনা তুমি
দেহে আর মনে।
বিলাইলে সেই স্বর্ণকণা রাশি রাশি—
ধন্য হোল এ জগৎবাসী।
গুরুরূপী শ্রীরামকৃষ্ণের
শুভ ইচ্ছা সফল করিতে—
জন্ম লভেছিলে তুমি এই ধরণীতে।
যন্ত্র করি তোমারে তাঁহার
অর্পিলেন তোমার উপরে
জগৎ-জনের কল্যাণের ভার।
নিজ কার্য করি সমাপন দেবতা যখন
ত্যজিলেন এই মর্ত্যভূমি—
তাঁর ধ্যানে নিমজ্জিত
হয়ে গেলে তুমি।
তাঁর ইচ্ছাক্রমে রচনা করিলে তুমি—
পঞ্চ খণ্ডে সমাপিত "কথামৃত" রূপ
অমৃতের খনি।
দৈবকর্ম সমাধান করি—
মায়াময় জগৎ-সংসার পরিহরি
গেলে চলি দিব্যধামে
মিলিবারে শ্রীগুরু চরণে।

শ্রীরামচন্দ্র

জয় জয় রামচন্দ্র, দূর্বাদলশ্যাম,
তোমারে প্রণাম।
জন্মেছিলে ত্রেতাযুগে সরযূর তীরে-
অযোধ্যা নগরে।
অসুরে বিনাশ করি ধর্মরাজ্য
প্রতিষ্ঠার তরে—
এসেছিলে ধরণীতে মানব আকারে।
অযোধ্যার অপুত্রক মহারাজ
দশরথ-ঘরে, অন্ধমুনি বরে,

জনম লভিয়াছিলে তুমি নারায়ণ
এক অংশে চারি অংশ
করিয়া ধারণ।
জনকতনয়া সীতারূপী দেবী শ্রীলক্ষ্মীরে—
বিবাহ করিলে তুমি
ভঙ্গ করি হরধনুকেরে।
পরশুরামের দর্প করিলে চূর্ণন—
দর্পহারী পতিতপাবন।
পিতৃসত্য করিতে পালন
চলি গেলে ত্যজি সিংহাসন—
সতী সীতাদেবী-সহ চতুর্দশ বৎসরের তরে,
যক্ষ-রক্ষ অধ্যুষিত
অরণ্য ভিতরে।
রক্ষপতি রাবণের মায়ার ছলনে—
স্বর্ণমৃগরূপী মারীচেরে
বধিলে জীবনে।
সেইক্ষণে মায়াবী রাবণ
তব পত্নী জানকীরে করিয়া হরণ—
রথে তুলি লয়ে গেল নিজরাজ্য স্বর্ণলঙ্কাপুরে
সাগরের পারে বহুদূরে
দ্বীপের মাঝারে।
কিষ্কিন্ধ্যার অধিপতি সুগ্রীব রাজার সনে
মিত্রতা স্থাপিয়া
তাঁর অনুচর বীর হনুমান আদি
যত কপি সৈন্যগণে
সঙ্গেতে লইয়া,
সাগর উপরে সেতু করিয়া বন্ধন
উপস্থিত হলে স্বর্ণলঙ্কাপুরে
যথা আছয়ে রাবণ।
ঘোরতর যুদ্ধ করি দীর্ঘদিন ধরি
রাবণের ভ্রাতাপুত্র-সহ সবংশে নাশিয়া
লয়ে এলে পত্নী জানকীরে
উদ্ধার করিয়া।
তব অনুগত দাস বীর হনুমান—
সেইদিন হতে তব পদে লভিলেন স্থান।
আসিলেন কপিবর অযোধ্যা পুরীতে—
জানকী দেবীর আর তোমার সহিতে।

লঙ্কা হতে অযোধ্যায় ফিরিবার পরে—
জানকী-মা সতী কিনা পরীক্ষার তরে
প্রজ্বলিত হোমানলে
প্রবেশ করিতে হল তাঁরে।
আপনার সতীত্বের করিয়া প্রমাণ
পবিত্রতা স্বরূপিনী সীতাদেবী
অযোধ্যার সিংহাসনে
লভিলেন স্থান।
লঙ্কাপুরী হইতে উদ্ধৃতা
সীতার চরিত্র 'পরে অন্যায়-সন্দেহকারী
প্রজার রঞ্জনে—
নিষ্কলুষ জানকীরে তেয়াগিলে তুমি
মনের বেদনা চাপি মনে—
জনম-দুঃখিনী জানকীরে
নিয়তির বিধান মানিয়া
অবশেষে যেতে হল বাল্মিকী-আশ্রমে
অযোধ্যা ত্যজিয়া।
মহামুনি বাল্মীকি সাদরে
কন্যা বলি গ্রহণ করেন জানকীরে।
পতির বিহনে সতী জানকীর দিন
কাটিতে লাগিল সেথা
আনন্দবিহীন।
অবশেষে এক শুভদিনে
লব-কুশ নামে দুই যমজ সন্তানে—
লভিলেন মাতা সীতা
অতি হৃষ্ট মনে।
বাল্মীকি তাদের শিখাইয়া রামায়ণ গাথা—
লয়ে যান অযোধ্যাপুরীতে
তুমি রাম রহিয়াছ যেথা।
গান শুনি রামচন্দ্র তুমি, হরিষ-বিষাদে—
জানকীরে আনাইলে আপন প্রাসাদে।
অযোধ্যা নগরবাসী সবার সাক্ষাতে
পুনরায় সতীত্বের প্রমাণ করিতে—
প্রজ্বলিত অনল মাঝারে
প্রবেশ করিতে আরবার
বলিলে দেবীরে।

সতীত্বের পূর্ণরূপ সীতা মহারাণী
সহিতে না-পারি সকলের অপমান বাণী
বারংবার
প্রবেশিলা মাতৃক্রোড়ে পাতালে-মাঝারে
জনমের তরে শেষবার।
দৈবের প্রেরিত কালপুরুষপ্রবর
স্বর্গ হতে করি আগমন—
সংগোপনে তোমা সনে
কথা কহিবারে চাহেন তখন।
প্রবেশিয়া অস্ত্রাগারে তোমরা দু'জনে—
আলোচনা রত হলে একান্ত গোপনে।
স্বর্গের পুরুষবর জানান তোমারে
কাল পূর্ণ হইয়াছে স্বর্গে ফিরিবারে—
বিলম্ব না-করে ফিরিয়া যাইতে হবে
তোমায় এ বারে।
দৈবের বিপাকে অসহায় ব্রাহ্মণের
গাভী রক্ষা তরে—
অস্ত্র সংগ্রহের লাগি
কনিষ্ঠ লক্ষ্মণ উপেক্ষিয়া তোমার বচন
অস্ত্রাগার মাঝে প্রবেশেন সেইক্ষণ।
নিরুপায় তুমি, রাম,
পারিলে না করিবারে
নিয়ম লঙ্ঘন
বেদনা-মথিত চিত্তে প্রাণপ্রিয় লক্ষ্মণেরে
করিলে বর্জন।
কর্তব্য সমাধা করি লক্ষ্মণ তখন
তব পদে বিদায় লইয়া—
সরযূর জলে ডুবি
ত্যজিলেন আপন জীবন।
কালপুরুষের বাণী দৈবের নির্দেশ মানি—
ভরত-শত্রুঘ্ন সঙ্গে তুমি, রাম,
পতিতপাবন
সরযূর জলে ডুবি করিলে আপন
লীলা সংবরণ।
অপরূপ শ্রীরাম-কাহিনী "রামায়ণ"—
এইখানে হল সমাপন।

লেখন

হৃদয়-গভীরে যেই অনুভূতি
জাগে বারে বারে—
কাব্যের আকারে ভাষার মাঝারে
তারে নিত্য প্রকাশিতে
চায় মোর মন—
এই হতে শুরু হোল আমার লেখন।
যার কথা শুনে
প্রথম জাগিয়াছিল মনে
লেখার বাসনা—
তার কথা কভু ভুলিব না।
পুত্র-সম সেইজন
মোর একান্ত আপন।
মনেতে রাখিব তারে সমস্ত জীবন।
পাঠের আগ্রহ ছিল মনেতে আমার
সর্বক্ষণ—
পাঠের মাঝারে ডুবি থাকিতাম আমি
ভরিয়া জীবন।
কিন্তু লেখনের কথা মনে মোর
জাগেনি কখনও।
আজ এই শেষের প্রহরে জীবনের—
শুরু হল আমার জীবনে
কাব্য লেখনের।
যার প্রেরণায় শুরু লেখন আমার—
আজ বারেবার কৃতজ্ঞ অন্তরে তাই
স্মরিতেছি তাহারে আবার।
পড়িতে পড়িতে যে-আনন্দ জাগিত প্রাণেতে
তার অনুভূতি না-হয় বর্ণন—
কিন্তু লেখনের মাঝে ততোধিক
আনন্দের স্বাদ লভেছি এখন।
সৃষ্টির আনন্দ যাহা তার অনুভূতি
হয়েছে সম্প্রতি।
নিত্য নব সৃষ্টির মাঝারে মোর মন
ডুবিয়া থাকিতে চাহে
তাই অনুক্ষণ।

জীবন ভরিয়া মানুষের মনে
সহস্র প্রকার অনুভূতি
জাগে অকারণে।
সে সকলে কাব্যের আকারে
রূপ দান করি—
নব নব সৃষ্টির আনন্দে
প্রাণ ওঠে ভরি।
এ সৃষ্টির অপরূপ মধুরিমা
জাগায় মনেতে
বিশ্বস্রষ্টার মহিমা।
যিনি রয়েছেন নিজ লীলায় মাতিয়া—
অন্তহীন ব্রহ্মাণ্ডের
সৃজনে ডুবিয়া।

আঁধার

অপরূপ আঁধারের রূপ হেরি
বিমোহিত প্রাণে
ভাবি মনে মনে—
কাহার কল্পনা এই নিবিড় আঁধার
সৃষ্টির আদিতে যাহা
ছিল একাকার?
কে দানিল রূপ এই অপরূপ
নিশ্ছিদ্র আঁধারে?
চন্দ্র-সূর্য-গ্রহ-তারাহীন—
অধঃঊর্ধ্ব সর্বদিক আঁধারে বিলীন,
নিকষ নিবিড় অন্ধকারে
ব্যাপৃত রেখেছে কেবা
এই নভোতল সীমাহীন?
জাগে মনে ভাবনা আবার—
অভাবিত এই আঁধারের রূপ
ইহাই কি কালের স্বরূপ?
লীলায় মগন যাঁর বুকে
রয়েছেন মহাকালী
আপনার সুখে।

অন্তহীন এই আঁধারের বুকে
কে আনিল প্রথম আলোক?
অপরূপ জ্যোতির ঝলক?
চন্দ্র-সূর্য-গ্রহ-তারাদলে
কে ছড়ায়ে দিল দলে দলে—
নিঃসীম এ আকাশের তলে?
ভাবিতে বিস্ময় আর পুলকের শিহরণ
জাগে প্রাণে—
মনের গহনে।
সেইক্ষণে চকিতে জাগিয়া ওঠে মনে—
যেই মহাশক্তি রয়েছেন
এই সৃষ্টির পেছনে,
যিনি এই সৃষ্টির কারণ—
তাঁহারই সৃজিত অন্তহীন এই
আঁধারের বুকে জ্যোতিষ্মান
যত গ্রহ-তারাগণ।
কোটি কোটি নক্ষত্র-জগৎ বুকে লয়ে
রয়েছে যে অসীম আকাশ—
সকলই যে তাঁর লীলার প্রকাশ।
আপনার লীলায় মগন হয়ে—
এই বিশ্বরূপে
রচেছেন তিনি
আপনার সুখে!
এই ভাবনার উদয় হইতে—
অকারণ পুলক জাগিয়া ওঠে
মনের নিভৃতে!
মুগ্ধ চিত্তে নতশিরে
অচিন্ত্য সে লীলাময়
স্রষ্টার চরণে—
নিবেদন করিলাম
আমার প্রণাম
সযতনে।

কে আমি?

হাড়-মাস-দেহ নহে মোর কেহ
আমি আত্মা—
আমি যে বিদেহ।
দেহহীন রজনীগন্ধার সুবাস-সমান
বিতরিছে মোর মাঝে বিশ্ব-আত্মা
তাঁহার সুঘ্রাণ।
পরম-আত্মার এক কণা—
তাহা দিয়া আমার রচনা।
তাঁহারই আনন্দে আমি
থাকি নিমগন—
সেই পরমাত্মা মোর আপনার হইতে আপন।
সংসার মাঝারে দু'দিনের তরে
মোর আগমন,
জীবদেহ লয়ে জীবরূপে
সংসারের যাতনা সহন।
কর্মের গতিকে দেহ হতে দেহান্তরে
হইবে গমন—
পুনঃপুনঃ আগমন আর নির্গমন।
অবশেষে যবে কর্মফল ভোগ শেষ হবে
দেহ ধারণের প্রয়োজন
নিঃশেষে ফুরাবে—
সেই শুভক্ষণ—
পরম-আত্মার সাথে
পুনরায় হইবে মিলন।
যিনি মোরে করিয়া গ্রহণ
করিবেন সার্থক—
আমার জনম।

সাহানা

নবাগতা পুত্রবধূ তুমি,
নামেতে সাহানা—
আঁখিকোণে হেরি তব
মনের ঠিকানা।
সরলতা ঝরে তব নীরব হাসিতে,
বেদনা প্রকাশে কভু
নয়নে চকিতে।
স্বামী আর ভাশুর-শ্বশুরে—
সেবা কর প্রাণ দিয়া
সারাদিন ধরে।
শাশুড়ী-জায়েরে যত্ন কর অকাতরে
তুমি নিত্য প্রসন্ন অন্তরে।
ভক্তিযুত স্নেহশীল হৃদয় তোমার
দেব-দ্বিজ 'পরে দেখি
ভক্তি অনিবার।
দরিদ্র-কাঙালীগণে সহসা দর্শনে—
অর্থ-বস্ত্র দান কর
অকাতর প্রাণে।
সুমিষ্ট স্বভাব আর সরল অন্তর—
আত্মীয় কি অনাত্মীয়
সকলের 'পর
সমভাবে ভালবাসা আছে তব জানা,
সকলেরই প্রিয়পাত্রী
তুমি যে সাহানা।
তোমা তরে সকাতরে প্রার্থনা জানাই
ভগবানে—
তোমারে করিতে সুখী
তব দ্বৈত-জীবনের
সার্থকতা দানে।

শিলং ভ্রমণ

আকাশযানেতে চড়ে ভ্রমণের তরে
চলেছি আমরা সুখে শিলং পাহাড়ে।
কোলকাতা হতে বহুদূরে।
কখনও দেখিনি সেই পাহাড়ের দেশ—
শুনেছি তাহার কথা
অতি মনোরম পরিবেশ।
মহানন্দে মেতে দু'ভাই আমরা
পিতামাতার সহিত চলিলাম অবশেষে
দেখিবারে সেই পাহাড়ের দেশে।
আকাশে ভ্রমণ আমাদের জীবনে প্রথম—
আনন্দ-ভীতির সে চেতনা
ভাষার মাঝারে যার
হয় না বর্ণনা।
আকাশযানের—
গোল গোল জানালা কাচের,
তার মাঝে দেখি বহু নিচে
ঠিক যেন ছবি আঁকা আছে—
নদী-মাঠ-ক্ষেত সারি সারি
গাছপালা আর ঘরবাড়ি।
অবাক হইয়া দুই ভাই রয়েছি চাহিয়া।
আকাশ হইতে নামি
স্টেশনে আসিয়া গাড়িতে চাপিয়া—
পাহাড়ের পথে ঘুরে ঘুরে উঠে
চলেছি আমরা মহানন্দে মেতে।
শিলং পাহাড়ে সরকারী ঘরে
দিদি আর দাদাবাবু বাস করে
বহুদিন ধরে।
তাঁদের আগ্রহে আমন্ত্রণে
চলেছি আমরা এ ভ্রমণে।
শীতের দেশেতে এসে
কাঠের তৈরি ঘরে বসে—
চুল্লীর উত্তাপে আনন্দে-গল্পেতে
কেটে গেল সেইদিন শুধু বিশ্রামেতে।
পরের ক'দিন পাহাড়ের পথে হেঁটে হেঁটে
বেড়িয়ে বেড়াই মোরা
নতুনের আনন্দেতে মেতে।

কাঠের তৈরি বিচিত্র সেথায় ঘরবাড়ি,
দোকান-বাজার,
নাহি জানি তুলনা তাহার।
মেয়েরা সেথায় দোকান চালায়।
মাছের দোকানে
খাসিয়া মেয়েরা বেচে-কেনে!
দেখি সেথা আরও—
দর্শনের স্থান বহুতর।
"বিশপ-বীডন" আর "সুইট" নামে
জলের প্রপাত—
"গল্‌ফ-লিংক" নামে
গল্‌ফ-খেলিবার মাঠ।
অপরূপ ডাউকীর পথ
বুনো কলাগাছ শত শত—
সুপারির গাছে গাছে
পানলতা জড়াইয়া আছে,
সেই পথশোভা তুলনারহিত।
চেরাপুঞ্জী-সহস্রধারার ভয়াবহ শোভা,
"চেরা-কেভ" নামে দীর্ঘ অন্ধকার গুহা।
চড়িলাম শিলং-এর পাহাড়চূড়ায়—
সেথা হতে শহরকে
ছবির মতন দেখা যায়।
আনন্দ-ভ্রমণ শেষে ফিরিবার দিন
গেল এসে।
যাবার পথেতে গৌহাটীতে
হইল দর্শন—
সুপবিত্র কামাখ্যা মায়ের
পীঠস্থান।
পূজাদান তরে
নামিলাম গুহার ভিতরে।
ভক্তিপূর্ণ প্রাণে নিবেদি প্রণাম
মোরা মায়ের চরণে।
অন্তরের অন্তঃস্থলে কৃপাকণা লভিনু তাঁহার—
সার্থক হইল দেখা
শিলং পাহাড়।
আনন্দ-ভ্রমণ করি শেষ—
ফিরিলাম দেশ।

সবুজ

মাটির গভীরে বীজ দীর্ঘদিন নিদ্রিত থাকিয়া—
অঙ্কুর আকারে মাথা তোলে ধীরে
চেতনা লভিয়া।
সূর্যের কিরণ আপনার সপ্তবর্ণ হতে
ধরায় তাহারে সবুজ বরন।
তরুলতা বৃক্ষ যত মাটিতে জনম
সকলেই সূর্য হতে করিছে গ্রহণ
আপনার সবুজ বরন।
তার মাঝে দেখা যায় কিছু ব্যতিক্রম—
বিভিন্ন বরন লতাগুল্ম-তরুগণ,
তাহাও তাহারা সূর্য হতে
করে আহরণ।
ফুলগুলি সবুজেরে না-করি গ্রহণ
সূর্য হতে লভিতেছে
বিবিধ বরন।
ফলগুলি শিশুকালে করিছে গ্রহণ
সবুজ বরন—
পরিণত বয়সে তাহারা
ধরে অন্য রঙ যার সূর্যই কারণ।
ফল আর পুষ্পের বাগান—
ধরেছে শ্যামল শোভা
সূর্যেরই তা দান!
শ্যামল ধরণী-বুকে যত বর্ণ হয়েছে উদ্ভব—
সূর্যের বরন ভিন্ন
অন্যকিছু নহে সেইসব।
সূর্য হতে প্রাণ পেয়ে বেঁচে আছে
এ সৌরজগৎ—
ধরণীর প্রাণী যত সূর্যেরে তাহারা
পিতা বলি করে
অনুভব।
ধরণীর জন্মদাতা সূর্য যদি হন—
তাঁর পিতা কোন জন?
—ভাবে মোর মন!
অন্তহীন মহাবিশ্ব যাঁহার সৃজন—
তাঁহারই তনয় তবে
হন কি তপন?

ভাবনা

হৃদয়ের মাঝে অবিরত জাগে যে ভাবনা—
কোথা হতে আসে তাহা
নাহি যায় জানা।
ভাবনা লোকেরে নিয়ে যায়
জগতের এক পার হতে
অন্য পারে।
জগৎ-সৃষ্টির কাল হতে নিরবধি কাল—
কতশত ভাবনার উদয়-বিলয়
হয়েছে হতেছে নিত্য
কেবা জানে তার পরিচয়?
অন্তহীন এ ভাবনা জগৎ মাঝারে
বিশ্ববাসী কোটি কোটি মানব-অন্তরে—
জাগিছে নিয়ত
যাহা সীমানারহিত।
মানুষের সকল ভাবনা
জমা হয় মহাব্যোমে—
হারায়ে যায় না।
তাই দেখা যায় জগৎ মাঝারে
একের ভাবনা—
সমভাব-ভাবী অন্যের অন্তরে
যোগায় প্রেরণা।
এ জগতে যত নবনব আবিষ্কার হতেছে সতত—
পূর্ব পূর্ব জনের ভাবনা
যোগায় প্রেরণা তারে অবিরত।
বিধাতারে ভাবে যারা হয়ে অন্যমন—
ধর্ম্মপথ-পথিকেরে সে ভাবনা
যোগায় চেতন।
বিশ্বমাঝে মানুষের ভাবনা সকল—
কোনদিন কোন ভাবে
হয় না বিফল।
সীমাহীন যত শুভ ভাবনা জগতে হইছে নিয়ত—
জগতেরে ধীরে ধীরে সে ভাবনা
করিছে উন্নত।
শুভ ভাবনারাশি অতি ধীরে ধীরে—
প্রকাশিবে জগৎ মাঝারে
"সত্যযুগ"-এর আকারে।

সুখ

সুখ খোঁজে মানুষের মন—
সুখের আকাঙ্ক্ষা করি
দুঃখেরেই করে সে বরণ
ভরিয়া জীবন।
আলো আর ছায়ার মতন
সুখ-দুঃখ অভিন্ন দু'জন—
একেরে লভিতে গেলে
অন্যেরেও লভিবে সে জন!
সুখ লাভ করিবার তরে
নিত্য নব আকাঙ্ক্ষায়
জড়াইয়া মরে।
আকাঙ্ক্ষা না-হইলে পূরণ
ঘটে নব দুঃখের কারণ।
তাহা যবে হইবে পূরণ
নবতর আকাঙ্ক্ষা হইবে সৃজন!
সংসারে আসিয়া সুখের আশায়—
বহুতর কর্মের মাঝারে
ঘুরিয়া বেড়ায়।
সফল হইলে কর্ম আপনারে সুখী মনে করে,
মহানন্দে নবতর সুখ ভোগ তরে—
পুনরায় নব দুঃখে জড়াইয়া মরে।
সুখ ভোগে যতক্ষণ তৃপ্তি নাহি আসে
অবিরাম আকাঙ্ক্ষার বশে—
বেদনা ও দুঃখ তারে গ্রাসে।
বাসনারে সংযত করিয়া
আপনারে তৃপ্ত বোধ করিবে যখন—
অনাবিল সুখ লাভ করি
শান্ত হবে মন।

দুঃখ

আপনারে দুঃখী ভাবি সুখের আশায়
অতি কষ্টে যারা জীবন কাটায়—
দুঃখ তাহাদের কভু ফুরায় না, হায়।
সংসারে আসিয়া জীবন ভরিয়া
না-পাওয়ার বেদনাতে মন—
মগ্ন রহে অনুক্ষণ।
এ-জীবনে কত কী যে পাইলাম
তাহার হিসাব না-করিয়া—
কী পাইনি তাহাই ভাবিয়া
অন্তরেতে বেদনা বহন
করে সর্বক্ষণ।
রোগ-জরা আদি দেহের দুর্ভোগ
সমভাবে আসে সবার জীবনে—
ধনী কি নির্ধন তার
হিসাব না জানে।
এ সকলে করিতে সহন
পারে না যে-জন—
আপনারে দুঃখী ভাবি
কষ্টভোগ করে তার মন।
সহনশীলতা দুঃখে করে নিবারণ
অন্যথায় দুঃখভোগ
হইবে ভীষণ।
দুঃখ সুখ উভয়ের জন্ম মানসেতে—
দেহকষ্ট কিংবা মনোকষ্ট
যারা পারে না সহিতে—
দুঃখ হতে মুক্তি তারা পাবে না জগতে।
সুখে দুঃখে সমভাবে নিরাসক্ত
যারা উদাসীন—
সুখ-দুঃখ অনুভূতি তাহাদের
চঞ্চল করে না কোনদিন।
সহস্র বাস্তব দুঃখ ভুলি আপনারে
যেবা সুখী মনে করিবারে পারে—
যথার্থ সুখেরে লভি জীবন তাহার
ভরি ওঠে ধীরে।
ধৈর্য আর সহনশীলতা দুঃখেরে করিয়া জয়
মানুষের জীবনেতে আনে সার্থকতা।

কল্যাণী

চিরকল্যাণের মূর্তি তুমি যে কল্যাণী—
আমাদের কল্যাণের তরে
আসিয়াছ তুমি আমাদের ঘরে।
তোমারে পাইয়া আমাদের মাঝে—
ভুলিয়া সকল কষ্ট
আনন্দে মেতেছি গৃহকাজে।
শান্ত-ধীর তব দু'টি নয়নের মাঝে
তব হৃদয়ের ছায়া
নিয়ত বিরাজে।
পিতামাতা আর তব শাশুড়ী শ্বশুরে
যত্ন আর সেবা তুমি
কর অকাতরে।
সুমিষ্ট স্বভাব আর সরল প্রাণেতে
আত্মীয় ও বন্ধুদের সকলের সাথে
প্রাণখোলা ব্যবহার হতে—
মনে হয় পর কেহ নাই
এ জগতে।
অন্তর গভীরে
প্রার্থনা জানাই দেবতারে
তোমার লাগিয়া—
সুখী করিবারে তোমা
জীবন ভরিয়া
শান্তি আর সফলতা দিয়া!

নবজন্ম

ওগো জীবনদেবতা মোর,
এ জনমে ঘটাইলে
পুনঃ জন্মান্তর!
নবীন করিয়া নিলে মোরে
তোমার পরশ দিয়া
হৃদয় মাঝারে।
নয়নে না পাই দরশন—
অন্তর মাঝারে পাই
তোমার স্পর্শন!

আমার অন্তরতলে বসি
রচিতেছ কবিতার রাশি
নিজেরে প্রকাশি।
নিত্য নব কবিতা সম্ভার
দিতেছ আমারে উপহার—
বুঝি না এ কী লীলা
তোমার।
শুধু বুঝি মনে—
কৃতার্থ করিলে মোরে
নবজন্ম দানে।
নব রূপ দিয়া নবীন করিলে
মোর হিয়া।
এই নব জীবন ভরিয়া
রচিবারে পারি যেন তব
মহিমার গীতি—
স্মরিবারে পারি যেন
হৃদয়ের তলে সুপ্ত তব
সুমধুর স্মৃতি।
মোর এই নবজন্ম সার্থক করিয়া
তোমার চরণে মোরে
লহ গো তুলিয়া।

অসীম

হে অসীম, তোমার সীমানা আমি
খুঁজি নিশিদিন—
অসীমের মাঝে হারাইয়া
কাটে মোর দিন।
মহাশূন্য মহাব্যোম সীমানাবিহীন—
আগণন ছায়াপথ সৌরজগৎ
মহাবেগে ধাইয়া চলেছে রাত্রিদিন
তাদের সে চলা অন্তহীন।
সৌরজগৎ আর ছায়াপথ ওরা
থামিবে না বুঝি কোনদিন?
অসীম বিস্ময়ে আমি
ভাবি দিন দিন।

আমার ভাবনা শেষহীন।
ভাবিতে ভাবিতে অবশেষে পারিনু বুঝিতে—
হে অসীম, তুমি যে দিয়েছ ধরা
সীমার ভিতরে
আমার অন্তরে।
অনুরাগভরে প্রকাশিছ তুমি আপনারে—
কোটি কোটি জীবের অন্তরে,
সীমার মাঝারে।
লীলাময় তুমি, আপনার স্বরূপ ত্যজিয়া
প্রকাশ করিছ নিজ লীলা—
জীবের অন্তরে প্রবেশিয়া।
অসীম-সসীম কেহ নহে তোমাহীন—
সবার অন্তরে তুমি
রয়েছ আসীন।
ওগো লীলাময়, মহাবিশ্ব তোমার সৃজন—
তুমিহীন নাই কিছু
নাই কোন জন।
সসীম-অসীম এই মহাবিশ্বরূপ
সকলই যে তোমার স্বরূপ—
তুমি আছ তাই আছে
যাহা যেইরূপ।
হে অসীম, হে মহিমময়,
তুমি অন্তহীন তুমি যে বিস্ময়—
আমারে করিয়া লও
শুধু তুমিময়।

ছুটি

মোর বৃদ্ধা মাতা আর
ততোধিক বৃদ্ধা তিন মাসী—
এঁদের সবারে আমি
বড় ভালবাসি।
এই নিয়ে আমার সংসার,
এই চার বৃদ্ধা ছাড়া
নেই কেহ আর।

মোর মাসীমারা সংসার না-করে
আজীবন কাটিয়েছে বাবা-মা'র ঘরে—
ভাইদের 'পরে একান্ত নির্ভর করে
চিরদিন তরে।
দাদু-দিদিমারা হয়েছেন এ-জগৎ ছাড়া।
একমাত্র ছোটমামা ছাড়া
অপর মামারা একে একে
গিয়েছেন উঠি—
সংসারবাঁধন কাটি পরপারে
নিয়ে চিরছুটি।
মা আর মাসীদের সাথে শিশুকাল হতে
আছি আমি একা—
তাঁহাদের বৃদ্ধকালে তাই
আমার কর্তব্য তাঁহাদের দেখা।
সে কর্তব্য লাগি রয়েছি তাদের সাথে
সংসার বিরাগী।
যতদিন আছে তাঁরা
হব না তাঁদের হারা—
রহিব তাঁদের অনুরাগী।
একে একে যবে তাঁরা সবে সংসার ছাড়িবে—
তাঁদের উপরে মোর কর্তব্য ফুরাবে
হব আমি সেইদিন
সম্পূর্ণ স্বাধীন—
মুক্ত বিহঙ্গের মত
বাধাবন্ধহীন।
সেইদিন হবে মোর ছুটি
রবে না জীবনে কোন কর্তব্যের ত্রুটি।
শান্ত হবে মন বুঝিব যখন
সকল কর্তব্য আমি
করেছি পালন।
জানি না কখন
আমার জীবনে
আসিবে সে ক্ষণ—
হব আমি একা,
মোর এ জীবনে ছিল যারা
একান্ত আপন
তাদের কাহারও আর পাইব না দেখা।

বিধাতার অমোঘ বিধান—
সকলের তরে তাহা একই সমান!
মানুষের জীবনের চিরসত্য
এই জন্ম-মরণেরে
পারি যেন মানিবারে
প্রশান্ত অন্তরে।

ইচ্ছাময়

ওগো ইচ্ছাময়, তব ইচ্ছার মাঝারে
পারি যেন সঁপিতে নিজেরে—
এই শক্তি দাও মোরে!
যখন যে-কাজে দিব মন
তব ইচ্ছা বলি তাহা মানিব তখন।
এ বিশ্বাসে পূর্ণ রাখ মন।
সারাটা জীবন ভরে
যত কাজ করিতে হয়েছে মোরে
সংসার ভিতরে—
সে সকলি তব ইচ্ছাক্রমে।
এ বিশ্বাস দাও মোর মনে।
জীবনের আজ এই শেষের বেলায়
রচনা করিয়া চলি কবিতা হেলায়—
বুঝিবারে পারি যেন তাহা
তোমার ইচ্ছায়!
তব মঙ্গল ইচ্ছায় চলেছে বহিয়া
মোর জীবন-তরণী—
ঘাট হতে ঘাটে ভিড়ি ক্রমে
এসেছি চলিয়া আজি
সর্বশেষ ঘাটে
মরণের তটে!
সকলি তোমার মহান ইচ্ছার দান—
এই অনুভূতি দিয়া
ভরি দাও প্রাণ!
হে মহান ইচ্ছাময়,
মোর 'পরে হইয়া সদয়—
যত কিছু দিয়াছ আমারে

সমস্ত জীবন ভরে
সে সকলি প্রকাশিছে
তোমার ইচ্ছারে।
জীবন ভরিয়া যাহা পাইয়াছি আমি—
তার তরে কৃতজ্ঞ অন্তরে
জানাই প্রণাম নতশিরে।

দৃষ্টি

দু'নয়ন ভরি সর্বত্র নেহারি
বিশ্ব প্রকৃতিরে চিরদিন ধরি,
কিন্তু তার অন্তর মাঝারে
প্রবেশিতে পারে না নয়ন—
বাহিরের রূপে তুষ্ট থাকে সর্বক্ষণ।
ফল-পুষ্প তরু-লতা নদ-নদী পর্বত-সাগর—
চন্দ্র-সূর্য গ্রহ-তারা জগৎ ভিতর
দৃষ্টি মাঝে ধরা দেয় যারা,
শুধু নয়নেরে তৃপ্তি দিতে
সক্ষম তাহারা।
পশুপক্ষী আদি যত জীব শত শত
ধরণীর 'পরে দেখা যায়—
তাহাদের অভ্যন্তরে দৃষ্টি কভু
প্রবেশ না পায়।
বিধাতার সৃষ্ট জীব যত রহিয়াছে
জগৎ ভিতরে—
মানুষ তাদের মাঝে শ্রেষ্ঠ বলি
জানে আপনারে।
বহির্বিশ্বেরে হেরি তুষ্ট নহে তাই
মানুষের মন—
অন্তর মাঝারে খুঁজিবারে তারে
চেষ্টা তার চলে অনুক্ষণ।
অন্তরের দৃষ্টি প্রসারিয়া হৃদয়ের অন্তঃস্থলে
দেখিবার তরে
প্রাণপণ চেষ্টা তারা করে।

অতি ধীরে ধীরে সুদীর্ঘ চেষ্টার পরে
খুঁজি তারা পায় হৃদয় মাঝারে—
বিশ্বের স্রষ্টারে,
যিনি রয়েছেন সবার অন্তরে।
এই দিব্যদৃষ্টি মানুষেরে দিয়াছেন যিনি—
জীবাত্মার রূপ ধরি
মানবের হৃদয় মাঝারে
বিরাজেন তিনি।
এই দৃষ্টি বিধাতার সর্বশ্রেষ্ঠ দান—
অযাচিত কৃপা তাঁর মানুষের 'পরে,
যাহার হৃদয় মাঝে রয়েছেন তিনি
আপনার প্রকাশের তরে।

শ্রীদুর্গা বন্দনা

জয় জয় মাতা দুর্গা দুর্গতিনাশিনী,
নতশিরে ভক্তিভরে তোমারে প্রণমি।
দক্ষরাজসুতা মাতা মহেশবনিতা—
ধরায় আসহ তুমি হয়ে কৃপাযুতা।
অসুরদলনী মাতা সিংহপৃষ্ঠ-আরোহিতা
অসুরে বিনাশি বারংবার
হরণ করহ ধরাভার—
দশভুজা রূপেতে তোমার।
শ্রীরাম পূজিলা তোমা নীলোৎপল দিয়া
দশানন বধ তরে ধরায় আসিয়া।
সুরথ রাজার পূজা করিলা গ্রহণ—
কৃপা লভি হল তাঁর অভীষ্টপূরণ।
পিত্রালয়ে আস প্রতি বৎসরের পরে—
মর্ত্যবাসীদের পূজা গ্রহণের তরে।
শরৎ ঋতুতে আর বসন্ত কালেতে
ভকতের পূজা লহ হরষিত চিতে।
গণেশজননী মাতা সর্বসিদ্ধিপ্রদায়িনী,
যাত্রাকালে তোমারে স্মরিলে হও
সর্ববিঘ্ন-তারিণী।

ভক্তিভরে তোমারে প্রণমি—
সন্তানের সর্বক্রটি ক্ষমি
কৃপাকণা দেহ মাতা
দশভুজা জগৎপূজিতা।

দেবী সরস্বতী

শুক্লাম্বরা শ্বেতপদ্মাসীনা মহেশদুহিতা—
জ্ঞানমূর্তি সরস্বতী মাতা
তুমি জগৎ-বন্দিতা।
তোমার বাহন শুভ্র রাজহংস-পৃষ্ঠে
করি আরোহণ
হয় তব শুভ আগমন।
মর্ত্যবাসী 'পরে দয়া করে
ধরণীতে আস তুমি বৎসরে বৎসরে
জ্ঞানদান তরে।
সর্ববিদ্যা অধিশ্বরী জ্ঞানের মুরতি
তুমি দেবী সরস্বতী—
জ্ঞানদান কর তুমি তব ভক্তগণে
অতি হৃষ্টমনে।
বিদ্যা আর জ্ঞান লভিবারে
মর্ত্যবাসী তোমা পূজা করে
নমি ভক্তি ভরে।
শীতের সকালে পুষ্প-বিল্বদলে
পূজে তোমা যত ভক্তগণ—
করিয়া যতন।
দশভুজা জননীর সনে
প্রতি শারদ-আশ্বিনে—
হয় তব পুনরাগমন জগৎ মাঝারে
জগজন তরে।
পূজে তারা সযতনে ভক্তিযুত প্রাণে—
কৃপাবশে সিদ্ধি দান কর তাহাদের
আনন্দিত মনে।

জয় জয় সরস্বতী মাতা—
লহ গো প্রণাম মোর
হয়ে কৃপাযুতা।
কৃপাকণা দানে
ধন্য কর মাতা—
তব অধম সন্তানে।

পুণ্য জন্মতিথি

(১৩ই পৌষ, ১৪০৬ ২৯শে ডিসেম্বর ১৯৯৯)

জয় জয় সারদা জননী,
আজ তব পুণ্য জন্মদিনে—
নতশিরে ভক্তিভরে
তোমারে প্রণমি।
জন্ম লভেছিলে তুমি মানবী আকারে
এই ধরা 'পরে—
বিশ্বজনে উদ্ধারের তরে।
ক্ষমারূপা তপস্বিনী মাতা—
দীনহীন-দুর্গত-পতিত জনে
কৃপাদানে ধন্য করিবারে
হয়েছিল তব আগমন
এই শুভদিনে।
শক্তিরূপা মাতা তুমি,
তোমার মাঝারে পাইয়াছে বিশ্ববাসী
মাতৃরূপে শ্রীরামকৃষ্ণেরে।
তাঁর শ্রেষ্ঠ দান এই কৃপা
জগৎজনেরে।
বিশ্বময় যত প্রাণীগণ
সকলেরে জানিতেন তিনি
সন্তান আপন।
তাঁর এই মাতৃভাব জগতের 'পরে
রাখিয়া গেলেন তিনি তোমার মাঝারে—
অপরূপা এক বিশ্বজননীরে।

বিশ্ববাসী জগৎ-জননীরূপে জানিয়া তোমারে—
আসিতে লাগিল দলে দলে
তব কৃপালাভ তরে।
অকাতরে প্রেম বিলাইলে তুমি
মন্ত্রদীক্ষা দানে—
জাতি-ধর্ম নির্বিশেষে
সকল সন্তানে।
শান্তির মহান বাণী শুনাইলে জগৎবাসীরে—
পরমাত্মা রয়েছেন সবার অন্তরে।
তাই সকলেরে আপন জানিয়া
ভালবাসিতে পারিলে—
অনাবিল শান্তি লভি
তৃপ্ত হবে কালে।
জগতের যত পাপী-তাপী উচ্চ-নীচ সবে
জেনেছিলে তুমি সন্তান আপন
তাই অকাতরে চরণের
পূত-স্পর্শদানে
তাহাদের পাপভার করিলে গ্রহণ।
দুঃসহ দেহের ক্লেশ ভুগি অবশেষে—
মর্ত্যতনু ত্যাগ করি
গেলে নিজ স্বরূপেতে মিশে।

কে তুমি?

(শ্রীশ্রীঠাকুরের জন্মতিথি ১১ই মার্চ স্মরণে)

কে তুমি ধরায় এলে এ গহন কলিকালে
পতিতেরে করিতে উদ্ধার?
হরণ করিতে ধরাভার?
কামারপুকুর গ্রামে শৈশবের লীলাধাম তব,
নররূপে অবতরি আসিলে যেথায় হরি—
দেখাইতে লীলা অভিনব।
প্রতিবেশীদের সাথে বিশালাক্ষী-দর্শনের পথে
আনুড় গ্রামেতে লভিলে যে অপরূপ
জ্যোতির দর্শন—
তোমার শৈশবে সেই সমাধি প্রথম!

এ অপূর্ব সমাধি তোমার
সমস্ত জীবন ভরি ঘটেছিল
বারবার—
যাহাতে জানিল জনগণ
নররূপী তুমি নারায়ণ।
ঘটেছিল তব আগমন ধরণীতে—
কলির তমসা ঘুচাইয়া
বিশ্বজনে আলোকের পথ
প্রদর্শিতে।
সামান্য ক'জন ভক্তেরে জানিয়াছিলে তুমি
একান্ত আপন—
তাহাদের মাঝে তব শক্তি সঞ্চারিয়া
করিলে সাধন তব
উদ্দেশ্য মহান।
আত্মত্যাগ মহামন্ত্রে তাহাদের করি উদ্বোধন—
শিখাইলে সেই কঠিন সাধন,
আপনার হৃদয় মাঝারে
করিবারে আত্ম-দরশন।
তাহাদের শিক্ষা যবে হল সমাপন—
জগতে থাকার তব রহিল না
আর প্রয়োজন
মর্ত্যতনু ত্যজি মিশি গেলে
স্বরূপে আপন।
তেমার প্রধান শিষ্য তব বাণী করিল প্রচার
চলি গেল দেশান্তরে সাগরের পার,
বেদান্তের মহাশিক্ষা দানিল তাদের
আত্মদর্শনের।
ভিন্নধর্মী ভিন্ন ভাষাভাষী—
দলে দলে বিদেশীরা আসি—
হয়ে নতশির
গ্রহণ করিল মন্ত্র তেজোদীপ্ত
এই যুব-সন্ন্যাসীর।
স্বীয় গুরুভাইদের পাঠাইল দেশে দেশে
করিতে প্রচার এই বৈদিক ধর্মের—
"শিবজ্ঞানে জীবসেবা" এই
মহামন্ত্র প্রচারের।

বিশ্বস্রষ্টা পরমাত্মা যিনি
রয়েছেন তিনি সবার অন্তরে—
ভ্রান্ত তারা খোঁজে যারা
তাঁহারে বাহিরে।
শ্রীগুরুর মহাধর্ম জগৎ মাঝারে
প্রচারের পরে—
প্রিয় শিষ্য তাঁর চলি গেলা
মায়াময় জগৎ ত্যজিয়া
চিরদিন তরে।

স্মৃতি

আমার মামার সাথে
কেটেছিল মোর শৈশবের দিনগুলি—
বড় আনন্দেতে।
বাবা-মার কাছ হতে
এনেছিল মামা মোরে—
পরম স্নেহেতে
অতি শৈশবেতে।
স্নেহে-গড়া পুতুল সমান
দেখেছিল মামা মোরে
একান্ত আপন।
সেই মোর সেজমামা—
মেজ আর ছোট দুই মামার সহিতে
থাকিতেন একই বাড়িতে।
বড়মামা যিনি
তাঁরে কভু দেখি নাই আমি—
দেশের বাড়িতে গত হয়েছেন তিনি।
আমার জনম হয়েছিল
এই শহরেতে—
বাবার বাড়িতে।
সেথা হতে সেজমামা এনেছিল মোরে
তাঁদের বাড়িতে, বড় আদরেতে।

এ মামার মত প্রাণ ঢেলে
অন্যেরা আমারে তত
করিত না স্নেহ শিশু বলে।
মায়ের অধিক স্নেহপরায়ণ
এই মামা ছিল মোর
একান্ত আপন।
লেখাপড়া আর খেলাধুলা
স্নান-খাওয়া আর ঘুম-শোয়া
সবই এই মামার সহিত
করিতাম আমি দুই বেলা।
এ জগতে মামা ছাড়া আর
কারেও জানিনি আমি
আপন আমার।
এই আনন্দের মাঝে মোর
কেটে গেল জীবনের
ছয়টি বৎসর।
তারপর একদিন দুপুরেতে
বাবা এসে নিয়ে গেল মোরে
নিজের বাড়িতে
মামা মোর সে-সময়ে ছিল অফিসেতে।
কাঁদিতে কাঁদিতে আমি
চলিলাম নিজের বাড়িতে—
বাবার সঙ্গেতে!
মনে মনে ভাবিলাম, হায়,
মামা যদি মোর বাবা হত—
আমারে তাহলে আজ
এ বাড়ি ছাড়িয়া যেতে নাহি হত!
ভুলিব না আমি এ জীবনে
মর্মান্তিক সেই বেদনার দিনে—
কী আঘাত লেগেছিল
মোর শিশু মনে।
আজ মোর জীবনের
শেষের প্রহরে
পড়িতেছে মনে সেই
পুরাতন দিনে।

স্নেহময় মোর সে মামারে।
লোকান্তরে গেছেন চলিয়া
একে একে সকল মামারা—
ফিরিবে না আজ আর
কেহই তাহারা।
কিন্তু সেই সেজমামা তরে
কাঁদে মোর প্রাণ আজও
যখনি তাঁহারে মনে পড়ে।
এ অপার স্নেহের বন্ধন
টুটিবে না কভু—
যতক্ষণ আছে এ জীবন।

নব সহস্রাব্দ

হে নূতন সহস্রাব্দ,
তোমারে প্রণাম—
আমার জীবনে বহু ভাগ্যগুণে
তোমার দর্শন লভিলাম।
নবীন প্রভাত-রবি আজি
ঘোষিল জগতে তব আগমন—
দিব্য-জ্যোতি প্রকাশিয়া
আকাশের ভালে
জানালো তোমারে স্বাগতম্।
হে নবীন, অপূর্ণেরে করি পূর্ণ
আসিয়াছ তুমি—
তোমার পূর্ণতা দানি
পরিপূর্ণ কর এ ধরণী।
বিগত বৎসরে যত দুঃখ গ্লানি
সয়েছিল জগতের প্রাণী—
সে সকলে নিঃশেষ করিয়া
আনো তুমি জগতের তরে
পূর্ণতার বাণী।
প্রকৃতির রুদ্ররূপ অতি ভয়ংকর
সয়েছিল বিগত বৎসর—
জলের প্লাবনে আর ঘূর্ণিঝড়ে।

আসিয়াছ তুমি আজ
সে সকলে সরাইয়া দূরে।
হে নব শতাব্দী,
তুমি সহস্র বৎসরে
পরিপূর্ণের আকারে
এনেছ আশার বার্তা
জগতের তরে—
সে আশা করিবে পূর্ণ
এ আশ্বাস দানো
জগৎ-বাসীরে।
নূতন আশায় ভরা তুমি,
এসেছ জগতে
এক সহস্রের পর—
নব আশা জাগাইয়া, নবপ্রাণ সঞ্চারিয়া
পূর্ণ কর মানব অন্তর।
হে মহাসুন্দর,
আজি মোর জীবনের
অন্তিম লগনে—
তোমার দর্শন লভিলাম।
কৃতজ্ঞ অন্তরে তাই
তোমারে জানাই
আমার প্রণাম।

কল্পতরু শ্রীরামকৃষ্ণ

(১লা জানুযারী, ২০০০)

কল্পতরু-রূপে তুমি এই পুণ্য দিনে
দিয়েছিলে দরশন তব
গৃহীভক্তগণে।
তাহার স্মরণে আজিও শতাব্দী পরে
মাগিছে করুণা তব ভক্তগণে
কাশীপুর উদ্যান-ভবনে।
হে অদৃশ্য-শক্তিরূপী নরদেব তুমি—
পুরাবে কি তাদের প্রার্থনা
এই মর্ত্যভূমে নামি?

মুছাবে কি তাহাদের হৃদয় বেদনা,
ঘুচাবে কি তাহাদের
অন্তর যাতনা?
কল্পতরু হয়েছিলে তুমি
শুধুই কি সেদিনের তরে?
নহ তা' কখন—
বিশ্বময় যত ভক্তগণ
মানে তোমা কল্পতরু বলি
ভরিয়া জীবন।
এ বিশ্বাস তাহাদের রবে আমরণ।
হে নরদেবতা, বিশ্বময় যত প্রাণী তরে
সহন করিয়াছিলে তুমি
অন্তরের ব্যথা।
তুমি ছিলে তাহাদের জননী সমান—
জেনেছিলে তাহাদের
আপন সন্তান।
তাই সব পাপী-তাপী
উদ্ধারের তরে—
তাহাদের যত পাপ নিজ দেহে
করিয়া গ্রহণ,
দুঃসহ দেহের ক্লেশ ভুগি অবশেষে
নিঃশেষে করিয়া গেলে দান—
আপন জীবন।
হে মহান কল্পতরু,
আজি এই দিনে—
জগৎ-বাসীর সনে
প্রার্থনা জানাই মনে মনে—
দাও মোরে পবিত্রতা
আর নির্ভরতা তোমা 'পরে
চিরদিন ধরে,
ভুলিতে দিও না তোমা জন্মে-জন্মান্তরে,
নিয়ে যেও হাত ধরে
জীবনের পারে।

নটরাজ

হে ভবেশ, হে মৌলী-মহেশ,
শান্ত রুদ্র দ্বৈতরূপে
মহাবিশ্বে তোমার প্রকাশ।
ধ্যান-মৌনী শান্ত-স্থির হিমাদ্রি-সমান
নিমিলিত আনত নয়ন—
মৌলী-ভূষণ মহাযোগী
যোগেতে মগন।
অপরূপ এই শান্তরূপ তব
অতীব মহান।
রুদ্ররূপে তাণ্ডব-নর্তনে বিস্মরি আপনা—
প্রলয়ের বিষাণ বাজায়ে ঘোর রবে,
জটাজাল উড়াইয়া অশান্ত করিয়া
ফণী সবে,
প্রলয়-অনল জ্বালি ভালে
হয় তব নৃত্যের সূচনা—
ধ্বংস আর মৃত্যুর ঘোষণা।
শূলপাণি হে শংকর,
অতি ভয়ংকর তব এই রুদ্ররূপ—
কিন্তু নহে ইহা তব যথার্থ স্বরূপ।
মহাযোগী মহাজ্ঞানী তুমি মহানুভব—
দানিতেছ এই মহাবিশ্বে
তব অতুল বিভব।
হে ভৈরব, প্রলয় নর্তনে বিনাশিছ মহাবিশ্বে
যত অকল্যাণ—
নবীন সৃষ্টির মাঝে পুনঃ
প্রতিষ্ঠা করিছ নবপ্রাণ।
চন্দ্রচূড়, হে ফণিভূষণ,
পূজে তোমা বিশ্ববাসী ভক্ত অগনণ—
ঘনঘোর অমানিশা রাতে,
চারি প্রহরেতে
বিল্বপত্র আর গঙ্গাজলে
পূজে তোমা ভক্তদলে অনুরাগ ভরে—
তব কৃপা লভিবারে।

ভোলানাথ শিবযোগী তুমি, হে মহান—
মহাবিশ্বের কল্যাণ তরে
রত আছ ভুলিয়া নিজেরে।
অতি ক্ষুদ্র দীন আমি সামান্য মানব—
অন্তরে লভিতে চাহি
তোমার বিভব।
পবিত্র অন্তরে ভক্তিভরে নিত্য করি
তোমারে বন্দনা—
পুরাও প্রার্থনা মোর
দান করি তব কৃপাকণা।

বটবৃক্ষ তুমি বৃক্ষরাজ,
আছ এ পথের ধারে
সুদীর্ঘ বৎসর ধরে—
শ্রান্ত পথিকেরে ছায়া দানে তৃপ্ত করা,
এই তব কাজ।
ভাব একবার—
কবে কোনদিন এ পথের ধারে
বীজের মাঝারে
অংকুরিত হয়েছিলে,
নাহি রাখ হিসাব তাহার।
অতি ধীরে ধীরে বৎসরে বৎসরে
পরিণতি লভি অবশেষে —
ধরিয়াছ আজ এই বিশাল বিস্তার
মহীরুহের আকার।
হে মৌনী তাপস, জীবের কল্যাণ তরে
জনম তোমার এই ধরা 'পরে।
কত শত পক্ষিকুল লভিছে আশ্রয়,
তব শাখা 'পরে একান্ত নির্ভরে।
সুশীতল ছায়া দান করি পথচারীগণে,
ক্লান্তি দূর করিতেছ তুমি হৃষ্ট মনে।
ছাগ-গরু মহিষাদি যত পশুগণে
তৃপ্ত করিতেছ নিতি
স্নিগ্ধ ছায়া দানে।

প্রখর তপন-তাপ সহি নিজ দেহে—
করিতেছ শ্রান্তি দূর প্রাণীকুলে
তুমি মাতৃস্নেহে।
ঘোরতর বাদলের দিনে ঘন ঘন অশনি পতনে—
গৃহহারা যত জীবগণে
দিতেছ আশ্রয় একান্ত যতনে।
পথচারীজন কিংবা যত প্রাণীগণ,
জানে তোমা তাহাদের একান্ত আপন।
সুদিনে-দুর্দিনে ক্লান্তিহীন
প্রহরায় রত,
রয়েছ সতত।
বিধাতার সৃষ্টি তুমি,
বৃক্ষরূপী মহান সন্ন্যাসী—
পর-উপকার ব্রত পালনের তরে
আছ নিবানিশি।
তোমার স্মরণে—
অপার বিস্ময় জাগে প্রাণে।
বৃক্ষ, তুমি ত্যাগের উপমা—
অপরূপ তুমি
না হয় তুলনা।

ঘুম

ঘুমাই আমরা প্রতি রাতে
পুনঃ জাগি সকালেতে—
এর ব্যতিক্রম কিছু
হয় না জগতে।
কিন্তু যবে হয় কাহারও মরণ
পুনঃ কেন জাগে না সে-জন?
কেন থাকে চিরঘুমে
হয়ে অচেতন?
এই চিন্তা করে মোর মন—
বুঝি না কখনও আমি
ইহার কারণ।

মরণ ও ঘুমানোতে
কী তফাৎ ঘটে?
কেন মরা মানুষেরা
জাগিয়া না ওঠে?
এ ভাবনা মোর মন হতে
সরাতে পারি না কোন মতে।
বয়সের পরিণতি সনে
ধীরে ধীরে বুঝি মনে মনে—
পার্থক্য রয়েছে এ দু'য়ের
মরণের আর ঘুমানের।
ঘুমের সময় দেহ হতে কোন বস্তু
নাহি বাহিরায়,
কিন্তু মরণেতে দেহ হতে
"প্রাণ" বাহিরায়।
প্রাণ-বস্তু কি জিনিস,
কেন বাহিরায়?
বায়ুমাত্র উহা কেহ বুঝায় আমায়।
বায়ুর অভাবে জীব বাঁচিতে না পারে,
বায়ুহীন দেহ কিংবা গেহ
নহে যোগ্য প্রাণ বাঁচাবারে।
ঘুমের সময় প্রাণবায়ু শুধুমাত্র
অচেতন রয় ক্ষণকাল তরে।
পুনঃ ভাবি হৃদয় মাঝারে—
ঘুম আর মরণের পার্থক্য কি তবে
শুধু সময়ের?
ঘুম আনে প্রাণের বিরতি শুধুমাত্র
ক্ষণকাল ধরে?
আর মরণেতে সে বিরতি ঘটে
বুঝি চিরকাল তরে?
কিন্তু আজ জানি মনে
ঘুম আর মরণের
পার্থক্য কোথায়।
মরণেতে দেহ হতে প্রাণবায়ু
বাহিরিয়া যায় চিরদিন তরে।
ঘুমের মাঝারে সেই বায়ু
প্রবাহিত হয় ধীরে ধীরে—
নিঃশ্বাস আকারে।

বীর সন্ন্যাসী

(স্বামী বিবেকানন্দের পুণ্য জন্মতিথি স্মরণে)

হে বীর সন্ন্যাসী, হে নবীন প্রাণ—
ভক্তিনত শিরে অন্তর গভীরে
জানাই তোমারে আজ
আমার প্রণাম।
তোমার মহিমা চিন্তায় না-পায় সীমা—
হে বিরাট, হে মহান প্রাণ,
জীব মাঝে শিব দর্শনের
মহামন্ত্র করি গেলে দান।
বিশ্বমাঝে যত জীব সকলের তরে
সমভাবে কাঁদে তব প্রাণ—
আত্ম-পর ভেদবুদ্ধি নাশ করি
প্রচার করিয়া গেলে—
সবার হৃদয়ে বিরাজিছে একই ভগবান।
সন্ন্যাস লভিয়া পদব্রজে ভ্রমিলে ভারত—
দর্শন লভিলে সারাদেশব্যাপী
রহিয়াছে যত পতিত-দুর্গত।
সকলের তরে কী গভীর বেদনায়
অন্তর তোমার হইল মথিত!
ভ্রমিবার কালে বৃন্দাবনে আসিলে যখন—
পথপার্শ্বে চণ্ডালের হাত হতে
তাম্রকূট করিলে সেবন।
"বিশ্বধর্ম-মহাসম্মিলন" দেশান্তরে হইল যখন—
তব অনুরাগী দক্ষিণ দেশের যুবগণ,
ভারতের প্রতিনিধি রূপে
তোমারে সে দেশে পাঠাইতে
করিল যতন।
শ্রীগুরুচরণ স্মরি দৈবইচ্ছা অনুভব করি—
গেলে চলি সে অজানা দেশে,
নির্ভীক গৈরিক এক সন্ন্যাসীর বেশে।
বেদান্তের মহাবাণী সর্বজীবে শিব দর্শন করার
মহাধর্ম করিলে প্রচার তুমি
বিশ্বের মাঝার।

সুবিপুল হর্ষধ্বনি মাঝে বেদান্তের ধর্ম
শ্রেষ্ঠ বলি ঘোষিত হইল—
সকলই গুরুর ইচ্ছা জানি
তোমার অন্তরে প্রশান্তি আসিল।
স্বদেশে ফিরিতে তব ভক্তগণ তোমা
"বিশ্ব-বিজয়ী" আখ্যা দিল—
স্বদেশী-বিদেশী শত শত ভক্ত তোমা
গুরুরূপে বরণ করিল।
সারা বিশ্বে মহাধর্ম প্রচারের তরে
স্বীয় গুরু ভ্রাতাগণে পাঠাইলে তুমি
দেশে দেশান্তরে।
শ্রীগুরুর ভস্ম-অস্থি প্রোথিত যেখানে—
সেই গঙ্গাতীরে প্রতিষ্ঠা করিলে মঠ
সেবাধর্মে দীক্ষিত করিতে
ত্যাগী যুবগণে।
বিশ্বময় শ্রীগুরুর আদর্শ প্রচারি,
স্বীয় মহাজীবনের দুরূহ কর্তব্যভার
করি সমাপন—
তরুণ সন্ন্যাসী, তুমি যোগবলে
স্বেচ্ছামৃত্যু করিলে বরণ।
হে মহাজীবন, তোমার স্মরণে
হৃদয়ের প্রসারতা আনে—
বিশ্বজনে ভাই বলি গ্রহণ করিতে
আকুলতা জাগে মোর প্রাণে।
হে বীর সন্ন্যাসী, কৃপা কর মোরে—
তোমার আদর্শ যেন পারি লভিবারে,
এ জীবন ভরে।

মাছ

মহাপ্রলয়ের কালে বিশ্বে যবে ঘটিল প্লাবন—
মীনরূপ ধরি মহাগ্রন্থ বেদ
উদ্ধারেন নিজে নারায়ণ।
যুগ-সংস্কারের প্রয়োজনে যুগে যুগে
ভগবান অবতীর্ণ হন,
মৎস্য অবতার হন
সবার প্রথম।

দশ-অবতার স্তোত্র করিয়া রচনা
মৎস্য-রূপী নারায়ণে
ভক্তগণ করেন বন্দনা।
জলেতে জন্মায় মাছ জলে বাস করে,
জল বিনা মাছ কভু বাঁচিতে না পারে।
জলজ উদ্ভিদ-সহ ছোট ছোট পোকা—
আহার করিতে মাছে সদা যায় দেখা।
সমুদ্রে নদীতে কিংবা পুকুরে ও খালে—
ছোট-বড় বহুতর মাছ সব খেলে
সাগরের মাছগুলি
ছোট মাছেদের খায় গিলি।
ছোট মাছ যারা—
জলের উদ্ভিদ আর পোকা
খায় তারা।
জলচর প্রাণী যত আছে
তার মাঝে মাছের আদর বেশি
মানুষের কাছে।
সুখাদ্য রূপেতে মাছ মানুষের প্রিয়—
আমিষ আহার রূপে
মাছ গ্রহণীয়।
অতি প্রিয় খাদ্য মাছ
বাঙালীর কাছে—
মাছ বিনা ভাত তার মুখে
নাহি রোচে।
দেশবাসী মানুষের রুচি অনুসারে—
বিবিধ প্রকারে মাছ রান্না হয়
ভিন্ন ভিন্ন ঘরে।
সৌখীন লোকের ঘরে সৌন্দর্যের তরে—
ছোট ছোট রঙীন মাছেরে
সাজাইয়া রাখে
জলভরা কাচের আধারে।
মাছের কদর মানুষের কাছে
চিরদিন আছে—
চিরদিন তাহা রবে,
কভু না ফুরাবে।

শ্রীমা অরণ্যকুমারী

অরণ্যকুমারী মাতা,
জগৎ-বন্দিতা—
প্রণমি তোমারে দেবী
হয়ে ভক্তিযুতা।
অতি ক্ষুদ্র দীন আমি
সন্তান তোমার—
সাধ্য নাই তোমার মহিমা বর্ণিবার।
ভক্তি-অর্ঘ্য দিয়ে নিত্য
পূজিতে তোমারে—
মোর মন চাহে বারে বারে।
তোমারে দেখার ভাগ্য
ঘটেনি আমার—
অমর-বিগ্রহ মাঝে
লভিয়াছি দর্শন তোমার।
শুনিয়াছি আমি তব জীবনকাহিনী—
জানিয়াছি তুমি যত ভক্তদের
যথার্থ জননী।
বিবাহিতা হলে তুমি অতি শৈশবেতে—
সত্য-অনুরাগী শুদ্ধচিত্ত
এক যুবকের সাথে।
সংসারবিরাগী উদাসীন সে পতিরে—
প্রাণপণ যত্নে তুমি চেষ্টা
করেছিলে সেবিবারে।
গৃহধর্ম ত্যজি তব পতি—
দেবীর মন্দিরে বসি কাটাতেন
সারা দিবারাতি।
অশ্রুজলে সরোদনে মাতৃরূপা
দেবীর স্মরণে—
অনাবিল শান্তি আর তৃপ্তি
লভিতেন তিনি প্রাণে।
তুমি সতী পতির তৃপ্তিতে—
গৃহকর্মে রত হয়ে
আনন্দে থাকিতে।

দেবীকৃপা লভি তব পতি—
সত্যদ্রষ্টা ঋষিরূপে
লভিলেন খ্যাতি।
দেশ দেশান্তর হতে লোক অগণন,
আসিতে লাগিল জলস্রোতের মতন-
পূজিবারে সত্যদ্রষ্টা
তব পতির চরণ।
তুমি মাতা সেবিতে তাদের হয়ে হৃষ্টমন—
আপন সন্তান রূপে অকাতরে
তাহাদের করিয়া গ্রহণ।
আজ তোমা দুইজনে
গেছ চলি নিত্যধামে—
নশ্বর এ জগৎ ত্যজিয়া,
মন্দির ভিতরে বিগ্রহ মাঝারে
আছ দোঁহে নিয়ত জাগিয়া।
ভক্তিভরে নতশিরে কাতর অন্তরে
প্রার্থনা জানাই বারে বারে—
ওগো, অন্তর্যামী দেবতাযুগল,
কৃপাকণা দান করি
কর মোর জীবন সফল।

শ্রীপ্রণবানন্দ স্বামী

শিব অংশে জন্ম তব শিবরূপী তুমি,
হে মহান স্বামি,
ভক্তিনত চিত্তে আমি
তোমারে প্রণমি।
শিবের ত্রিশূল-দণ্ড ধরিয়াছ হাতে,
দীর্ঘ জটাজাল তব শোভিতেছে মাথে,
কণ্ঠে বিলম্বিত রুদ্রাক্ষের মালা অপরূপ—
স্থূলদেহে গৈরিক বসনে
ধরেছ শিবরূপ।
হে যোগীপ্রবর, জন্মিয়াছ তুমি ধরণীতে—
হীনবল দেশবাসীগণে
শক্তি যোগাইতে।

শিবমন্ত্রে দীক্ষিত করিয়া যুবগণে
অন্তরে শক্তির উদ্বোধন করি—
প্রতিষ্ঠিত করিলে তাদের
জীবসেবারূপ মহাধর্মের সাধনে।
নব নব সেবাশ্রম প্রতিষ্ঠা করিলে দেশ জুড়ে—
অনাথ দুর্গত দেশবাসীদের
সেবা আর শুশ্রূষার তরে।
বন্যাত্রাণে দুর্ভিক্ষেতে আশ্রমকর্মীরা ওঠে মেতে—
যায় চলি সে সব দেশেতে
সেবা দিয়া দুর্গতের সাহায্য করিতে।
দেশব্যাপী যত তীর্থস্থানে—
সাহায্য দানিতে অসহায় তীর্থযাত্রীগণে,
তোমার আশ্রমকর্মী যত
উপস্থিত থাকেন সেখানে।
প্রতি শুভযোগ দিনে তীর্থস্নানকামী যাত্রীদের
সাহায্য দানিতে—
আশ্রম কর্মীরা উপস্থিত হন
হৃষ্ট চিতে।
হে মহান কর্মযোগী,
আজ তুমি নাই—
কিন্তু তব আদর্শ রয়েছে
আজও বাঁচি।
তব আদর্শের অনুগামী
তব যত ভক্তগণ—
তোমারে স্মরিয়া রাখিয়াছে বাঁচাইয়া
তব প্রতিষ্ঠিত দেশময় যত
সেবাশ্রম।
হে বিরাট শিবযোগী,
রহিয়াছ তুমি দেশবাসীদের
স্মরণের মন্দিরেতে চিরদিন।
দিতেছে তাহারা তোমা
হৃদয়ের বিনম্র ভক্তির অর্ঘ্য
প্রতি রাত্রিদিন।

ভগবান

কোথা ভগবান কত দূরে?
দেখিতে পাই না কেন তাঁরে?
ভাবি বারে বারে।
বিশ্বপ্রকৃতিরে দেখা যায় নয়নের 'পরে—
গ্রহতারা রবি-শশী যত
প্রতি দিনে রাতে
তাহাদের দেখি যে নিয়ত।
যিনি রচেছেন এই বিশ্ব মহান—
কোথা তিনি, কোথা ভগবান?
কেন তাঁরে নাহি দেখি নয়নের 'পরে?
জলে স্থলে অনন্ত আকাশে—
খুঁজি তাঁরে সব দিক্ দেশে,
কেন তাঁরে নাহি যায় জানা?
তিনি কি অজানা?
জন্মের প্রথম লগ্ন হতে
যত লোক এসেছে জগতে
যত জাতি যত ভাষাভাষী—
সকলেই শুনেছে সে নাম,
তিনি ভগবান।
সংসারবিরাগী যাঁরা খোঁজে তাঁরা তাঁরে—
অরণ্যে পর্বতে বিজন সাগরতটে,
গুহার আঁধারে।
কিন্তু হায়, তাঁহারে যে দেখা নাহি যায়,
কোথা তিনি আছেন লুকায়ে?
তবে বুঝি মিথ্যা এ ধারণা,
বুঝি ইহা ঘোর প্রবঞ্চনা?
ভগবান নামে নাই কেহ এই বিশ্বধামে?
অন্তরের তলে শুনি কুতুহলে,
অভাবিত দিব্যবাণী—
"চার্বাকের দলে নহ তুমি,
কেন তবে এই অবিশ্বাস?
এই মহাবিশ্ব জুড়ে রয়েছি যে আমি
চৈতন্য আকারে?
এ নয়নে হবে না দর্শন—
ধ্যান মাঝে জ্ঞাননেত্রে কর দরশন।"

বিমুগ্ধ বিস্ময়ে ক্ষণতরে স্তব্ধ রহিলাম—
ভাবাবিষ্ট প্রাণে সে চরণে রাখিলাম,
আমার প্রণাম।

বিশ্বরূপ

হে মহান বিশ্বরূপ,
এ বিরাট মহাবিশ্ব শুধু তুমিময়—
তুমিহীন কিছু নাই
কিছু নাহি হয়।
অনাদি অনন্ত সীমাহীন,
মহাকাল তোমাতে বিলীন।
অন্ধকার আলো রূপ ও অরূপ—
সবই তব রূপ।
মহাবিশ্ব মাঝে চেতনা আকারে
ব্যাপ্ত হয়ে আছ যেই তুমি—
সেই চেতনেরও চেতয়িতা তুমি।
ব্যক্ত আর অব্যক্তের রূপে
দৃশ্য আর অদৃশ্য আকারে,
সূক্ষ্ম-স্থূল অণু-পরমাণু যত রূপ—
সকলি যে তোমার স্বরূপ।
ঊর্ণনাভ সম, হে মহান,
তোমার রচিত বিশ্ব দেহ মন প্রাণ
আত্মা পরমাত্মা সবার মাঝারে—
বিরাজিত আছ তুমি চেতনা আকারে।
সৎ-চিৎ-আনন্দ রূপ তোমার স্বরূপ।
সে আনন্দ রূপে মগ্ন হয়ে
অপার লীলায়—
সৃজন করিছ বিশ্ব
আপন খেলায়।
সে খেলার অবসানে চূর্ণ করি
সে সৃষ্টি তোমার
নবতর সৃষ্টিখেলা রচিছ আবার।

হে মহান শিশু,
গড়া আর ভাঙা শুধু তোমার খেয়াল—
এ বিচিত্র খেলা তুমি খেলিয়া
চলেছ চিরকাল।
হে মহা চৈতন্যরূপ,
তব চেতনার পরমাণু মাত্র দিয়া
গড়িয়াছ তুমি মোর রূপ।
সেই পরমাণু আমি,
কেমনে ধারণা করি পূর্ণের স্বরূপ?
চিন্তার অতীত তুমি,
ওগো বিশ্বরূপ।

বীর হনুমান

দাস্যভক্তি প্রতিমূর্তি মহাবীর তুমি—
ভক্তিনত চিত্তে আমি
তোমারে প্রণমি!
ত্রেতাযুগে কিষ্কিন্ধ্যা নগরে
সুগ্রীব রাজার সনে—
ছিলে তুমি বনে।
দৈবযোগে সে সময়ে যুগ-অবতার
শ্রীরামচন্দ্রের দেখা
মিলিল তোমার।
দর্শন-মুহূর্ত হতে প্রভু বলি
তাঁহারে চিনিলে—
প্রাণ-মনসহ দেহ তাঁহারে সঁপিলে।
অনুগত দাসরূপে
তাঁর কৃপা পেলে।
জননী সীতারে উদ্ধারের কালে—
সর্বশক্তি নিয়োগ করিয়া
প্রভু রামচন্দ্রে তুমি
সাহায্য দানিলে।
লঙ্কাপুরী হতে জানকী মাতার
সন্ধান আনিতে চলিলে যখন—
"জয়রাম" মন্ত্র উচ্চারিয়া
এক লম্ফে উত্তাল সাগর
করিলে লঙ্ঘন!

জননী জানকী তব পাইয়া দর্শন—
পুত্রসম স্নেহে তোমা করেন গ্রহণ।
উদ্ধার হইয়া লঙ্কা হতে
রামচন্দ্র আর লক্ষ্মণের সাথে
জননী গেলেন অযোধ্যাতে।
তোমারেও লইলেন তাঁহাদের সাথে
পরম স্নেহেতে।
সেই দিন হতে রয়ে গেলে তুমি
তাঁহাদের সাথে—
অযোধ্যাপুরীতে।
সীতা-রাম যুগল মুরতি
স্থাপন করিয়া হৃদি-সিংহাসনে—
পূজিলে নিয়ত তুমি একনিষ্ঠ মনে,
একান্ত যতনে।
রামরূপ ধ্যান করি শয়নে স্বপনে—
রামময় হয়ে গেলে
দেহে মনে প্রাণে।
আজিও জগৎ-জন—
শ্রেষ্ঠ ভক্তবীর রূপে
নিত্য তোমা করিছে স্মরণ।

চন্দন

গভীর অরণ্য মাঝে শ্বাপদসঙ্কুল
সর্পকুল অধ্যুষিত ভূমে—
তোমার জনম।
হে তরু চন্দন।
ফুল-ফল-ছায়া দান নহে তব কাজ—
বিরাজিছ যেথা নাই
কোন জনবাস।
আছে শুধু হিংস্র ব্যাঘ্র-সিংহ হেন
পশুর আবাস।
জন্মিয়াছ একান্ত বিজনে
নিবিড় কাননে—
রহিয়াছ তপস্বীর প্রায়
আপনার ধ্যান ধারণায়।

সমস্ত জীবনব্যাপী চলিয়াছে তব
নীরব সাধনা—
দেবতার আরাধনা
লভিবারে তাঁর কৃপাকণা!
ধীরে ধীরে প্রস্তুত করিছ আপনারে—
আত্মত্যাগ মহাব্রতে ব্রতীর আকারে,
নিঃশেষে দানিতে আপনারে।
কবে আসিবে সে শুভযোগ
তার প্রতীক্ষায়
রহিয়াছ শবরীর প্রায়—
আপনারে নিবেদিতে
দেবতার পায়ে!
হে চন্দনতরু,
তুমি মোর গুরু—
শিখালে আমারে,
জীবন ভরিয়া তপস্যা করিয়া
দেবতাচরণে নিবেদন
করিতে নিজেরে---
সার্থক করিতে আপনারে।

ধূপ

সন্ধ্যাবেলা ঘরে ঘরে
আরতির শঙ্খ-ঘণ্টা
বেজে ওঠে ধীরে—
ধূপের সুবাস
ভরে দেয় আকাশ বাতাস।
সেই পুণ্যক্ষণে দেবতা স্মরণে
সুপবিত্র হয় দেহ মন--
অন্য চিন্তা পশে না তখন।
পূজার সকালে. সচন্দন পুষ্প বিল্বদলে—
দেবতারে পূজে ভক্তগণ
ধূপ দীপ জ্বালাইয়া
নৈবেদ্যের থালা সাজাইয়া,
পূজা করে ভক্তিভরে মিলিয়া সকলে—
মন্দিরে দেউলে!

ধূপ দেবতার তরে
নিঃশেষিয়া আপনারে
অগ্নির দহনে—
আপনার অন্তর-বিভব
হৃদয়-সৌরভ
উজার করিয়া দেয়
দেবতা চরণে!
ধূপের জীবন আত্মত্যাগ তরে—
অন্তরের সুবাস বিলাতে
অকুণ্ঠিত চিতে
আপনাকে করে নিবেদন।
ধন্য হয় ধূপের জীবন!

জীবন

জন্ম আর মৃত্যুর মাঝারে
যে-সময় তরে বাঁচে জীবগণ—
তাহাই জীবন।
এ জীবন কার কত দিন রবে
কিংবা কীরূপে কাটিবে—
তাহা কেহ নাহি জানে,
তাই তারে ভাগ্য বলি মানে।
শৈশব জীবন চিন্তামুক্ত সহজ সুন্দর—
তারপর ধীরে নানা জটিলতা আসি
ঘিরে জীবনেরে।
আশা-আকাঙ্ক্ষায় ভরা মানব জীবন
দুঃখ আর অশান্তির মাঝে
কাটে সর্বক্ষণ।
জীবন ভরিয়া সুখের সন্ধানে সবে ফিরে—
বুঝিতে চাহে না সুখ দুঃখ
একই সাথে রহিয়াছে
সংসার মাঝারে।
অবিমিশ্র দুঃখ-সুখ আসে না কখন—
সুখে-দুঃখে সমভাবে থাকিবে মিশ্রণ,
তাহাই জীবন!

বাসনার বশে জীবনের যত দুঃখ আসে—
সুখের বাসনা আনে জীবন যন্ত্রণা।
বাসনা নিবৃত্ত করি সংসারে নির্লিপ্ত হয়ে
থাকিতে যে পারে—
তার জীবনেতে শান্তি
আসে ধীরে ধীরে।
দুঃখ-সুখে মিলিত জীবন—
বিধাতার দান বলি করিতে গ্রহণ
পারে যেই জন,
শান্ত চিত্তে কাটে তার
সারাটা জীবন।
জীবনের নিয়ন্তা যে-জন
সেই বিধাতার 'পরে নির্ভর করিলে—
সংসারের সর্ব আবিলতা
দূরে যায় চলে।
বিধাতার শ্রেষ্ঠ দান মানবজীবন—
অন্য কোন জীব নাহি পারে
বিধাতারে করিতে চিন্তন।
জীবন ভরিয়া সুখ-দুঃখ অশান্তি-বেদনা
ভুগি অবশেষে—
জীবনের শেষে ভোগের বিরতি
যবে আসে,
সেইক্ষণ তার মন ফিরে—
বিধাতার তরে ব্যাকুলতা জাগে
হৃদয় মাঝারে।
এই ব্যাকুলতা যবে তীব্রতর হবে
তখন সে লইবে শরণ দেবের চরণ—
সার্থক করিবে তার
মানবজীবন।

জবা

রক্তবর্ণ জবা—
ফুটিয়াছে সবুজ পাতার কোলে
ধরিয়াছে অপরূপ শোভা।
সমস্ত বৎসর ভরি এই ফুল হয়—
ফুটিতে তাহার নাহি হয় প্রয়োজন
কোন বিশেষ সময়।
বিবিধ বরন আর বিভিন্ন প্রকার
জন্মে জবাফুল নাই হিসাব তাহার।
শ্বেত পীত লাল ও গোলাপী
বহুবর্ণ জবাফুল বাগানেতে দেখি।
এ ফুলের সমাদর দেবী শ্যামা মায়ের পূজাতে—
জননী রহেন তুষ্ট জবা কুসুমেতে।
রাঙাজবা শোভে মা'র রাতুল চরণে—
আনন্দে পূজেন তাঁরে যত ভক্তগণে।
পূজিবারে নানা দেব-দেবীর চরণ
সকল প্রকার ফুল নিত্য প্রয়োজন।
কিন্তু শ্যামা মায়ের পূজায়—
জবাফুল অবশ্যই প্রয়োজন তায়।
পুষ্পের ভিতর একমাত্র জবা
মা কালীর অতি প্রিয় ফুল।
মা কালীর চরণ পূজিতে
জন্ম তার এই ধরণীতে।
জবার জীবন ধন্য হয়
পূজা করি মায়ের চরণ।

ঘড়ি

টিক্ টিক্ টিক্—
চলে ঘড়ি হইয়া নির্ভীক।
সময়ের হিসাব রাখিতে
চলে হৃষ্ট চিতে।
সকাল হইতে শুরু হয় যে-চলার—
গভীর নিশার কালে
নাহি হয় বিরতি তাহার।

চলার বিরাম তার হবে না কখন—
শান্ত মনে চলিবে সে
যতক্ষণ রয়েছে জীবন।
থামিতে জানে না ঘড়ি কভু—
চলিতে হইবে অনিবার,
দিন-মাস-বৎসর ভরিয়া
হবে না বিরতি সে চলার।
জীবনেতে শুধু একবার
স্তব্ধ হবে তার প্রাণের স্পন্দন—
চলার বিরাম তার হবে সেইক্ষণ
আসিলে মরণ।
কবে কোন যুগে হয়েছে ঘড়ির আবিষ্কার—
কেবা রাখে হিসাব তাহার।
ঘড়ি ব্যবহার মানুষের জীবনেতে অতি প্রয়োজন—
ঘড়ি বিনা সংসারেতে চলা
কঠিন ভীষণ।
নিত্য-সঙ্গী ঘড়ি মানুষের জীবনেতে—
সময়ের মাপ জানা যায় ঘড়ি হতে।
প্রাচীন কালেতে সূর্যের আলোতে—
সময়ের হিসাব রাখার ছিল ব্যবহার।
কিন্তু আজ মানুষের প্রয়োজন হেরি—
দেশে দেশে প্রস্তুত হতেছে
শত শত ঘড়ি কত রকমারি!
ঘড়ির আদর মানুষের কাছে
চিরদিন আছে—
রবে তাহা সমভাবে চিরদিন,
ফুরাবে না তাহা কোনদিন।

গ্রাম

ছায়াভরা মায়াঘেরা বাংলার গ্রাম—
স্মরণে আকুল হয় প্রাণ,
মনে হয় গ্রাম মোর জননী সমান।
গ্রীষ্মে-শীতে-বাদলের দিনে—
গ্রামের জীবনে ফিরে পেতে চায় আজও মন,
ভুলিতে পারিনি সেই গ্রামের জীবন।

কৈশোর বেলায় ছিলাম যে গ্রাম-বাংলায়—
সে দিনের স্মৃতি টানে মনে নিতি,
পারি না ভুলিতে তারে হায়।
আকুল হইয়া প্রাণ আজও তারে
ফিরে পেতে চায়!
শহরের চঞ্চলতা প্রবেশ পায়নি সেথা
শান্তি আর নীরবতা আছে বিদ্যমান—
তাই বুঝি গ্রাম আজও টানে মোর প্রাণ।
সুশীতল গাছের ছায়ায়
ক্লান্ত পথিকেরা নিদ্রা যায়—
রাখাল ছেলেরা মাতি রয়েছে খেলায়,
সেই গ্রামে আর কভু দেখিব না হায়!
স্নিগ্ধ শান্ত সেই গ্রাম ছেড়ে
এসেছি শহরে বহু দূরে, চিরদিন তরে —
দেখিব না কভু আর সে গ্রামেরে।
তাই সে গ্রামের তরে কাঁদে প্রাণ মোর—
বাঁধিয়াছে গ্রাম মোরে দিয়ে মায়াডোর।
সে বাঁধন ছিঁড়িবে না আর কোনদিন—
রহিবে জীবন ভরি
প্রাণ মোর আছে যতদিন।
মায়াময় এ জগৎ জুড়ে—
মায়ার বাঁধনে বাঁধা আছি মোরা চিরদিন তরে,
ভুলিতে পারি না তাই মোর প্রিয়
এই গ্রামটিরে!

জানা-অজানা

সীমাহীন বিপুল এ বিশ্বের মাঝারে
যত যত জীব জন্মিয়াছে ধীরে ধীরে—
মানুষ জন্মেছে তার সকলের পরে।
বিধাতার সৃষ্ট সব জীবের ভিতরে
মানুষ সবার শ্রেষ্ঠ জানে আপনারে,
আসিয়াছে সকলের পরে।

জন্মলগ্ন হতে শুরু করে অতি ধীরে—
জানিতে হয়েছে তারে জীবনের প্রয়োজনে,
অগ্নি জ্বালাইতে অস্ত্র বানাইতে শিকার করিতে—
মাছ আর পাখি-পশুগণে।
তারপরে ক্রমে বাসগৃহ আর চাষবাস হতে শুরু করে—
জলজান-স্থলযান-আকাশযানেরে
জানিতে হইল তারে।
জগৎ মাঝারে যত মহাদেশ যত সাগর ও নদী-নদ—
সুউচ্চ বিশাল যত পাহাড় পর্বত,
জানিল সে সব কত শত।
আকাশেরে জানিবার তরে গ্রহ-উপগ্রহ মাঝে
চালাইয়া অভিযান জানিল অনেক—
তবু সে-জানার হইল না শেষ,
জানিল সে ব্রহ্মাণ্ড অশেষ।
অজানারে জানিবার তরে চিরদিন ধরে
চলেছে চলিবে অবিরাম অন্বেষণ—
শেষ নাহি হইবে কখনো
বহির্বিশ্বের মত অন্তর্জগতে জানিবার চেষ্টা তার
চলেছে সতত—
খ্রিস্ট-বুদ্ধ-নানকাদি যত মহাজন
অন্তর্জগৎ মাঝে করি অন্বেষণ,
লভেছেন আত্মজ্ঞান আত্মার দর্শন।
জানিয়া নিজেরা জানালেন তাঁরা জগতেরে—
যেই মহাশক্তি হতে এই মহাবিশ্বের সৃজন,
তিনিই আছেন প্রতি জীবের অন্তরে—
চৈতন্য আকারে অন্তরে-বাহিরে
মহাবিশ্ব জুড়ে।
সে অজানা মহাচৈতন্যেরে অনুভব করিবারে
নিয়ত চলেছে চেষ্টা যুগ যুগ ধরে মানব অন্তরে—
এই অন্বেষণ শেষ হবে না কখন,
চলেছে চলিবে আজীবন।

সাগর মেলা

পৌষের শেষদিনে সাগর মেলায়
মিলিত হয়েছে অগণিত তীর্থযাত্রীদল—
পুণ্য-স্নানের আশায়।
স্নান সারি ঋষি কপিলের মন্দিরেতে—
চলেছে সকলে দলে দলে
ভক্তিনত চিতে পূজা দিতে।
কত বর্ষ আগে এনেছিল ভগীরথ জননী গঙ্গারে
পিতৃপুরুষের উদ্ধারের তরে—
স্বর্গ হতে এই মর্ত্যভূমি 'পরে।
নারদ ঋষির স্তবগানে স্বর্গপুরে যবে নারায়ণ
হইলেন বিগলিত করুণায়,
সেইক্ষণ তাঁর চরণের বৃদ্ধাঙ্গুষ্ঠ
বিগলিত জাহ্নবী আকারে—
আসেন নামিয়া স্বর্গ হতে
ভীমবেগে মর্ত্যের মাটিতে।
জাহ্নবীর সেই বেগ ধারণ করার
শক্তি ছিল না কাহার—
নিরুপায় ভগীরথ নিলেন শরণ,
মহাদেবের চরণ।
স্তবে তুষ্ট মৌলীভূষণ মহাদেব
দাঁড়ালেন হিমাদ্রিশিখরে—
বিস্তারিয়া জটাজাল ধারণ করেন শিরে
জননী গঙ্গারে।
সে দিন হইতে ক্রমে—
পরিচিত হইলেন মহাদেব
"গঙ্গাধর" নামে।
জটাজাল হতে নামি ভূমে
আসিলেন জননী জাহ্নবী ভগীরথ সনে
কপিল-আশ্রমে।
পবিত্র জাহ্নবী-বারি স্পর্শ লভি
সগর রাজার পুত্রগণ—
লভিলেন নূতন জীবন।

তারপর হতে বৎসরে বৎসরে
এই পুণ্য মকরের সংক্রান্তি দিবসে—
গঙ্গা আর সাগরের মিলন বেলায়
স্নান করি পুণ্যলাভ করার আশায়
দেশ-দেশান্তর হতে শত শত ভক্তদল
আসে এই সাগর মেলায়।
মর্ত্যে নামি সাগরের সনে মিলনের আগে—
জননী জাহ্নবী আপনার পূত-স্পর্শ দানে
তীর্থরূপে সার্থক করেন
দেশব্যাপী কতিপয় স্থানে।
হরিদ্বার আর ত্রিবেণী-সঙ্গম আদি
যত তীর্থস্থানে—
পুণ্য-স্নান করি ভক্তগণে
আজিও দানেন সার্থকতা
আপন জীবনে।

জয়তু নেতাজী

(২৩শে জানুয়ারী, নেতাজীর জন্মদিন স্মরণে)

ভারতমাতার বীর সন্তান
নেতাজী সুভাষ তুমি—
আজি তব শুভ জন্মদিনের প্রভাতে
তোমারে নমি।
বাংলার বুকে জন্মিয়া তুমি
ধন্য করিলে এ-বঙ্গভূমি—
তব গৌরবে দেশবাসী মোরা
নিজেরে ধন্য মানি।
ভারতমাতার পরাধীনতার
শৃংখল ঘুচাইতে—
স্বদেশ ত্যজিয়া সুদুর বিদেশে
গেলে নির্ভীক চিতে।
দেশবাসী যাঁরা ছিলেন সে দেশে
তাঁহাদের লয়ে তুমি সে বিদেশে—
গঠন করিলে নির্ভীক বীর সৈনিকদল ধীরে-

বাহির হইতে যুদ্ধ করিয়া
বিতাড়িতে বিদেশীরে।
সফল করিতে মহৎ চেষ্টা
স্বাধীন করিতে আপন দেশটা—
নিজের জীবন তুচ্ছ মানিলে
বীর সৈনিক তুমি,
জীবন হইতে অধিক জানিলে
জননী জন্মভুমি!
বিধি তব প্রীতি সদয় হল না
মনের বাসনা পূরাতে পেলে না—
বিদেশী শাসকে পারিলে না সরাইতে,
আপনি সরিয়া গেলে চলি তুমি
বেদনামথিত চিতে!
বহুদিন পরে স্বাধীন হইল দেশ—
দেশবাসী তব পাইল না উদ্দেশ।
দুঃখিত চিতে জানিল তাহারা—
আজও আছ তুমি
হও নাই হারা,
কোন একদিন নিশ্চয়ই তোমা
পাইবে খুঁজিয়া তারা।
আজও তাই তব জন্মদিনেতে
শ্রদ্ধা জানায় একান্ত চিতে—
বিধাতারে স্মরে আকুলতা ভরে
তব মঙ্গল দিতে,
কোনদিন তারা পারিবে না হায়
তোমারে ভুলিয়া যেতে!
গেছ চলি দূরে স্বদেশ হইতে
রয়েছ সবার মনের নিভৃতে—
পূজিছে তোমারে অনুরাগ ভরে
স্মরণের মন্দিরে,
রয়েছ আজিও রবে চিরদিন
বাঙ্গালীর অন্তরে।

নিম

তিক্ত রসে পরিপূর্ণ যেই বৃক্ষ নিম,
ধরা মাঝে সেই কিন্তু গুণেতে অসীম।
তিক্ত পাতা তিক্ত ফল আর তিক্ত ডাল—
ভেষজ প্রস্তুত কালে প্রয়োজন তার তিক্ত ছাল।
দাঁতের মাজনে আর গায়ের সাবানে—
নিমরস দিয়া প্রস্তুত করেন ব্যবসায়ীগণে।
কাঁচা নিমডালে দাঁত অনেকে মাজেন—
পাতা আর ফুলে তিক্ত রন্ধন করেন।
সুপক্ক নিমের ফল পক্ষিগণে খায়—
ছায়া আর হাওয়া দিয়া প্রাণকে জুড়ায়।
নিমপাতা সহ কাঁচা হলুদ খাইলে—
রক্তদুষ্টি চুলকানি সব যায় চলে।
বহুবিধ উপকার হয় নিম হতে—
তাই নিমগাছ রাখে গৃহস্থ বাড়িতে।
পঞ্চবটী মাঝে এই বৃক্ষ অন্যতম—
জগৎ মাঝারে নিমবৃক্ষ অনুপম।

হারানো দিন

জীবনের শেষ প্রান্তে এসে
ফিরে দেখি পিছনের পানে—
ফেলে-আসা সেই সব
পুরাতন দিনে।
স্বামীর সংসারে প্রবেশের পরে
পাইলাম কন্যারূপে—
ভাগিনী "অমু"-রে
অতি স্নেহভরে এই শিশু-ভাগিনীরে
এনেছিল মোর স্বামী—
রেখেছিল সযতনে আপনার কাছে,
কন্যাসম স্নেহে পালনের আশে—
তিন বৎসর বয়সে।

সেই হতে এ ভাগিনী রহিয়াছে মামা সনে
মামার বাড়িতে—
আরও তিন মামাদের সাথে।
প্রথম যেদিন বধূরূপে আসি এ বাড়িতে
ছয় বৎসরের সেই ভাগিনী আমাকে—
মামী না বলিয়া 'মা' বলিয়া
লাগিল ডাকিতে।
অবাক হইয়া ভাবিয়াছি, পরে শুনিয়াছি,
মামার নির্দেশে—
ভাগিনী আমাকে 'মা' ডাকিছে।
বিধাতার এমনই বিচার—
মা হওয়ার আগে
মা হইতে হইল আমার।
সেই কাল হতে ভাগিনী অমু-কে
নিজ কন্যা বলি মানিলাম—
অন্তর মাঝারে রাখিলাম।
কন্যাও আমাকে নিজ মা হইতে
অধিক জানিল—
যথার্থ মায়ের মত গ্রহণ করিল।
বৎসর ঘুরিল আমার আপন সন্তান জন্মিল—
কন্যা সে শিশুরে অধীর আনন্দ ভরে
কোলেতে রাখিল।
মহানন্দে মেতে দিনে রাতে
ভাই ভাই ডাকিতে লাগিল।
কিন্তু সেই অফুরান আনন্দের দিন
ফুরাইয়া গেল একদিন—
স্বার্থময় এ জগতে নিঃস্বার্থ স্নেহেরে
সাধারণে বুঝিতে না পারে।
ভাগিনীর পিতা সহসা আসিয়া
এক দুপুর বেলায়—
ভাগিনীকে নিয়ে গেল জোর করে
নিজের বাসায়।
মনের ব্যথায় কাঁদিতে কাঁদিতে—
ভাগিনীকে যেতে হল চলে
নিজের বাড়িতে।

যাবার বেলায় বড় দুঃখে কেঁদে বলিল আমায়—
"মাগো, মামা যদি মোর বাবা হত
আমাকে তাহলে আজ এই বাড়ি ছাড়ি
যেতে নাহি হত।"
নির্বিকার পাষাণের প্রায়
স্তব্ধ হয়ে রহিলাম ঠায়।
মামাকে না-বলে—
মেয়ে নিয়ে বাবা গেল চলে।
মামা এসে সকলি শুনিল,
বুঝিতে পারিল—
কেন আজ এতদিন পরে
বাবা এসে নিয়ে গেল
নিজের মেয়েরে।
মামার আপন পুত্র জন্মেছে এবার
বোনের মেয়ের সমাদর
কে করিবে আর?
মনে হয় এ-ভাবনা হ'তে
~~বোনের~~ মেয়েকে মামার কাছে
দিল না থাকিতে—
কোন মতে।
মায়াময় এ জগতে—
হৃদয়ের সম্পর্ককে ছিন্ন করা
যায় না কিছুতে।
শিশুর অন্তরে যেই ব্যথার তুফান উঠিয়াছে—
সমব্যথী মামার সহিত আজ তাহা
মামীকেও নিতে হল ভাগ করি
সমভাবে একই সাথে।

কুয়া

আমাদের এই বাসগৃহের নির্মাণে
জলের কারণে—
কুয়া এক খনন করিতে হল
উঠানের কোণে।

সেইদিন হতে সব কাজে
কুয়ার এ জলে—
ব্যবহার করিতাম
আমরা সকলে।
শুধুমাত্র পানীয়ের তরে
রাস্তার ধারে—
চাপা-কলে যেতে হত
জল আনিবারে।
তারপর ধীরে
পৌর জলের কল একদিন
এসে গেল সকলের তরে—
রাস্তার ধারে।
পরম আদরে
আমরাও করেছি গ্রহণ
এই নূতন জলেরে।
এ জলের আগমন পরে
হইল কুয়ার অনাদর
ধীরে ধীরে।
আমাদের সেই প্রিয় কুয়া
রহিল পড়িয়া একাকী নির্জনে
উঠানের কোণে।
তারপরে আরও ধীরে—
উপকারী সেই মোদের কুয়ারে
ভুলিয়া গেলাম একেবারে।
বছর পাঁচেক আমাদের
কেটে গেল নূতন বাড়িতে—
তারপর একদিন শুনিলাম
আচম্বিতে,
নিষেধ হয়েছে কুয়া রাখা
শহরের সকল বাড়িতে।
বুঝিলাম মনে—
বুজাইয়া দিতে হবে এ কুয়ারে
অতি অল্পদিনে।
মাটী-কাটা লরির সহিত
ব্যবস্থা হইল—
দুই-তিন দিন মধ্যে
মাটি ঢালি আমাদের প্রিয় সেই কুয়া
বুজাইয়া দিল।

আজিও দেখিতে পাই
উঠানের কোণে—
শুধুমাত্র ইঁটে গাঁথা
সীমানা কুয়ার
রয়েছে পড়িয়া অযতনে।
মনে পড়ে আজও সেই নূতন কুয়ারে—
কত সমাদরে কেটে ছিল তারে।
আজ সে রয়েছে পড়ে নিঃসঙ্গ হেলায়—
বার্ধক্যে অচল অনাদৃত মানুষের প্রায়।
মানুষের জীবন কেবল
কর্ম্মময় যৌবনের জয়গানে ভরা—
অক্ষম যাহারা তাহাদের
সমভাবে গ্রহণ করার,
ভালবাসা দিয়া আপন করার—
এ জগতে নাই কেহ আর!
ইহাই কি বিধির বিচার?

বকুল গাছ

আমাদের ছয় বছরের পুরাতন এ বাড়িতে—
বাগানের দুই ধারে পাঁচিলের কাছে,
একই বয়সের দুই বকুলের গাছ রহিয়াছে।
চেহারায় উহাদের পার্থক্য ভীষণ—
দীর্ঘ-দেহী একগাছ খর্ব অন্যজন।
এ বিরাট পার্থক্যের সঠিক কারণ
বুঝিবারে পারিনি কখন করিয়া চিন্তন।
উহাদের জনমের ইতিহাস তাই
চেষ্টা করি করিতে বর্ণন।
অনুমান করিবারে সঠিক কারণ।
অশোকনগরে দাদার বাড়ির ধারে
রাস্তার পারে—
ছিল এক বহু পুরাতন বকুলের গাছ।
কোটরে কোটরে তার পাখি আর
গিরগিটিদের ছিল বাস।

আমরা কখনও গেলে অশোকনগরে—
কাটিত মোদের দুই তিন রাত
দাদা আর বৌদির ঘরে—
মহানন্দ ভরে।
বকুল গাছেরে জানিতাম মোরা বহুদিন ধরে—
দাদাদের এই বাড়ি তৈরির পরে।
বকুল গাছের আকর্ষণ মোর মনে ছিল সর্বক্ষণ—
ঝরা ফুল আর ফল যত
কুড়াইয়া আনিতাম করিয়া যতন।
চেষ্টা করিয়াছি বহুবার—
বকুলের চারা আনি আমাদের
বাগানের কোণে পুঁতিবার।
কিন্তু সেই সব চেষ্টা বিফল করিয়া
ঠাঁই-নড়া চারা সব শুকাইয়া
গিয়াছে মরিয়া।
মনের বেদনা মনে রাখিলাম চাপি সংগোপনে।
কিন্তু আশা শেষ না-হইয়া
রহি গেল মনের গহনে।
বর্ষার শেষে একবার গেলাম যখন—
চারা দেখি পুনরায় আনিলাম
করিয়া যতন।
সেই সঙ্গে কিছু পাকা ফল
আনিলাম হয়ে হৃষ্টমন।
এইবার ভাগ্য বুঝি প্রসন্ন হইল—
ক'খানি বকুল চারা
বাগানের মাটিতে জন্মিল।
ঠাঁই-নড়া করিবার সাহস হল না—
সব চেয়ে সতেজ চারাটি রাখি যথাস্থানে,
বাকী সব গাছগুলি একে একে তুলি
পুঁতিলাম সযতনে—
বাগানের ভিন্ন ভিন্ন স্থানে।
এবারেও একই রূপ হোল—
ঠাঁই-নড়া যত চারা একে একে
শুকাইয়া গেল।
কেবল একটি চারা কোনমতে
ধিকি ধিকি করি জীবনে বাঁচিল।

আজিও দেখিতে পাই এই গাছটিরে—
দীর্ঘ পাঁচ বৎসরের পরে,
শুধুমাত্র একহাত উঁচু হয়ে আছে
মাটির উপরে।
স্বস্থানে রহিয়াছিল যে-বকুল গাছ—
অবাক হইতে হয় দেখি তারে আজ।
দুই মানুষের মাথা ছাড়াইয়া
গেছে তার শির—
যেন দীর্ঘ ঋজু দেহধারী এক মহাবীর।
এ বিরাট পার্থক্যের কারণ না জানি—
ঠাঁই-নড়া বলি উহা মানি।
সত্য-মিথ্যা সঠিক না জানি।

কলির নববেদ

নবীন এ সহস্রাব্দ নিয়ে এল
অভিনব এক বেদগ্রন্থ
"তত্ত্বালোক" নামে—
স্রষ্টার মুখের তত্ত্ববাণী
প্রচারিতে বিশ্ববাসী জনে।
এ মহাগ্রন্থের উদ্বোধন দিনে—
ভগবৎ-অনুরাগী আর পণ্ডিত সজ্জনে,
আহূত হইয়া সবে শুনিলেন
শ্রীমুখের অপূর্ব ভাষণ—
অশ্রুতপূর্ব অনুপম।
বুঝিলেন মর্ম যাঁরা এই ভাষণের
স্তম্ভিত বিস্ময়ে মানিলেন,
এই মহত্তত্ত্ব প্রচারের মহাক্ষণ
উপস্থিত হয়েছে এখন।
এই মহাগ্রন্থ "তত্ত্বালোক" নাম যার—
একমাত্র বেদ ভিন্ন অন্য কোন গ্রন্থ সনে
হইবে না তুলনা তাহার।
ঘনঘোর কলির তমসা বিনাশিতে
জগৎ-জনের মোহনিদ্রা ছুটাইতে,
জগৎ-তারণ হরি আসিলেন অবতরি
"শ্রীশ্রীবাবাঠাকুর" নাম ধরি-

স্বরূপে আবরি আপনার,
করুণার মূর্ত অবতার।
এই "তত্ত্বালোক" নহে আপামর জনগণ তরে—
তত্ত্ব অনুভব করিবার ব্যাকুলতা
আজও জাগিয়া ওঠেনি
যাদের অন্তরে।
এই নববেদ মহাগ্রন্থ লভিয়াছে নবজন্ম
মুষ্টিমেয় কতিপয় মানবের তরে।
যাঁহারা আজিকে মহত্তত্ত্বে অন্বেষিছে
ব্যাকুলতা ভরে—
আপন অন্তরলোকে দিশাহারা হয়ে
জানিতে তাঁহারে।
ব্যাকুল হইয়া যাঁরা পথভ্রান্ত পথিকের প্রায়—
দিকে দিকে ভ্রমিয়া বেড়ায়,
ভগবৎ কৃপা নামি আসে ধীরে
পথ নির্দেশের তরে—
তাঁহাদের 'পরে।
তাই আজি জানি—
শ্রীশ্রীবাবাঠাকুর শ্রীমুখ-নিঃসৃত
এই মহাগ্রন্থ প্রকাশের ক্ষণ
সমাগত হয়েছে এখন।
যাঁহাদের তরে হল ইহার সৃজন—
লভিবে তাঁহারা ইহা হতে
তত্ত্বরূপ খনির সন্ধান অনুপম।
সার্থক হইবে তাঁহাদের
মানব জনম।
ভগবৎ কৃপা আসে কার তরে কোথা হতে—
সাধারণে পারে না বুঝিতে।
আমি অতি সাধারণ ক্ষুদ্রবুদ্ধি অভাজন
দুঃসাহসে করিয়া নির্ভর
রচিলাম এই কাব্যখানি
নিবেদিত অন্তরের
শ্রদ্ধাঞ্জলি মোর।

দিদি

শিলং পাহাড়ে দিদির বাড়িতে
যবে গেছি বেড়াইতে—
দিদি হতে পেয়েছি অপূর্ব উপহার—
পাঁচখণ্ড "কথামৃত"-রূপ
এক অমৃত ভান্ডার।
নাহি জানি তুলনা তাহার।
সংসারের ঘাত-প্রতিঘাতে
অবিরত জর্জরিত দুঃখী মানবের তরে
যে অমৃতরাশি সঞ্চিত রয়েছে
এই অমৃত ভাণ্ডারে,
সন্ধান তাহার দিয়ে দিদি আমাদের
রেখেছেন চিরঋণী করে।
দিদির সে ভান্ডার হইতে রাশি রাশি
অমৃতের কণার পরশে
সংসারের যত ব্যথা জীবন যন্ত্রণা
সহিতে পেরেছি অনায়াসে।
জেনেছি এ মায়ার সংসারে নরজন্ম লভিয়াছি
ভগবানে জানিবার তরে।
শুধু নিজ আত্মীয়-স্বজন আর
সংসার লইয়া ব্যস্ত থাকিবারে—
হয় না মানব জন্ম জগত মাঝারে।
ইতর জীবন যোগ্য নহে ভগবানে করিতে চিন্তন।
চিন্তাশক্তি একমাত্র মানুষের ধন।
এ অমূল্য মানব জনম পেয়ে
ভুলে থাকি যদি ভগবানে—
জন্মে-জন্মান্তরে জীবনযন্ত্রণা ভোগ করে
পুনরায় যেতে হবে ফিরে
ইতর জীবনে।
জীবনের মহাজ্ঞান উপদেশ সংসারীর তরে—
পেয়েছি আমরা শুধু "কথামৃত" পড়ে।
দিদি হতে এই উপহার না পাইলে
আজীবন ভগবানে থাকিতাম ভুলে।
সংসার জীবনে একহাত রাখি ভগবানের চরণে—
অন্য হাতে সংসার করিতে হবে
অতি সাবধানে।

এই সার কথা "কথামৃত" পাঠে না জানিলে
পুড়িয়া মরিতে হত সংসার-অনলে।
যাঁহার স্নেহের দান
এ পুস্তকখানি—
তাঁহারে ভুলিতে কভু
পারিব না আমি!
আজীবন দিদি মোর
থাকিবে স্মরণে,
তাঁহার মঙ্গল তরে
প্রার্থনা জানাই ভগবানে।

বইমেলা

বইমেলা বইমেলা—
মহানগরীর বুকে শুরু হোল
এই এক নবতর খেলা।
ময়দান প্রাঙ্গণে যত জনমেলা—
সকলের মুখে এক কথা,
বইমেলা।
প্রতি বৎসর শীতের সময়
শুরু হয় এই মহামেলা—
যত লোক আছে এ নগরে
সকলেই ছুটাছুটি করে
মেলা হতে বই কিনিবারে।
যত প্রকাশক আর বিক্রেতা সব
সকলে তাহারা ব্যস্ত হয়ে ফিরে—
আপন আপন বই দিয়ে
নিজ নিজ স্টল সাজাবারে।
শত শত বইয়ের দোকান—
এই মহানগরীতে বিদ্যমান।
কিন্তু মেলা হতে কেনা বই
ভিন্নতর স্বাদ করে দান।
খেয়ালী এ নগরীর বুকে—
মেলা হতে বই কেনে
আপনার সুখে,
খেয়ালী মনের যত লোকে।

ছাত্র-ছাত্রী লেখক-শিক্ষক
আর পাঠিকা-পাঠক—
ব্যস্ত হয়ে ছোটে সবে
মেলা দেখিবারে।
দেখিবার পরে মহানন্দে
বই কিনি ফিরে।
প্রতি বৎসর ময়দান ওঠে ভরে
মেলা-মেলা খেলা খেলিবারে।
বইমেলা, কৃষিমেলা, শিল্পমেলা
গাড়িমেলা আরও আছে কত—
কুকুরের মেলা আর
ফুলমেলা যত।
ধন্য মানি এই মহানগরীর
মহামেলা—
বিচিত্র রকম যত খেয়ালী মনের
মানুষ লইয়া রচিয়া চলেছে
এই মহানগরীর বুকে
নিত্য নব খেলা।

টেলিফোন

ক্রিং ক্রিং ক্রিং
বেজে ওঠে টেলিফোন জোরে—
সময় কি অসময় হিসাব না-করে।
অতি ভোরে অথবা দুপুরে কিংবা রাতে
সুপ্তিমগ্ন বাড়ির লোকেরে
এই বিচিত্র সংকেত ধ্বনি
বিচলিত করে।
যখন এ বার্তাবাহী তারযন্ত্র
সুখবর বহি আনে গৃহবাসী কানে—
আনন্দ জাগিয়া ওঠে সকলের প্রাণে।
কিন্তু যবে কোন দুঃসংবাদ আসে
এই তারের মাধ্যমে—
বেদনার অশ্রু দেখা দেয়
সকলের নয়নের কোণে।

আনন্দ-বেদনা এই দ্বিবিধ চেতনা
জাগাইয়া সবার অন্তরে—
বার্তাবাহী এই যন্ত্র
বেজে ওঠে জোরে।
এই যন্ত্র রহিয়াছে যাদের বাড়িতে—
তাহাদের আর চিঠি
হয় না লিখিতে।
দেশে ও বিদেশে—
যত আত্মীয়-স্বজন রহিয়াছে,
টেলিফোন সকলের সাথে
যোগাযোগ করিয়া দিতেছে।
অভিনব এই তারযন্ত্র আবিষ্কার
পৃথিবীর সব স্থানে
করিয়া দিয়াছে একাকার!
দূর আর দূর রহে নাই—
নিকট হইয়া গেছে
এবে সব ঠাঁই!
সব দেশে কাছে নিয়ে এসে
বিশ্বের দূরত্ব ঘুচিয়েছে।
অনুপম এ তারযন্ত্রের উপকার—
অর্থমূল্যে যার
হয় না বিচার!
ধন্য মানি সেই লোকে—
যিনি করেছেন আবিষ্কার
এই যন্ত্রটিকে।
অন্তরের সীমাহীন কৃতজ্ঞতা
জানাই তাঁহাকে।

পৃথিবী

পৃথিবী যে গোলাকার—
কীরূপে হইল আবিষ্কার?
এ চেতনা কার মনে
জেগেছিল সবার প্রথমে?

ধন্য মানি সেই নাবিকের অপূর্ব চিন্তারে—
সুদূর সাগরে জাহাজের মাস্তুল দেখিয়া
জন্মেছিল এ ধারণা যাহার অন্তরে।
তারপর ধীরে ধীরে বহু বৎসরের পরে—
কলম্বাস হেন দুর্ধর্ষ নাবিকগণ
জেনেছিল সাগরের পারে আছে
আরও মহাদেশ নূতন নূতন!
আরও কত বৎসরের পরে পণ্য বেচাকেনা তরে—
ব্যবসায়ী যত দেশে দেশে,
দুঃসাহসী নাবিকগণের আবিষ্কৃত
নব নব জলপথে—
পণ্য লয়ে লাগিল চলিতে।
ক্রমে ক্রমে গেল জানা—
এই পৃথিবীর মাঝে রহিয়াছে
আরও মহাদেশ সম্পূর্ণ অজানা!
আরও আছে বহু অজানা সাগর নদী-নদ,
আছে কত শত পাহাড়-পর্বত!
মানুষের জানার সীমানা—
অতি ক্ষুদ্র, এই পৃথিবীর অজানা অংশের
সাথে করিলে তুলনা!
আরও বহু বৎসরের পরে—
আকাশযানের আবিষ্কারে
জানিল মানুষ পৃথিবীরে
আরও ভাল করে,
আকাশ হইতে দেখিবার পরে।
পৃথিবীর স্বরূপ জানার চেষ্টা
চলেছে নিয়ত—
নানা জনে নানা ভাবে
এই চেষ্টা করিছে সতত।
আজ তাই জেনেছে মানুষ—
পৃথিবীর অভ্যন্তরে যে-আগুন রহিয়াছে
আজও তাহা আছে প্রজ্জ্বলিত।
সূর্যেরে করিছে প্রদক্ষিণ
পৃথিবী নিয়ত—
যার ফলে ফিরে আসে বৎসরে
বৎসরে ঋতু যত।

পৃথিবীরে ঘিরি রহিয়াছে
চতুর্দিকে যে-বায়ুমণ্ডল—
আর এই পৃথিবীর অভ্যন্তরে
আছে যেই মহা-আকর্ষণ শক্তি,
এ দু'য়েরে নিত্য অনুভব
করিছে মানব।
অজানারে জানার সাধনা—
করিয়া চলেছে লোক চিরদিন ধরে
হয়ে একমনা।
এ চেষ্টার শুরু হইয়াছে
সভ্যতার উষাকাল হতে অবিরাম—
আজিও যাহার ঘটেনি বিরাম।
পৃথিবী বাঁচিয়া রবে যতদিন ধরে—
মানব মনের অন্বেষণ-স্পৃহা
ফুরাবে না কোনদিন তরে।

মানুষ

পৃথিবীতে যত জীব লভেছে জনম
মানুষ তাদের অন্যতম।
সকল জীবের সৃষ্টি হইবার পরে—
মানুষ এসেছে এই ধরণী মাঝারে।
বিধাতা গড়েছে মানুষেরে
অন্য সব জীব হতে স্বতন্ত্র আকারে।
প্রাণ আছে সকল জীবের—
কিন্তু চিন্তাশক্তি রহিয়াছে
শুধু মানুষের।
সামান্য জীবেরা বাহির বিশ্বেরে মাত্র জানে—
কিন্তু চিন্তাশক্তি মানুষেরে চিনাইয়া দেয়
অন্তর-জীবনে।
বিপুল বিস্তার এই চিন্তারাজ্যে প্রবেশের অধিকার
একমাত্র মানুষের আছে—
এ কারণে অন্য জীব যত
নিকৃষ্ট বলিয়া গণ্য হয়
মানুষের কাছে।

অতুল এ চিন্তাশক্তি দিয়ে
মানুষ জেনেছে আপন জীবনে—
আরও জেনেছে সে ভগবানে।
সৃষ্টির নিয়ন্তা ভগবান—
মানুষের হৃদয়-মাঝারে বিদ্যমান।
এ অপূর্ব অনুভূতি ঘটেছে তাহার
একমাত্র চিন্তাশক্তি কারণ উহার।
শুধুমাত্র ভগবানে জানিবার তরে—
দুর্লভ মানব জন্ম হয়েছে সংসারে।
সার্থক করিতে এই মনুষ্য জনম—
জীবন কাটাতে হবে
অন্তর-মাঝারে করি ঈশ্বর চিন্তন।
গৃহী কিংবা সন্ন্যাসীর তরে—
একই বিধান রহিয়াছে জগৎ-মাঝারে।
আত্মচিন্তা আত্ম-অন্বেষণ
করিয়া যাইতে হবে ভরিয়া জীবন।
এই জন্মে কিংবা জন্মান্তরে
আত্মার সাক্ষাৎ না-হইলে—
ব্যর্থ হবে মানব জনম।

টক ঢেঁড়স

বাগানের ছোট ছোট গাছগুলি ভরে
ফলিয়াছে লাল টক ফল—
হরিৎ বরণ পাতার মাঝারে।
দেখিতে অপূর্ব শোভা
অতিশয় মনোলোভা—
সবুজ রয়েছে লালে ঘিরে
পাতার আকারে চারিধারে।
এই ফল করিয়া চয়ন
চিনি সহযোগে হয়
করিতে রন্ধন।
সুগাঢ় লোহিত এই চাট্‌নীর রঙ—
অপূর্ব সুস্বাদে তার
ভরে ওঠে মন।

টক টেঁড়সের বীজ হতে
বাগানেতে চারা ওঠে ভরে—
সেই গাছ বেঁচে থাকে
বহুদিন ধরে।
ফুল-ফল হয় অবিরত
বৎসরে বৎসরে।
এ কারণে করিয়া যতন
বাগান ভরিয়া করিয়াছি
টক টেঁড়স রোপন।
বর্ণে-গন্ধে-রসনাবিলাসে
অপূর্ব এ চাট্‌নীর স্বাদে
যবে প্রাণ ভাসে,
সেইক্ষণ—
যিনি মোরে দিয়াছেন এ অপূর্ব ধন,
সেই বিশ্বপাতার চরণ
করিয়া স্মরণ
কৃতজ্ঞতা জাগে মোর প্রাণে
অনুক্ষণ।

মা ও ছেলে

মা আর ছেলের মতন
এমন সম্পর্ক এ জগতে
হয় না কখন।
স্বার্থগন্ধহীন এই স্নেহের বন্ধন
করিয়াছে উভয়েরে
একান্ত আপন।
গাভীগণ আপনার বৎসের লাগিয়া
ব্যাকুল হইয়া—
রক্ষা করে তারে
হিংস্র শ্বাপদের মুখ হতে,
আপনার জীবন ভুলিয়া।
কচ্ছপ-কুম্ভীর সব মায়েদের মন—
পড়ে থাকে অনুক্ষণ
নদী-বালুচরে
আপন আপন ডিমের উপরে।

তেমনি মায়ের মন সন্তানের তরে
ব্যাকুল হইয়া রহে নিশিদিন ধরে।
সন্তানের তরে জননীর হৃদয়-মাঝার—
কত স্নেহ রহিয়াছে
পরিমাপ হয় না তাহার।
সাগরের তল মাপা যদি বা সম্ভবে—
জননী-হৃদয়তল কখনই
মাপা নাহি যাবে!
ব্যাঘ্র-সিংহ আদি যত হিংস্র পশুগণ
আপন শাবক লাগি মমতা তাদের
মানুষ হইতে নহে কম।
সন্তানের যত অপরাধ জ্ঞানে বা অজ্ঞানে—
জননী করেন ক্ষমা দ্বিধাহীন মনে।
জীবনের শ্রেষ্ঠ বন্ধু জননী সতত—
নাহি কেহ এ জগতে জননীর মত।
মাতৃহারা সন্তানের হৃদয় বেদনা
কী গভীর অন্যে তাহা বুঝিতে পারে না।
ভগবান হতে শ্রেষ্ঠ বন্ধু আর নাই—
সংসার মাঝারে ভগবান রূপে
মোরা জননীরে পাই।

নারিকেল

সুস্বাদু যতেক ফল রহিয়াছে
জগৎ মাঝার—
নারিকেল তুল্য কোন ফল নাহি আর।
সুমিষ্ট পানীয় আর সুস্বাদু খাবার—
একই সঙ্গে আছে এই
ফলের মাঝার।
একমাত্র এই ফল জগৎ-ভিতরে—
ক্ষুধা-তৃষ্ণা একই সঙ্গে
নিবারিতে পারে।
সাগরের কূলে আর সমতলে
করিয়া যতন—
বাগান ভরিয়া হয় ইহার রোপন।

এ ফলের সমাদর সব দেশে দেশে—
সাগর পারের দেশ হতে
চলি যায় ভিন্ন দেশে।
নারিকেল গাছ আর নারিকেল পাতা—
বহুতর প্রয়োজন মিটায় সর্বথা।
গাছ-পাতা আর নারিকেল-ছাল যত
জ্বালানি আকারে ব্যবহার
হইছে সতত।
পাকা নারিকেল ফল খাইবার পরে—
কঠিন তাহার খোসা হুঁকা তৈয়ারীর তরে
ব্যবহার করে।
পৃথিবীর বিভিন্ন প্রদেশে—
নারিকেল চাষ আর তার
ব্যবহার আছে।
নারিকেল বিধাতার অপূর্ব সৃজন—
জগৎ-জনের প্রতি তাঁর করুণার
অপরূপ এক নিদর্শন!

রেলগাড়ি

ঝিক ঝিক ঝিক—
রেলগাড়ি চলিয়াছে
কাঁপাইয়া দিক।
সুতীক্ষ্ণ বাঁশীর স্বরে চমকিয়া সকলেরে
চলেছে নির্ভীক।
অপরূপ এই গাড়ি
কি বাহার মনোহারী—
দূর-দূরান্তর সব দেশে,
নিয়ে যায় ধনে-জনে চক্ষের নিমেষে!
ধন্য মানি সেই জনে—
এঞ্জিনের চিন্তা যাঁর
প্রথম জাগিয়াছিল মনে।
জেম্‌স্ ওয়াট্ নামে কেবা সেইজন—
প্রথম এঞ্জিন যিনি করেন সৃজন।

সুবিস্তীর্ণ ভূখণ্ড ব্যাপিয়া
যত দেশ মহাদেশ—
রেলগাড়ি আবিষ্কারে দূরত্ব তাদের
হয়েছে নিঃশেষ।
দূরদেশ আজ আর দূর রহে নাই—
নিকট হইয়া গেছে
এবে সব ঠাঁই।
মানুষের জীবনের প্রয়োজনে—
নব নব আবিষ্কার পৃথিবীর বুকে
হইতেছে দিনে দিনে।
ছোট বড় বহুতর কত শত গাড়ি
অপরূপ কত না জাহাজ রকমারি।
যত দিন যাবে—
মানুষের চিন্তার জগৎ
বিস্তার লভিবে।
তাহা হতে হইবে সৃজন—
জগৎ ও জীবনের যত প্রয়োজন।
বিচিত্র মানব মন—
বিধাতার অনন্য সৃজন!
মানুষ হইতে শ্রেষ্ঠ নাহি এ ধরায়
কোন জন!

উড়ো জাহাজ

আকাশে ওড়ার চিন্তা মানুষের মনে
জেগেছে প্রথমে—
পক্ষী দরশনে।
শোনা যায় এক আজব কাহিনী—
সত্য কিংবা মিথ্যা নাহি জানি।
কোন এক পিতা-পুত্র মিলি—
সংগ্রহ করিয়া বহু পাখির পালক
প্রস্তুত করিল ডানা—
মোম দিয়া জুড়ি সেইগুলি।

সে-ডানা বাঁধিয়া হাতে
উড়েছিল আকাশেতে—
কিন্তু শেষে সূর্যের উত্তাপে মোম গলে,
পিতা-পুত্র ডুবে গেল সাগরের জলে!
পুষ্পক রথের কথা আছে রামায়ণে—
সেই রথে লঙ্কা হতে আকাশের পথে
ফিরেছেন রাম সীতা সনে।
বহুদিন বহুবর্ষ হতে—
মানুষ করিছে বহুতর চিন্তা-চেষ্টা
আকাশে উড়িতে।
কিন্তু কোনদিন পারেনি মানুষ
সফল হইতে!
গ্যাস কিংবা তপ্তবায়ু বেলুনেতে ভরি বারংবার—
আকাশে ওড়ার স্বপ্ন কিছুটা সফল
হয়েছিল তার।
আরও বহু বৎসরের পরে ধীরে ধীরে—
গতিবেগ করি ব্যবহার
যন্ত্রেরে আকাশে ওড়াবার
আপ্রাণ সাধনা—
হয়েছিল সফল তাহার।
বর্তমান প্রজন্মের মানুষ যাহারা
ভাবিতে পারে না তারা—
কী অসীম ধৈর্য লয়ে চেষ্টা
চলেছিল মানুষের,
আকাশ জয়ের!
আজ শুধু অর্থ-বিনিময়ে—
আকাশে বেড়ায় লোক
আনন্দিত হয়ে!
আকাশেরে করি জয় মানুষ এখন—
গ্রহ-উপগ্রহ জয় করিবারে
করিছে চিন্তন!
মানব মনের এই অন্বেষণ-তৃষা
শেষ হবে না কখন!

পঞ্জিকা

পঞ্জিকার সৃষ্টি কবে
হয়েছিল ভবে—
কেবা তাহা কবে?
জন্মলগ্ন হতে শুরু করে
জানি মোরা এই পঞ্জিকারে।
ভাবী নববর্ষের সূচনা করিয়া গণনা—
জ্যোতিষী সকলে
পঞ্জিকারে রূপ দেন
বর্ষ শেষ হলে।
অনাগত নবীন বৎসর ভরি যতেক ঘটনা
ঘটিবার সম্ভাবনা—
পঞ্জিকা হইতে পাই
তার সঠিক ধারণা।
জানা যায় পুরাণ হইতে—
ভগবতী 'বৎসর শুরুতে
জিজ্ঞাসেন মহাদেবে,
নববৎসরের ফলাফল
কীরূপ হইবে?
ত্রিকালজ্ঞ মহাদেব জানান তাঁহারে—
নবাগত বৎসরের ফলাফল
ধীরে ধীরে।
মহাদেব-বর্ণিত সে বৎসরের যত ফলাফল—
গণনা করিয়া জানি লন
জ্যোতিষী সকল।
দিন-মাস-বৎসর হইতে শুরু করি—
গ্রহ-নক্ষত্রের অধিষ্ঠান করিয়া গণনা,
পঞ্জিকা মাধ্যমে জানান জ্যোতিষীগণ—
কোন গ্রহ করিবে কখন কাহার উপরে
শুভ কিংবা অশুভ সূচনা।
নূতন বৎসরে ক্ষুদ্র ও বৃহৎ বহুতর
ভাবী ঘটনার সংঘটন বার্তা—
রহিয়াছে এই পঞ্জিকা-ভিতর।
বৎসর ভরিয়া পূজা ও বিবাহ আদি
মাঙ্গলিক অনুষ্ঠান যত মানব জীবনে—

তাহার সঠিক দিন ক্ষণ
পঞ্জিকা হইতে সবে জানে।
সংসারী যতেক লোক রয়েছে জগতে—
পঞ্জিকা ব্যতীত তারা
পারে না চলিতে।
পঞ্জিকার সৃষ্টি জনগণের কল্যাণে—
পঞ্জিকারে তাই কৃতজ্ঞতা
জানাই মনে প্রাণে!

সাগর জয়

মানুষ আপন বুদ্ধি বলে—
দুর্লঙ্ঘ্য সাগরে জয় করিয়াছে
অবহেলে।
সুপ্রাচীন কালে—
কলাগাছ কাটি ভেলা বানাইয়া
খাল-বিল পারাপার
করিত সকলে।
ক্রমে ক্রমে শুষ্ক বাঁশ আর কাঠ যত—
ভেলা তৈয়ারীর কাজে
হল ব্যবহৃত।
আরও পরে কাঠ চিরি ডিঙ্গি নৌকা
প্রস্তুত করার নূতন প্রথার
হল আবিষ্কার।
প্রবল ঝড়ের মুখে ডিঙ্গি নৌকা যত—
মোচার খোলার মত ডুবি
আরোহীর প্রাণনাশ হত।
ঝড়-ঝঞ্ঝা মাঝে জলপথ ব্যবহার
হইত না সুসাধ্য কাহার।
ঝড়ের সহিত যুঝিবার তরে—
বৃহৎ-আকার নৌকা যত
প্রস্তুত হইল ধীরে ধীরে।
সেই সব নৌকাতে পাল খাটাইয়া
বায়ুর সহায়ে তার গতি বাড়াইয়া—
জলযানে ক্রমোন্নতি হইতে লাগিল তারপরে।

আরও বহুদিন গত হলে—
উত্তপ্ত বাষ্পেরে করি ব্যবহার
জলপথে চালাইল পোত
কত অভিনব বিপুল আকার।
অবিরাম নব নব চিন্তার প্রভাবে—
আজিকার যত সব বিশাল আকার
জলযান শত শত
হতেছে তৈয়ার।
অতল সাগরতলে সন্ধান লইতে—
ডুবো জাহাজের সৃষ্টি
হয়েছে জগতে।
মানুষের চিন্তা-জগতের যত
হতেছে প্রসার—
বিশ্বের মহান সৃষ্টি সব
হইতেছে নিত্য আবিষ্কার।
বিধাতা গড়িয়াছেন এই মানুষেরে—
জগৎ-মাঝারে যত প্রাণী
সবার উপরে।

বিশ্বাসের জয়

জয় জয় জয় বিশ্বাসের জয়—
বিশ্বাসী মনেতে কভু
জাগে না সংশয়।
প্রবল বিশ্বাসে রামনামে করিয়া নির্ভর—
পেরেছিল হনুমান এক লম্ফে
লঙ্ঘিতে সাগর।
মাতৃবাক্যে বিশ্বাস করিয়া বালক জটিল
বনপথে ভয় নিবারিতে ডেকেছিল
শ্রীমধুসূদন দাদা বলে—
তার সেই প্রবল বিশ্বাসে
শ্রীহরি আপনি দেখা দিলে।
সন্ন্যাসী-ঠাকুর বাক্যে বিশ্বাস করিয়া—
ভক্ত ধনা নিষ্ঠাভরে নুড়ি-পূজা করি,
পেল দরশন সেই নুড়ির মাঝারে
ভকত-বৎসল শ্রীহরিরে।

ভক্তশ্রেষ্ঠ প্রহ্লাদের অপূর্ব বিশ্বাসে—
পাষাণ স্তম্ভের মধ্য হতে
আসিলেন বাহিরিয়া নরসিংহ-মূর্তি ধরি
ভকতের হরি।
শ্রীরামকৃষ্ণের অনুপম বিশ্বাসের বলে—
পাষাণ বিগ্রহ মাঝে হয়েছিল
চিন্ময়ী দেবীর জাগরণ,
ভক্তেরে দানিয়া কৃপা
জননী দিলেন দরশন।
গুরু রামকৃষ্ণে নররূপী নারায়ণ মানি—
দেশান্তরে গিয়া শ্রীনরেন
তাঁর মহাবাণী প্রচারিয়া,
বিশ্বজয়ী হয়ে ফিরিয়া আসেন।
সুখ-দুঃখ সমভাবে বিধাতার দান—
এই কথা বিশ্বাস যে করে,
সংসারের কোন কষ্ট
বিচলিত করে না তাহারে।
বিশ্বাস অমূল্য ধন জগৎ মাঝারে—
এ জগতে কিছু নাই বিশ্বাস-উপরে।

সৃষ্টিকর্তা

বিপুল এ মহাবিশ্ব যাঁহার রচনা—
জগৎ-জনেরা নিত্য করিছে তাঁহার
চরণ বন্দনা।
চেতনার রূপে তিনি আছেন এ ব্রহ্মাণ্ড ব্যাপিয়া—
প্রকাশিছে তাঁহারই চেতনা
সৃষ্ট জীবগণ মাঝে পৃথিবী জুড়িয়া।
তাঁহারে জানিতে মায়ামুগ্ধ জীবগণ
করিছে প্রয়াস অনুক্ষণ।
মায়াধীশ সৃষ্টিকর্তা যিনি—
সৃষ্ট জীবগণে মায়াধীন করি
রেখেছেন তিনি
স্রষ্টার মায়ার আবরণে—
সৃষ্ট জীব জানিতে পারে না
ভগবানে।

লীলাময় তিনি—
এই মহাবিশ্বে তাঁর লীলা প্রকাশিয়া,
স্রষ্টা হয়ে সৃষ্ট জীব সনে
রয়েছেন লীলায় মাতিয়া।
মায়া-আবরণ ঘুচাইয়া দিলে—
জীবগণ আপনার স্বরূপ জানিলে,
স্রষ্টার এ অপরূপ লীলাখেলা
স্তব্ধ হয়ে যাবে সেই কালে।
বিশ্বস্রষ্টা নিজে তিনি শিশুর মতন—
মাতিয়া থাকেন সর্বক্ষণ
লীলায় আপন।
ভাঙ্গা-গড়া এই তাঁর খেলা
সৃষ্টি আর ধ্বংসের আকারে—
সারাবেলা।
অন্তহীন এই মহা লীলাখেলা
চলেছে তাঁহার—
যুগ-যুগান্তরে বহি,
অন্ত কোথা তার?

পশুশালা

সুসভ্য মানবগণ করিয়াছে এক
বিচিত্র সৃজন—
বন্য পশু-পক্ষিগণে বন হতে ধরে এনে
রাখিয়াছে খাঁচা-মাঝে
করিয়া যতন।
বিস্তৃত ভূখণ্ড জুড়ি করিয়াছে রকমারি
খাঁচা, গুহা, বন আর গৃহ আদি
মনের মতন।
সুবিশাল ঝিল আর খাল—
রহিয়াছে সেই পশুশালার ভিতরে,
জলচর প্রাণীদের বসবাস তরে।
তৃণভোজী নিরীহ প্রাণীর সনে
রাখা হইয়াছে ভিন্ন ভিন্ন স্থানে—
হিংস্র প্রাণীগণে।

সর্প হেন হিংস্র সরীসৃপ রহিয়াছে
কাচের আধারে—
মানুষের দর্শনের তরে।
হস্তী ও জিরাফ আর উটের মতন
বিশাল প্রাণীর সনে—
রহিয়াছে ক্ষুদ্রকায় বানর, ইঁদুর
গাছে আর গর্তেতে প্রচুর।
উটপাখি আর ময়ূর হইতে শুরু করি
সাদা কাক আর যত পাখি রকমারি—
অনায়াসে দেখা যায়
প্রবেশ করিয়া এই পশুর শালায়।
দেশের সরকার করিতেছে এই পশুশালার রক্ষণ—
তার কর্মচারীগণ নিয়মিত রূপে
করিতেছে পশুশালার যতন।
সকল সুসভ্য দেশে—
এইরূপ পশুশালা আছে।
অরণ্যের পশুপাখিগণে
দর্শন করিয়া জনগণে—
লভিবেন শিক্ষা আর আনন্দ প্রচুর
একই সনে।

বিধির বিধান

এ সংসারে বিধির বিধান
লঙ্ঘিতে না পারে কোনজন।
জন্মক্ষণ হতে জাতকের জীবনেতে
যে-ঘটনা হয়েছে লিখন—
হাজার চেষ্টাতে তার হয় না খণ্ডন।
এ ধারণা জনগণ করেন পোষণ—
জাতকের জনমের ষষ্ঠ দিনে
বিধাতাপুরুষ আসি কপালে তাহার
করেন লিখন—
কীরূপে কাটিবে তার ভবিষ্য-জীবন।
বিধাতার সে লিখন ফিরাবার শক্তি
কারও হয়না কখন।

বিধাতা স্বয়ং না পারেন করিতে
আপন বিধান লঙ্ঘন।
জন্ম-মৃত্যু আর বিবাহবন্ধন—
বিধির বিধানে সংঘটিত হয় সর্বক্ষণ।
মানুষের জীবন ভরিয়া যত শুভ কিংবা
অশুভ ঘটন—
দৈবেরে বিধান জানি মানি লয়
সর্বজন।
দৈবেরে খণ্ডন করিবারে জগৎ মাঝারে
নাহি পারে কোন জন।
কবচ মাদুলি যাহা করায় ধারণ
শুধুমাত্র জাতকের মনে
সাহস যোগাতে অনুক্ষণ।
বেহুলার লোহার বাসরঘরে
প্রবেশ করিয়া সর্প দংশন করিল
পতি লক্ষীন্দরে—
দৈবের বিধান অনুসারে।
সর্প-দংশনের ভয় করে—
কাটালেন সারাদিন রাজা পরীক্ষিত
লৌহ কারাগারে।
সন্ধ্যাকালে সামান্য একটি ফল
করেন গ্রহণ।
দৈবের লিখন সফল করিতে সেইক্ষণ—
ফলের ভিতরে পোকার আকারে
সর্প বাহিরিয়া পরীক্ষিতে
করিল দংশন।
দৈবের লিখন পারিল না করিতে খণ্ডন
প্রাণপণ করিয়া যতন।
শান্ত চিত্তে মানি লয়ে বিধির বিধানে—
দৈব-ইচ্ছা জানি উহা
করিতে সহন পারে যেই জন,
সার্থক হইয়া ওঠে তাহার জীবন।

অন্তরতম

আমার অন্তর-তলে বসি
লইয়া চলেছ তুমি মোরে—
প্রকাশিছ তব ইচ্ছা আমার মাঝারে
নিশিদিন ধরে।
জীবন ভরিয়া—
আছ মোর হৃদয় জুড়িয়া
তোমারে খুঁজিয়া আমি
পাই না কখনও,
জানি না কখন তুমি কৃপা করি
দিবে দরশন।
তোমার ইচ্ছারে সফল করিতে—
জন্মকাল হতে তুমি আছ
মোর সাথে।
তবু তোমা পারিনি জানিতে।
আমার জীবন ভরি ভুল-ভ্রান্তি যত
ক্ষমা করি নিতেছ সতত —
আমার মঙ্গল তরে তুমি অবিরত।
তোমারে জানিতে আমি হয়েছি ব্যাকুল—
দেখা কি দিবে না তুমি
ক্ষমা করি মোর যত ভ্রান্তি-ভুল?
জীবনের শেষ প্রান্তে আসিয়াছি আজ—
সময় নাহি যে আর
বুঝি তাহা হৃদয়ের মাঝ।
কাতর অন্তরে তাই মিনতি জানাই—
দেখা দিতে ভুলো না আমায়
জীবনের অন্তিম বেলায়।
ওগো অনুপম, মোর অন্তরতম,
আপন স্বরূপে মোরে দিয়া দরশন—
সার্থক করহ তুমি
মোর এ জীবন।

জীবন খাতা

বিধাতা রচিত এই জীবনের খাতা—
প্রতিটি দিনের তরে নির্দিষ্ট রয়েছে
তার এক একটি পাতা।
জন্মের আদিতে বিধাতার হাতে
রচিত হইবে মানুষের কর্ম অনুসারে
এই খাতার লিখন—
সেই লেখা ধরি গঠিত হইবে
জাতকের আগামী জীবন।
জীবনের শুরু হতে শেষদিন ভরি
কী আছে লিখন নাহি জানে কোনওজন।
তাই তারা চেষ্টা করে
করিতে গঠন আপন জীবন
আপনার মনের মতন।
এই চেষ্টা অধিকাংশ মানুষের
হয়েছে বিফল—
সামান্য কাহারও দেখা যায়
হইতে সফল।
অজানা ভাগ্যেরে জানিবার তরে—
জ্যোতিষ গণনা অনেকেই করে।
সেই গণনার অনুসারে
ভাগ্য ফিরাবার তরে
জ্যোতিষীর নির্দেশিত কবচ-মাদুলি
তারা ব্যবহার করে।
কিন্তু মানুষের সব চেষ্টা ব্যর্থ করে
জীবনের সকল ঘটনা সংঘটিত হয়
দৈব অনুসারে।
কেহ কেহ আপনার জ্ঞান অনুসারে—
দৈবের উপরে স্থান দেন
আপনার পুরুষকারেরে।
কুন্তীপুত্র কর্ণের জীবন
ব্যর্থ করে দিল শুধু
নিয়তির নিষ্ঠুর পেষণ।
নিয়তিরে অস্বীকার করি
করেছিল কর্ণ পুরুষকারের পূজন।

জবিন ভরিয়া ঈশ্বরের শরণ লইয়া—
হৃষ্ট চিত্তে বিধির শাসন
মানিয়া লইতে পারে
যেই জন,
অখণ্ড শান্তির মাঝে অনুক্ষণ
প্রতিষ্ঠিত থাকে সেই জন।

তোমার আমি

তোমার আমি না আমার তুমি?
ভাবনা করিয়া পাই না আমি
যদি তুমি শুধু আমারই হও
জগতের আর কাহারও নও?
ভাবিয়া ভাবিয়া পাই না কূল—
কভু মনে করি আমারই ভুল।
ভুবন জুড়িয়া রহিয়াছে যারা,
তারা কখনওই নহে তোমা ছাড়া।
যারা আছে এই বিশ্ব-মাঝারে—
তুমি তাহাদের সকলের তরে।
কেন তবে আমি ভাবিয়া মরি?
ভ্রম হয় মনে তুমি শুধু মোরই।
ভ্রম ঘুচাইয়া সঠিক মানি—
জগতে রয়েছে যতেক প্রাণী,
তুমি তাহাদের সবার স্বামী।
কেমনে পাইব একেলা আমি?
জন্ম দিয়েছ করুণা করে—
এ বিশ্ব মাঝে যতেক জনেরে
সকলেরে তুমি সমান জান,
কেহ নহে ছোট বড় কখনও।
আমিও তাদের সবার সনে—
যুক্ত রয়েছি এই ভুবনে,
তাহারা সকলে তোমারই যেমন
আমিও রয়েছি তোমারই তেমন।

সব সংশয় হইল দূর—
শান্ত হইল হৃদয়-পুর।
তোমারই যে আমি বুঝিনু সার,
জানিলাম মনে আমি তোমার।

প্রার্থনা

বাল্যকালে রাজপুত্র ধ্রুব
ব্যাকুল হইয়া হরি-অন্বেষণে
গিয়াছিল শ্বাপদসঙ্কুল
অরণ্য গহনে।
সেই ব্যাকুলতা দাও মোরে
অন্বেষণ করিতে তোমারে—
মোর হৃদয়ের গহন গভীরে।
বাহির বিশ্বের রূপ-রস-শব্দ-স্পর্শ হ'তে
পারি যেন ফিরাইতে দৃষ্টি মোর
অন্তর গহনে—
আকুল পরানে খুঁজিতে তোমারে
হৃদি-অরণ্যে।
জীবন ভরিয়া বাহির জগৎ লয়ে
করিয়াছি খেলা সারাবেলা—
আজ জীবনের অন্তিম বেলায়
বুঝিয়াছি, হায়,
অমূল্য জীবন মোর কেটেছে হেলায়।
সময় নাহি যে আর ডাকি তাই বারবার—
হে হৃদয়নাথ, করুণা করিয়া মোরে
শক্তি দাও খুঁজিতে তোমারে
অন্তর মাঝারে।
বিগত জীবন মোর ফিরায়ে আনিতে
পারিব না আর—
যেটুকু সময় আছে জীবনসন্ধ্যায়,
ধ্যানলীন থাকিবারে পারি যেন
অন্তর গুহায়।

তোমারে খুঁজিব আমি যত দিন দেহে আছে প্রাণ—
সব চিন্তা সকল ভাবনা হবে শুধু
তোমারে ঘিরিয়া অবিরাম।
তোমারে জানার আগে যদি মোর ফুরায় জীবন—
কাতরে মিনতি করি
জন্মান্তরে দিও দরশন।
বুঝিবারে দিও মোরে
সংসারে কেহই কারও
হয় না আপন—
একমাত্র তুমিই সবার
আপনার হইতে আপন।
তোমারে পাইলে জীবনের সব চাওয়া-পাওয়া
হবে অবসান—
অনন্ত প্রশান্তি লভি
পরিপূর্ণ হবে মোর প্রাণ।

প্রণাম

নিশাশেষে প্রভাতের সুস্নিগ্ধ বায়ুর পরশন
ভরি দিল মোর প্রাণ-মন—
নিদ্রা ত্যজি উঠিলাম
বিশ্বপিতার চরণ স্মরণ করি
রাখিলাম দিবসের প্রথম প্রণাম।
পুরব-গগনে ধীরে প্রকাশিয়া অরুণের রক্তরাগ—
দেখা দিল দিননাথ বিশ্বেরে দানিয়া আশীর্বাদ।
ভক্তিভরে আনত নয়নে জানাই প্রণাম মোর
পৃথিবীর পিতা রবির চরণে।
শান্ত মনে ধীর পদে আসিলাম নামি
প্রস্ফুটিত পুষ্পের বাগানে—
প্রভাতের মৃদু সমীরণে আন্দোলিত
বৃক্ষরাজি সনে রাখিলাম আমার প্রণাম
বিশ্বরূপা মায়ের চরণে।
মধ্যাহ্নে স্নানের কালে গঙ্গা জননীরে
স্মরণ করিয়া মানসে প্রণমি তাঁরে
হৃদয়ের ভক্তি-অর্ঘ্য দিয়া।

স্নান করি গৃহদেবে পূজিলাম পুষ্প-বিল্বদলে—
রাখিলাম নতি তাঁর চরণের তলে।
ভোজন-বেলায় অন্নপূর্ণা জননীরে করিয়া স্মরণ
কৃতজ্ঞ হৃদয়ে তাঁহার কৃপার দান
করিনু গ্রহণ।
সে অন্নের অগ্রভাগ নিবেদন করিলাম
বিশ্ব-আত্মার চরণে
ভক্তিযুত সশ্রদ্ধ প্রণামে।
দিবসের অবসানে ধীরে ধ্বনিত হইল
মন্দিরে মন্দিরে আরতির সুমধুর ধ্বনি—
বিমুগ্ধ হৃদয়ে পূর্ণপ্রাণে দেবতা-চরণে রাখিলাম
মোর সন্ধ্যার প্রণাম।
নিশাকালে নিদ্রার প্রাক্কালে—
হেরিনু গগন-ভালে জ্যোৎস্নাময়ী চাঁদে,
মধুর আবেশে ভরি গেল
মোর মন-প্রাণ—
মুগ্ধ চিত্তে নতশিরে জানালাম
মোর দিন-শেষের প্রণাম!

সীমাহীন

অসীম এ মহাবিশ্বে সীমাহীন মহাশূন্যে
অন্তহীন কোটি কোটি সসীম তারকা-গ্রহ
নীহারিকা-ছায়াপথে আবর্তিয়া আপন আপন
কক্ষপথ ধাইয়া চলেছে অবিরাম বেগে—
যুগ হতে যুগে।
চিন্তার অতীত এই মহাবিশ্বের সৃজন—
কোন সে চেতনা যাঁর মহাশক্তি হতে
হইয়াছে অপূর্ব অচিন্ত্য এই
মহাবিশ্বের রচনা?
বিস্ময়ের সীমা যায় হারাইয়া করিয়া চিন্তন—
কেবা সেই চেতনেরও চেতয়িতা
খোঁজে তাঁরে মন।
মানস-চক্ষেতে সেই সীমাহীনতার ধারণা করিতে গিয়া
স্তব্ধ মন হারায় চেতন!

নিশীথের গহন আঁধারে খোঁজে তাঁরে মন
হৃদয় গভীরে—
শুনিয়াছি অনুভূতির মাঝারে পাওয়া যায়
অসীম সে চেতনের দিব্য পরশন,
যাঁহারে অন্তরে খোঁজে মন।
অবিরত সে চিন্তায় মগ্ন রহে মন—
ধ্যান মাঝে অনুভবে পাইতে তাঁহারে অনুক্ষণ।
জানি না কখন মোর এই আশা
হইবে পূরণ—
এই জন্মে চেতনের দিব্য-অনুভূতি
লভিবারে পারিব কখন?

শ্রীপঞ্চমী

আজি পুণ্যপঞ্চমী তিথিতে সর্বশুক্লা দেবী সরস্বতী
করিলেন মর্ত্যে আগমন—
ভক্ত মানবের পূজা করিতে গ্রহণ।
মা'র শুভ-আগমন ঘোষিত হইল পৃথিবীতে—
হুলুধ্বনি সহ সুগম্ভীর শঙ্খের ধ্বনিতে।
জ্ঞানমূর্তি সরস্বতী সর্ববিদ্যা-অধিষ্ঠাত্রী
প্রসন্না হইয়া নামিলেন ধরণীতে
ভক্তচিত্তে বরাভয় দিতে।
বর্ষে বর্ষে এই পুণ্যদিনে করুণার প্রতিমূর্তি
দেবী সরস্বতী আসেন জগতে
ভক্তের অন্তর হতে অবিদ্যা-অজ্ঞানরাশি
দূর করি দিতে।
জননীর শুভ-আগমনে পৃথিবীর বুকে—
আনন্দের স্রোত প্রবাহিত হয় দিকে দিকে।
কাতর অন্তরে ভক্তগণ প্রার্থনা জানায়
মা'র চরণেতে—
ধরণীর বুক হতে অজ্ঞান-তমসা বিদূরিতে।
দয়াময়ী মাতা সরস্বতী ভক্তের প্রার্থনা
করেন পূরণ—
এ বিশ্বাসে ভরি ওঠে বিশ্বজনমন।

এ পৃথিবী হতে সর্বপাপ বিদূরিতে
প্রতি বর্ষে জননীর হয় আগমন—
ভক্তিনত চিত্তে ভক্তগণ পূজেন মাতারে
হয়ে একমন।

চন্দ্রমল্লিকা

প্রভাত রবির কিরণ-পরশে
চন্দ্রমল্লিকা জাগিল হরষে
মেলিয়া নয়ন চাহিল আকাশে
নবীন সূর্য পানে—
প্রভাত সমীর ভরিয়া উঠিল
বিহগের কলতানে।
হরিৎ বরন পল্লব কোলে
চন্দ্রমল্লিকা কুসুমটি দোলে—
গোলাপী বরন শোভা মনোরম
আন্দোলিয়া মৃদু সমীরণে—
জানায় প্রণতি বুঝি বিধাতা-চরণে।
পুষ্পের জনম ধন্য হয় পরশিয়া
দেবতা-চরণ।
নয়ন মেলিয়া সহাস্য বদনে
সূর্যেরে জানায় নমস্কার—
যাঁহার পরশ লভি উঠিল ফুটিয়া
হৃদয় তাহার।
লীলাময়ী যেই প্রকৃতির কোলে জনম তাহার
হৃদয়ের অকৃত্রিম ভালবাসা
জানায় তাহারে কৃতজ্ঞ অন্তরে
বারে বারে।
প্রতীক্ষা নিরত থাকে মল্লিকা কুসুম
দেবতার চরণ লাগিয়া—
যে-চরণ পরশনে সার্থক হইবে
তার হিয়া।

আনন্দময়

এ দ্যুলোক-ভূলোক ব্যাপিয়া
আনন্দের স্রোত বহে অবিরাম—
সে আনন্দধারা স্নানে
অনাবিল পুলকের সাড়া জাগে
নিখিলের প্রাণে।
চন্দ্র-সূর্য-গ্রহ-তারা সনে
পৃথিবীর প্রাণীদের প্রাণে
অফুরান হরষ জাগিয়া ওঠে
বুঝি অকারণে।
প্রভাতের প্রথম আলোকে
স্নাত হয়ে জননী বসুধা আনন্দিত মনে—
জানালেন প্রণতি তাঁহার বিধাতা-চরণে।
হিমানী কিরীটে রক্তিম অরুণচ্ছটা
উঠিল ঝলিয়া হিমাদ্রি শিখরে—
দ্যুলোকের আনন্দের ধারা পরশিল তারে
স্নিগ্ধ প্রভাত সমীরে।
সানুদেশে গভীর বনানী
সে আনন্দস্রোতে অবগাহি
মর্মরিয়া উঠিল শিহরি—
অজানা পুলকে থরথরি।
নদ-নদী স্রোতস্বিনী গুহার আঁধার হতে নামি—
পুলকে মাতিয়া চলিল ধাইয়া
মিলন আশায় সাগর বেলায়।
গাছে গাছে পাখিদের আনন্দ-কূজন
ভরি দিল নিখিলের মন—
হৃদয়ের আনন্দ অজানা
জাগাইল প্রাণে সুরের মূর্ছনা।
সে আনন্দ পশিয়া হৃদয়ে জাগাইল
সত্য-সুন্দরের তরে প্রাণের আকুতি—
লভিবারে তাঁর অনুভূতি
হৃদি-অন্তঃপুরে।
বিমুগ্ধ অন্তরে নিবেদন করিনু নিজেরে
চিরসুন্দরের পায়ে—
চিরদিন তরে।

গগন

অরুণবরন গগন উজলি প্রভাত সূর্য
ওঠে ঝলমলি—
আঁধারমগন বিশ্বভুবন
প্রকাশ পাইল ধীরে,
তারকার দল মিলাইয়া গেল
দূর গগনের তীরে।
বিহগেরা জাগি কুলায়ে আপন
কূজনে মুখর করিয়া ভুবন—
সুপ্তিমগন জগতে জানাল
নিশা-অবসান বারতা,
কুলায় ত্যজিয়া চলিল উঠিয়া
গগনের পথ ধরিয়া।
দ্বিপ্রহরের উজল গগনতলে—
বিশ্বভুবনে জীবগণ যত
আপন আপন কর্মেতে রত,
জগৎ রয়েছে মুখর হইয়া
সহস্র কোলাহলে—
দীপ্ত গগনতলে।
দ্বিপ্রহরের অবসান হল ধীরে—
সূর্য নামিল মধ্য-গগন ছেড়ে
পশ্চিমাকাশ পানে,
প্রখর দীপ্তি হ্রাস পেল ক্রমে ক্রমে।
অপরাহ্নের কালে—
দিবা অবসান হইল সূচিত
দীপ্ত গগন-ভালে।
সূর্য ঢলিল আকাশের শেষ পারে—
বিহগেরা উড়ি চলিতে লাগিল
নীড়ে ফিরিবার তরে।
সন্ধ্যা নামিয়া আসিল ধরায়
অস্ত-রবিরে দেখা নাহি যায়—
মুখর ভুবন নীরব এখন
আঁধারের মহিমায়,
গগন প্রান্তে সন্ধ্যা তারাটি
আধফোটা চোখে চায়।

ধীরে আকাশের বুকে
প্রকাশিল একে একে—
অগণিত তারকার রাশি,
নিঃসীম আঁধারের গরিমা বিনাশি।
পুরব গগন-ভালে চন্দ্রিমা উজ্জ্বল
দেখা দিল আকাশের পারে সেইক্ষণ—
অনুপম চন্দ্রালোকে স্নাত হয়ে
হাসিল গগন!
অপরূপ সে মাধুরী-পরশ লভিয়া
মায়াময় হইল ভুবন!
অনাবিল রজতধারায় ধৌত
মায়াময়ী প্রকৃতিরে হেরি
হৃদয় উঠিল ভরি।
স্মরিলাম জগৎ-পিতারে একান্ত অন্তরে—
যাঁহার কৃপার এই অপরূপ দান
সার্থক করিল মোর প্রাণ!

বিদ্যালয়

দেশবাসী জনগণে জ্ঞানদান তরে
প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে দেশের ভিতরে—
বহুবিধ বিদ্যালয় বহুদিন ধরে
আর বহু যত্ন করে।
নানাবিধ বিদ্যালয় মাঝে—
নানারূপ শিক্ষার ব্যবস্থা রহিয়াছে।
নিজ প্রয়োজন আর ইচ্ছা অনুসারে
জনগণ নানাবিধ বিদ্যালয়ে পড়ে।
পুরাকালে ছাত্রগণ—
গুরুগৃহে গিয়া শিক্ষা করিত গ্রহণ।
গুরুগৃহে বাস আর শিক্ষালাভ করি
আসিত ফিরিয়া সবে নিজ নিজ বাড়ি।
একালেও বহু প্রতিষ্ঠান রহিয়াছে—
ছাত্রগণ বাস করি সেথা
বিদ্যাশিক্ষা করে।
শিক্ষা সমাপন করি যায় তারা ফিরে
নিজ দেশে আপনার ঘরে।

দরিদ্র ছাত্রের তরে রহিয়াছে দেশ জুড়ে
বেতনবিহীন বিদ্যালয়—
দীন-দুঃখী ছাত্রগণ শিক্ষার সুযোগ
পারে যেন করিতে গ্রহণ।
এই বঙ্গদেশে বীরসিংহ গ্রামে
জন্মিয়াছিলেন যেই বালক ঈশ্বর—
বহু কষ্টে বহু যত্নে অসামান্য
বিদ্যালাভ করি—
পাইয়াছিলেন আখ্যা "বিদ্যাসাগর"।
যতবিধ দান আছে দেশের ভিতরে—
বিদ্যাদান তাহাদের সবার উপরে।
বিদ্যালয় হতে এই বিদ্যাদান হয়—
বিদ্বান ব্যক্তির ইহা কর্তব্য নিশ্চয়।
বিদ্যালয় দেশের উন্নতি আনে ক্রমে—
শিক্ষিত করিয়া যত দেশবাসীগণে।
পরম রতন বিদ্যা লভিবার তরে—
বিদ্যালয়ে যত্ন কর একান্ত অন্তরে।

ঈশ্বর

এ মহান বিশ্ব সৃষ্টি করেছেন যিনি—
তাঁহারে ঈশ্বর বলি জানি।
বিশ্ব-ভরি যত জীবগণ
সকলেই তাঁহার সৃজন।
বিশ্বপ্রকৃতির যত তরুলতা বৃক্ষ নদী নদ
সুবিশাল পাহাড় পর্বত—
সাগর অতল
মেরুদেশ আর মরুভূমি যত
সকলেই সেই ঈশ্বর-সৃজিত।
সীমাহীন আকাশ ভরিয়া
যত গ্রহ-তারা-চন্দ্র সূর্য-নীহারিকা—
আবর্তিছে যুগ যুগ ধরে
এই মহাবিশ্ব চরাচরে
তাঁরই শক্তি তাহাদের সবার ভিতরে।

তাঁহারে জানার চেষ্টা করিছে মানব
হৃদি-মাঝে পাইবারে তাঁর অনুভব—
জন্ম জন্ম ধরে ধৈর্য সহকারে
চিরদিন তরে।
সফল হয়েছে যাঁর এ চেষ্টা মহান
হৃদি-মাঝে লভেছেন তাঁহার সন্ধান—
ঘুচে গেছে অন্তরের সকল অজ্ঞান,
সার্থক হয়েছে তাঁর মানবজীবন।

পাখি

প্রভাতবেলায় ঘুম ভাঙে পাখির কূজনে
ভাবি মনে মনে
কতশত ভিন্ন ভিন্ন পাখি
সারাদিন দেখি,
বিচিত্র বরন আর বিচিত্র গড়ন
শত শত অপরূপ পাখির জীবন।
জগৎ জুড়িয়া নানা দেশে নানা পরিবেশে
হরেক রকম পাখির জীবন
কিবা অনুপম।
খেচর ভূচর জলচর উভচর আদি
বহুতর পাখিদের দেখি নিরবধি।
পাখির জীবন—
বিধাতার বিচিত্র সৃজন।
অতি ক্ষুদ্র টুনটুনি সাথে
সুবৃহৎ শকুনিরে দেখি পৃথিবীতে।
নিরীহ-প্রকৃতি পাখি আর হিংস্র পাখি
সর্বত্রই দেখি।
নিরামিষভোজী পাখি সনে
আমিষ ভোজনকারী পাখি
আছে বনে।
সকালে সন্ধ্যায় আকাশেতে ঝাঁকে ঝাঁকে
পাখি উড়ি যায়—
আহার সন্ধানে ফিরে তারা
বন হতে বনে।

পাখিদের মাঝে পেঁচক ও নিশাবক আদি
বহু নিশাচর পাখি রহিয়াছে।
জগৎ জুড়িয়া আছে যত প্রাণী
পাখি তাহাদেরই অন্যতম জানি।
ধন্য বিধাতার এই অপূর্ব সৃজন
জগতের যত প্রাণী মাঝে
এই পাখির জীবন।

জোনাকি

অন্ধকার রজনীতে বাগানের গাছে গাছে
জোনাকির মেলা
শত শত জোনাকিরা করিতেছে খেলা
গাঁথিয়া চলেছে যেন আলোকের মালা।
আলোর নিশানধারী বিচিত্র জোনাকি
উড়ি উড়ি চলে সারারাতি
আলোর খেলায় থাকে মাতি।
বিজলী বাতির মত জ্বলে আর নিভে
কী অপূর্ব পোকা এরা নাহি পাই ভেবে।
দিনের বেলায় মৌমাছি আর প্রজাপতি
দেখা যায়—
রাত্রির প্রাণী জোনাকিরা
আলোর মশাল জ্বালি সারা রাত
ঘুরিয়া বেড়ায়।
ধরা নাহি দেয় এরা মানুষের হাতে
ভ্রমবশে সহসা কখনও
ঢুকে পড়ে ঘরের মেঝেতে।
বাহিরিতে না-পারিলে সে জোনাকি
বাঁচে না কখনও
আলোকের সাথে নিভে যায়
তাহার জীবন।
বিধাতা করিয়াছেন জোনাকি সৃজন
সিংহ হাতি মহিষ ও মানুষ যেমন।
বিধাতার সৃষ্টি মাঝে ছোট-বড় ভেদ নেই কোন—
সকলের প্রাণ সমান তাঁহার কাছে, জেনো।

আমার জীবন আর জোনাকির প্রাণ
তাঁর চোখে একই সমান।
প্রার্থনা জানাই বিধাতারে
পক্ষপাতশূন্য এই দৃষ্টি
দানিতে আমারে।

জন্মভূমি

মোর জন্মভূমি, চট্টলা জননী,
তোমারে প্রণমি।
পার্বত্য প্রদেশ হতে নামি আসিয়াছে
কর্ণফুলী নদী তোমারে স্নিগ্ধতা দানি–
মিলিয়াছে সাগরের সনে
তব তটভূমে!
উত্তর-পূর্বের সীমা পাহাড়ের প্রাচীর বেষ্টিত
দক্ষিণ-পশ্চিমে বঙ্গোপসাগর
সদা পাহারায় রত।
নদী কর্ণফুলী ভরিয়াছে তোমা
শ্যামলিমা আর উর্বরতা দানে
পাহাড়ের কঠিনতা বিদূরিত করি
সরসতা আনিয়াছে প্রাণে।
প্রজ্বলিত বারব-অনলে রেখেছ ঢাকিয়া
তব কোমলতা দিয়া—
শ্যামল বনানী স্নিগ্ধ-সৌন্দর্য পরশে
ভরিয়া রেখেছে তব হিয়া।
তোমার সন্তান হিন্দু বৌদ্ধ আর মুসলমান—
সকলেরে স্নেহডোরে বাঁধিয়া রেখেছ তুমি
আপনার ক্রোড়ে।
ধন্য তুমি চট্টলা জননী, মোর জন্মভূমি,
ভুলিব না জীবনে তোমারে—
তব ক্রোড় ছাড়ি থাকি যত দূরে।
রহিয়াছ তুমি মোর অন্তর-গুহায়—
জীবন ভরিয়া তুমি থাকিবে সেথায়!

মামাবাড়ি

মনে পড়ে ছেলেবেলা মা'র সনে
যেতাম মামার বাড়ি মোরা ভাইবোনে।
থাকিতাম দীর্ঘকাল মামার সেখানে—
সেই দূর কোয়েপাড়া গ্রামে।
আমাদের শহরের বাড়ি হতে
যেতে হত মামাবাড়ি দীর্ঘ নদীপথে।
সে বিচিত্র ভ্রমণকাহিনী
আজ তাহা স্বপ্ন বলি মানি।
অতি ভোরে উঠি খাইতাম ডাল-ভাত দু'টি
আলুমাখা সনে অশান্ত প্রাণে।
মা আর দিদি-দাদা মিলে চলিতাম আমরা সকলে
সেই ভোরবেলা নদীপারে ঘাটের উপরে—
নৌকার তরে।
নৌকাতে বসে দেখি চারিপাশে—
গ্রাম-বাংলার সেই পরিবেশে।
সারাদিন প্রায় কাটে নৌকায়—
দুপুরের পরে পৌঁছাই তীরে।
নদী-ঘাট ছেড়ে গেলাম উপরে—
চলেছি সকলে মেঠোপথ ধরে।
মামার বাড়িতে মামীমার হাতে
চা খেলাম মোরা পাথরবাটিতে।
সেই স্মৃতি আজ মনে পড়িছে চকিতে!
দুপুরে বসিলে ভাত খেতে—
মামীমা দিতেন লাল লাল ভাত
কাঁসার থালাতে।
সে অপূর্ব স্বাদ আজও জাগিছে স্মৃতিতে।
সারাটা দুপুর ভরে মা আর মামীমা ঘুমালে—
খেলিতাম লুকোচুরি খেলা
মোরা সব ভাইবোন আর
মামাতো দাদা ও দিদি মিলে।
আজ জীবনের শেষ ধাপে এসে—
শৈশবের যত স্মৃতি কেন ওঠে ভেসে?
মায়ার বাঁধনে রয়েছি আমরা বাঁধা
সংসার জীবনে—

সেই সব ভাইবোন আজ সবে নাই
যাহারা রয়েছে তারা
আছে অন্য ঠাঁই।
ভাবি মনে মনে—
অনিত্য এ সংসার জীবনে
মায়ার বাঁধন কেন পিছনেতে টানে?
চলিতে হইবে সকলেরে সম্মুখের পানে
মরণের টানে—
এই চিরসত্য মন কেন নাহি মানে?

পাখা

পাখার জনম বহু পুরাতন।
প্রচণ্ড গরমে গাছের ছায়ায়—
শীতল সমীরে শরীর জুড়ায়।
শ্রান্ত পথিকেরা কভু পড়ি নিদ্রা যায়।
ঘরের ভিতরে হাওয়া পাইবারে
পাখা ব্যবহার শুরু হয় ধীরে।
প্রথম প্রথম তালপাতা কাটি
সবে করিত ব্যজন।
তারপর ধীরে সেই পাতা হতে
হাতপাখা হইল সৃজন।
আরও পরে ক্রমে টানা-পাখা
হল আবিষ্কার—
সারা ঘর এককালে শীতল করিতে
জুড়ি নাই যার।
বিজ্ঞানের উন্নতির সাথে
বিদ্যুতের ব্যবহার হইল জগতে।
বৈদ্যুতিক পাখা আজ দেখি ঘরে ঘরে—
গ্রীষ্মে খরতাপ যাহা পলকে নিবারে।
মানুষের চেষ্টা হতে
নিত্য নব আবিষ্কার হতেছে জগতে।
চেষ্টার অসাধ্য কিছু নাই পৃথিবীতে।

প্রেসার কুকার

হুস্ হুস্ হুস্—
ফুঁসিতেছে প্রেসার কুকার,
রাঁধিবার নবতর এই যন্ত্র
অতি চমৎকার।
অতি আধুনিক এই পাত্রে অল্পক্ষণে
হয়ে যায় সুখাদ্য তৈয়ার।
মাংস মাছ তরকারি ভাত—
নিমেষে প্রস্তুত করি দেয় এ কুকার।
অভিনব এই পাকপাত্র আবিষ্কার—
নাহি হয় তুলনা ইহার।
পাচকের প্রয়োজন হয় না কখনও—
কিনিয়াছে কুকার যে-জন।
একজন কিংবা বহুজন আছে যে-বাড়িতে—
কুকার কিনিয়া নিলে হইবে না
পাচক রাখিতে।
ধন্য মানি সেই লোকে—
কুকারের চিন্তা যার এসেছিল
প্রথম মাথাতে।
বাষ্পশক্তি রুদ্ধ করি যন্ত্রের মাঝারে
সকল প্রকার খাদ্য প্রস্তুত করিয়া দেয়
নিমেষ ভিতরে।

পিসীমা

শৈশব হইতে পিসীমাকে পাইয়াছি সাথে—
মায়ের অধিক স্নেহ পাইয়াছি
তাঁর কাছ হতে।
পিসীমার ছেলেমেয়ে আমাদের দাদা আর দিদি
খেলার সঙ্গী ছিল তারা নিরবধি।
আমার নিজের পাঁচ ভাইবোন—
মিলে মোরা খেলিতাম মোট সাতজন।
তাহাদের মাঝে আমি ছোট সকলের—
পিসীমার কাছে আমি বড় আদরের।

পিসীমা বাবার ছোট বোন—
বাবা জানিতেন তাঁরে একান্ত আপন।
পিসামশায়ের মৃত্যু হতে—
বাবা নিয়ে এসেছেন পিসীমাকে
নিজের বাড়িতে।
জন্মক্ষণ হতে আছি মোরা একই বাড়িতে—
পিসীমা ও দাদা-দিদি সাথে।
পিসীমাকে জেনেছি আমরা
চিরপুরাতন মায়ের মতন।
পিসীমার শ্বশুর বাড়িতে
শারদীয়া পূজা হত প্রতি বছরেতে।
সে সময়ে তাঁর শ্বশুর বাড়ির লোক এসে
নিয়ে যেতো পিসীমাকে গ্রামের সে দেশে।
আমাকে না-বলে যেতে হত পিসীমাকে চলে।
আমাকে জানালে যাওয়া হইবে না বলে।
পরদিন না-দেখে পিসীকে—
কেঁদে কেঁদে গেছে দিন চলে
ভেসে অশ্রুজলে।
পক্ষকাল পরে পিসী ফিরেছেন ঘরে—
ছুটে গিয়ে তাঁকে ধরি মহা আনন্দেতে।
পিসীও সমান স্নেহে তোলেন কোলেতে।
সে সব মধুর দিনে আসিয়াছি
ফেলিয়া পিছনে।
প্রত্যহ সকালে চা ও বিস্কুট বাটি ভরে
রাখিত মা সাজাইয়া আমাদের তরে।
আমি সেই বাটি হাতে নিয়ে
খুঁজিতাম মোর পিসীমাকে—
তাঁর সেই অন্ধকার ঘরে ঢুকে
"পিছিরি পিছিরি" বলে ডেকে।
মোর গলা পেয়ে ছুটে এসে পিসী মোরে
করিতেন কোলে—
ঘর হতে বাহির হইয়া আসিতেন
সবার মাঝারে সকালের চায়ের আসরে!
ভাত ছাড়া অন্য কোন খাদ্যবস্তু পেলে—
পিসীকে না-দিয়ে কভু খেতাম না ভুলে।

পিসী পিসী করে কেটে যেত সারাদিন—
পিসীকে না-দেখে থাকা বড়ই কঠিন।
মোর সেই পিসী আর নেই এ জগতে—
চলে গেছে আমাদের ছেড়ে
চিরদিন তরে।
ভুলিতে পারিনি আমি আজও
শৈশবের সেই পিসীমারে।
থাকিবেন চিরদিন তিনি
আমার অন্তরে।

রিক্‌শাওয়ালা

ঠুং ঠুং ঠুং রিক্‌শা চলেছে ছুটে জোরে—
জ্যৈষ্ঠ মাসের দ্বিপ্রহরে।
সোয়ারি দু'জনে অস্থির মনে
আরও দ্রুত চালাইতে বলিছে তাহারে।
রিক্‌শা চালায় যারা তাদের জীবন
দুঃখের ভীষণ।
সারাদিন রাস্তায় ছুটাছুটি করে
যতটুকু রোজগার হয় তাতে—
সংসার চলে না কোনমতে।
ঝড়-জল ভরা দিনে—
রিক্‌শা টানার কথা ভাবে সে কেমনে?
তবু তারে হয় বাহিরিতে
বিষণ্ণ চিতে।
দুঃখের হিসাব তার কে করে জগতে?
যেদিন শরীর তার বহিবে না আর
পারিবে না রিক্‌শা চালাইতে কোনমতে—
দুঃখের সংসার তার হইবে অচল,
কে লইবে তার সংসারের ভার
কেবা তার যোগাবে আহার?
রিক্‌শাওয়ালার ব্যথা বুঝিবার
কেহ নাই এ জগতে—
দুঃসহ জীবনভার একা তারে
হইবে বহিতে।

জীবন না-হলে শেষ কমিবে না দুঃখ-ক্লেশ
সহিতে হইবে আমরণ—
দুঃখময় রিক্‌শাওয়ালার জীবন।

টেলিভিশন

আধুনিক জগতের নবতর দান
অপরূপ যন্ত্র এই টেলিভিশন।
বাহির বিশ্বেরে গৃহকোণে
চোখের সামনে দিল এনে—
ভাবিয়া বিস্ময় জাগে মনে।
সারাদিন ধরে বহুবিধ দর্শনীয়
প্রদর্শিত হইতেছে এক এক করে।
সঙ্গীত নাটক আর নিয়মিত খবরের পর—
দেখা যায় দেশ-বিদেশের
বহু বিচিত্র খবর।
সমুদ্র অতলে আনে চোখের সামনে—
কত শত জলচর প্রাণী যাহাদের নাম নাহি জানি,
করিতেছে খেলা সেই অতল গহনে।
দেখিয়া বিস্ময় জাগে প্রাণে।
আকাশ ভরিয়া যত রবি-শশী-তারা
আর নীহারিকাদল—
ছুটিতেছে যুগে যুগে অন্তহীন বেগে,
তাহাদের দেখা যায় চোখের উপরে
টিভির ভিতরে নিমেষ মাঝারে।
বেতারে খবর আসা-যাওয়া যদি বা সম্ভবে—
রঙিন রঙিন ছবিসহ বাণী কীরূপে আসিবে?
ভাবনার সীমা তল না-পাইয়া
যায় হারাইয়া।
যন্ত্রের মাধ্যমে সংগৃহীত সারা জগতের
যত বাণী আর ছবি একই সাথে—
প্রচারিত হয় দেশব্যাপী ঘরে ঘরে
যত টিভি রহিয়াছে সে সব টিভিতে।

টিভির মতন মনোহারী প্রচারের যন্ত্র
আর হয়নি সৃজন।
জগতের সর্ববিধ কল্যাণ সাধিতে
পারে এ টিভিতে।
জনমনে সীমাহীন প্রভাব ইহার—
সকল মানুষ তাহা বরেন স্বীকার।
একই ভাবে দেশব্যাপী অকল্যাণ সৃজিবার
ক্ষমতাও রয়েছে ইহার।
মানব-মনের অন্যায়ের স্পৃহা জাগাইতে
টিভির মতন কিছু নাই এ জগতে।
এই টিভি জগতের পরম বিস্ময়—
মানুষের সৃষ্টি ইহা অন্য কিছু নয়।
বিধাতা স্বয়ং প্রকাশিত হয়েছেন
তাঁর সৃষ্ট মানুষ মাঝারে—
তাই দেখি অসম্ভব সম্ভব হয়েছে
এই টিভি আবিষ্কারে।
ধন্য মানি অপরূপ এই টিভি আবিষ্কার—
নররূপী নারায়ণ নিজে
স্রষ্টা যার।

বেলাদি

ছোট পিসীমার ছোট মেয়ে
আমার বেলাদি—
আমরা তাহাকে জানি
জনম অবধি।
পিসীমাকে জানি মোরা ভরিয়া জীবন—
জন্মাবধি দেখিতেছি মায়ের মতন।
খেলার সঙ্গিনী দিদি শৈশব হইতে—
আছি মোরা একসাথে
একই বাড়িতে।
ভালবাসা যত ছিল বেলাদির সনে
ঝগড়া ও মারামারি করিতাম
কভু ভাইবোনে।

পিসীমার ছেলে-মেয়ে ননীদা ও বেলাদিকে নিয়ে—
আমাদের দুই ভাই আর তিন বোনে
খেলিতাম মোট সাতজনে,
মহা আনন্দিত মনে।
বেলাদিকে নিয়ে মোরা বোন চারজন—
ননীদা ও আমার দাদারা মিলে
ভাই তিনজন।
আমাদের বিশাল বাড়িতে—
পুকুর ও ফলের বাগান পিছনেতে।
সম্মুখে বিরাট মাঠ তারপর নদী—
সাত ভাইবোনে মিলি খেলিতাম
সন্ধ্যা অবধি।
এক স্কুলে পড়িতাম বেলাদির সনে
মোরা চার বোনে—
সন্ধ্যাবেলায় পড়া শেষ করি
খেলিতাম সবাই মিলিয়া লুকোচুরি।
বড় আনন্দের মাঝে কেটে গেছে শৈশবের দিন—
ফিরিয়া তো আসিবে না আর কোনদিন।
আজ মোরা চার বোন বার্ধক্যের দুয়ারে এসেছি-
আপন আপন সংসারের দায় বহিতেছি।
দেখা হওয়া সকলের বড়ই কঠিন—
বহু বৎসরের পরে হয় কোন দিন।
মায়ার বাঁধনে বাঁধা রয়েছি আমরা—
মায়াময় জগতের ইহাই তো ধারা।
শৈশব-যৌবন হতে বার্ধক্যের পথে—
অগ্রসর হবে সবে এ মর জগতে।
কে কাহার আগে যাবে জগৎ ছাড়িয়া
কেহ নাহি ভাবে তাহা জীবন ভরিয়া
মানবজীবন পদ্মপত্রে জলের মতন—
বিধাতারে স্মরণে রাখিয়া
কাটাইতে হবে এই
সংসার জীবন।

বৃন্দাবন

বৃন্দাবন দরশন হয়নি আমার—
মানসে হেরিতে সেই বেণুগোপালেরে
হৃদি-বৃন্দাবনে,
মোর মন চাহে বার বার।
যমুনা পুলিনে কদম্বকাননে যাঁর বাঁশী
বিমোহিত করেছিল শ্রীরাধার প্রাণ—
অন্তর গহনে মন খোঁজে তাঁরে অনুক্ষণ
পাইবারে তাঁহার সন্ধান।
বংশীধারী সেই কালাচাঁদের উদয়ে
মোর হৃদয়ের তমোরাশি হয়ে যাবে নাশ—
উজল আলোক-স্নানে শুচিশুভ্র হবে
মোর অন্তর-আকাশ।
কেমনে পাইব মোর হৃদি-বৃন্দাবনে
সেই কৃষ্ণচন্দ্রের দর্শন
অনুক্ষণ যাঁরে স্মরে মোর মন,
যাঁহার বিরহে অন্ধকার ছেয়েছিল বৃন্দাবনে
গোপীদের মন।
কবে হবে আমার জীবনে সেই হরির দর্শন—
যাঁহারে পাইলে সার্থক হইবে
মোর মানব জনম।

প্রজাপতি

ফুলের বাগানে সারাবেলা—
উড়ে চলে প্রজাপতি দলে দলে
যেথা ফুলমেলা।
বিচিত্র বরন ফুলেরই মতন প্রজাপতি—
মিশিয়ে নিজেরে ফুল সনে
বসে প্রতি ফুলে অকারণে,
কেন তা কে জানে?
ভ্রমর যেমন ফুলে বসি করে মধু আহরণ—
প্রজাপতিদল তাহা করে না কখন।
চঞ্চল পাখাতে তার উড়ি উড়ি বারবার
প্রতি ফুলে বসে অকারণ।

অপূর্ব সুষমাময় প্রজাপতিগণ—
সৌন্দর্য-পিপাসা লুব্ধ তাদের জীবন।
বিধাতা রচিয়াছেন প্রজাপতিদের
সুন্দর করিয়া দান করি বিচিত্র বরন।
পরমপিতার স্নেহ লভি প্রজাপতি—
আসিয়াছে পৃথিবী মাঝারে আনন্দের তরে—
জীবন ভরিয়া ফুলে ফুলে ভ্রমে
অকারণ আনন্দে মাতিয়া।

মায়ারানী

আমার দাদার বাড়ি থাকে মায়ারানী
বহুদিন ধরে আমরা সকলে তারে চিনি।
সরল সুন্দর তার স্বভাব ও মন—
হাসিমুখে সকলেরে করে সম্ভাষণ।
অশোকনগরে দাদা বাড়ি করেছেন—
বৌদিকে নিয়ে দাদা সেখানে থাকেন।
মায়ারানী আসিয়াছে তাহাদের বাড়ি
দূর গ্রাম হতে নিজ বাড়ি ছাড়ি।
মায়াকে কাজের তরে এনেছিল তার এক মামা—
বহুদিন ধরে তিনি দাদাদের জানা।
মায়াদের কষ্টের সংসার ছেড়ে
আসিতে হয়েছে তারে কাজ করিবারে।
সরল স্বভাব দেখে দাদা ও বৌদি
ভালবেসেছিল তাকে প্রথম অবধি।
মায়াও করিত সেবা তাদের দু'জনে—
অন্তরের ভালবাসা দিয়ে হৃষ্টমনে।
দাদা সারাদিনভর থাকিতেন বাড়ি—
বৌদিকে যাইতে হত স্কুলে বাড়ি ছাড়ি।
প্রধানা শিক্ষিকা তিনি ছিলেন ইস্কুলে—
বাড়ির দায়িত্ব পুরা মায়ার উপরে
রেখে ফেলে।
সে দায়িত্ব পালিয়াছে মায়া নিজগুণে—
বৌদিও সন্তুষ্ট ছিল দাদার নিকটে সব শুনে।

এবারে দাদার খুব অসুখ হইতে—
নিয়ে যেতে হল তাঁকে সেবা সদনেতে।
চিকিৎসার শেষে দাদা আসিলেন ফিরি—
ছুটি নিয়ে কিছুকাল বৌদিকে
থাকিতে হোল বাড়ি।
মায়া প্রাণপণে করিতে লাগিল সেবা অতীব যতনে।
স্নান-খাওয়া ভুলি মায়া প্রহরীর প্রায়—
রাত্রি-দিন কাটাইল দাদার সেবায়।
মায়াকে জানিল বৌদি নিজ কন্যা বলি—
জানাইল আমাদের সকলেরে
তার গুণাবলী।
কৃতজ্ঞতা পাশে বৌদি বাঁধিল মায়াকে—
মায়ার মঙ্গল তরে
প্রার্থনা জানাল দেবতাকে।

অনুরাগ

অনুরাগ স্বর্গীয় সম্পদ হৃদয়ের ধন—
অনুরাগ বিনা নাহি বাঁচে কোন জন।
অনুরাগ ভরে পৃথিবী নিয়ত
প্রদক্ষিণ করিছে সূর্যেরে।
সমুদ্র রয়েছে ঘিরে এই বসুধারে
হৃদয়ের অনুরাগ ভরে।
অন্তরের অনুরাগে তটিনী চলেছে বেগে
সাগরের সনে মিলিবারে।
পুষ্প অনুরাগী ভ্রমরেরা সারাক্ষণ
পুষ্প হতে পুষ্পান্তরে করিছে গমন।
জ্যোৎস্না রাতে চাতকেরা জাগে
চাঁদের পরশ লাগি
চাঁদ অনুরাগে।
অনুরাগভরে ঘিরিয়া তরুরে চলিয়াছে লতা
আকাশেতে চাহি ঊর্ধ্বশিরে।
নবমেঘ অনুরাগে তড়িৎ খেলিছে মেঘে
ধরণীর অনুরাগ বাদলধারায়,
গ্রীষ্মের উত্তাপে সহে বৃষ্টির আশায়।

যুগে যুগে পুরুষ-প্রকৃতি পরস্পর অনুরাগী অতি
অনুরাগভরে একে অন্যেরে লইয়া
চলে জীবনের ধারারে বহিয়া।
আপন সন্তানে পিতা-মাতা স্নেহ করে
হৃদয়ের সীমাহীন অনুরাগভরে।
সেইরূপ আপন আপন ভ্রাতা-ভগ্নি তরে
একই অনুরাগ জন্মে তাহাদের হৃদয় মাঝারে।
অনিত্য এ সংসার জীবনে
নিত্যসত্য ভগবানে অনুরাগী হয় যেই জন,
সার্থক হইয়া ওঠে তাহার জীবন।

তীর্থ ভ্রমণ

যৌবনের শেষে এসে ঘটেছে সুযোগ
নানা তীর্থ দর্শন করার
শ্রীক্ষেত্রের জগন্নাথে দর্শন হয়েছে মোর
বিভিন্ন সময়ে চারবার।
আরও দেখিয়াছি তথা আচার্য শংকরে
গোবর্ধন-মঠের ভিতরে।
শিলং পাহাড়ে ভ্রমণের তরে গিয়েছি আমরা
যেই বার—
গৌহাটীতে এসে কামাখ্যা মায়ের পীঠস্থানে
লভিয়াছি দর্শন তাঁহার।
তুষার-রচিত লিঙ্গরাজ অমরনাথের দর্শনের তরে
দুঃসাহস ভরে গিয়েছি কাশ্মীরে।
বহু কষ্ট সহ্য করে তিন দিন ধরে
চড়েছি পাহাড়ে
অপরূপ লিঙ্গরাজে হয়েছে দর্শন,
সার্থক জেনেছি মোর মানব জনম!
কেদার-বদরী তীর্থ দর্শনের তরে
চড়িয়াছি হিমালয় পাহাড়ের 'পরে—
বহু পরিশ্রম শেষে হয়েছে দর্শন
কেদারের শিবলিঙ্গ আর
বদ্রীনারায়ণ।

তথা হতে নামিবার পথে
দর্শন হয়েছে আচার্য শংকরে
যোশীমঠ-গুহা অভ্যন্তরে।
পঞ্চকেদার লিঙ্গে দর্শনের আশে
ভ্রমিয়াছি একমাসকাল হিমালয় পাহাড়েতে এসে।
ভিন্ন ভিন্ন পাহাড়ে চড়েছি আমরা বারবার
দর্শনের তরে এই বিভিন্ন কেদার।
তুঙ্গনাথ রুদ্রনাথ মদমহেশ্বর আর
কল্পেশ্বর শিবে দর্শন করিতে চড়িয়াছি বারবার
বহু কষ্টে বিভিন্ন শৃংগেতে।
বছর পাঁচেক গেছে কেটে—
তারপর রাজস্থান ভ্রমণ করিতে
এসেছি দিল্লিতে।
দিল্লি হতে বাহির হইয়া জয়পুর আজমীর
রাজপুতানার নানা স্থান ঘুরিতে ঘুরিতে
উপস্থিত হইলাম পুষ্কর তীর্থেতে।
স্নান করি সরোবর পুষ্করের জলে
ব্রহ্মার মন্দির দর্শন করিয়া চলিলাম
সাবিত্রী পাহাড়ে সাবিত্রী মাতারে
দর্শনের তরে।
সেই স্থান ছাড়ি আসিয়া গুজরাটে
স্নান করিলাম সকলে মিলিয়া
প্রভাসখণ্ডেতে।
দেখিলাম তথায় আবার আচার্য শংকরে
সারদা মঠের অভ্যন্তরে।
পরদিন আরব সাগরে স্নান সারি
পূজিলাম সোমনাথ লিঙ্গ মহারাজে
ভক্তি করি।
সেথা হতে আসিলাম দ্বারকাপুরীতে
দেখিলাম রাজা কৃষ্ণে আনন্দিত চিতে।
রুক্মিনী মাতার দর্শন হইল রুক্মিনী মন্দিরে
পূজিলাম সকলে মিলিয়া ভক্তি ভরে।
রাজা কৃষ্ণে দর্শন হইল পুনরায়
নৌকায় চড়িয়া গিয়া বেট-দ্বারকায়।

তথা হতে নাগেশ্বরে গিয়া মাটির নিচেতে
নাগেশ্বর শিবে হইল দর্শন
দ্বাদশ জ্যোতির্লিঙ্গ মাঝে
যিনি অন্যতম।
পশ্চিম দেশের বহু তীর্থ দর্শন করি
ফিরিলাম অবশেষে দিল্লি হয়ে বাড়ি।
বছর দশেক পরে যেতে হল গয়াধামে
পিণ্ডদান তরে।
গয়াধামে করিয়া গমন
শ্রীবিষ্ণুপাদ মহাপীঠ হইল দর্শন।
বুদ্ধগয়া গিয়া লভিলাম দরশন
সেই বোধিবৃক্ষে যার নিচে ধ্যানে বসি
রাজপুত্র শাক্যসিংহ লভেছিল
নূতন জীবন।
কালীঘাট মন্দিরেতে দক্ষিণা-কালিকা
দক্ষিণেশ্বরে ভবতারিণী জননী আর
পঞ্চবটী মূল, কাশীপুর উদ্যান বাটিকা,
জয়রামবাটি আর কামারপুকুর,
বেলুড়ের সমাধি মন্দির
একে একে দর্শন করেছি এ সকলে,
পশ্চিম বাংলার সব মহাতীর্থ বলে।
দর্শন হয়েছে আরও মহাতীর্থ সাগর-সঙ্গম
মহর্ষি কপিল যেথা রচেছেন আপন আশ্রম।
এ জন্মে যত তীর্থ হয়েছে দর্শন
ভগবৎ কৃপা ভিন্ন কাহারও তা
হয় না কখন।
মোর প্রতি তাঁর কৃপা অনুভব করে
প্রণাম জানাই তাঁরে
কৃতজ্ঞ অন্তরে।

আমাদের ধারা

আমার পিতার ঊর্ধ্বতন দ্বাদশ পুরুষ
বাসুকী গোত্রেতে জন্ম কায়স্থ ক্ষত্রিয়
গঙ্গাধর সেন
নদীয়া জেলার কংকগ্রাম ছাড়ি
চট্টগ্রামে আসি বসতি নিলেন।
জায়গা নিলেন ফিরিংগী বাজারে
কর্ণফুলী নদীপারে মাঠের উপরে।
সেইখানে বসতি স্থাপন করি ধীরে
কর্ণফুলী নদীর ওপারে কিনিলেন আরও
জমিজমা পুকুর ও চাষক্ষেত
কোয়েপাড়া গ্রামে
খ্যাতি পাইলেন সে গ্রামের জমিদার নামে।
তাঁর পুত্র বাণীকান্ত সেন
পরবর্তীকালে তাঁর উত্তরাধিকারী হইলেন।
এই ধারা বাহি কেটে গেল তাঁহার জীবন
নিজপুত্র আনন্দীরামের হাতে
করিলেন নিজ জমিদারী সমর্পন।
বংশ-পরম্পরা ক্রমে জীবানন্দ শ্যামরায় শ্রীরাম
পরশুরাম রামশংকর বৃন্দাবন নিত্যানন্দ
আর নন্দকুমার পাইলেন ভার
সেই পূর্বপুরুষের জমিদারী রক্ষা করিবার।
মোর পিতা রঞ্জনলাল সেন
নন্দকুমারের জ্যেষ্ঠপুত্র রূপে জন্মিলেন।
তাঁহার সন্তান মোরা মোট নয় জন
পাঁচ পুত্র সহ চারি কন্যাগণ।
জ্যেষ্ঠ পুত্র নাম যাঁর রজতকুমার
ভারতের মুক্তি লাগি সূর্য সেন অনুগামী হয়ে
দিয়েছেন প্রাণবলি সম্মুখ সমরে,
চট্টগ্রাম পুণ্যভূমি 'পরে।
পরবর্তী তাঁর তিন পুত্রদের মাঝে
প্রথম পুত্রের মৃত্যু ঘটে অত্যন্ত শৈশবে।
মেজ ভাই মোহিত কুমার আঠারো বৎসর
বয়সেতে—
ছাড়িয়া গেছেন দেহ পিতার সাক্ষাতে।

গঙ্গাধর সেন হতে দ্বাদশ প্রজন্ম পরে
দেশ ছাড়া হতে হোল আমার পিতারে।
দেশ-বিভাগের পরে চট্টগ্রাম ছেড়ে
আসিতে হইল তাঁকে আমাদের
সকলের সাথে কলিকাতা মহানগরীতে।
আশি বৎসরেতে পিতা অসুস্থ হইয়া
দু'বৎসর রহিলেন শয্যায় শুইয়া।
দেহত্যাগ করি পিতা গেল নিত্যধামে
মাতার সহিত রাখি আমাদের
ছয় ভাইবোনে।
সেজ ভাই দীপ্তি সেন আর ছোট ভাই ক্রমে
সংসারী হইল বিবাহ করিয়া দুই জনে।
বোন তিন জন রয়ে গেল ভাইদের সনে
সংসার না-করে শান্ত মনে।
শুধু ছোট বোন প্রবেশ করিয়া সংসারেতে—
লভেছিল এক পুত্র শান্তনু নামেতে।
সেজদার ঘরে—
একপুত্র জন্ম নিল পার্থ নাম ধরে।
আমার জননী আনন্দের সীমা হারাইল
দেখি সেই প্রথম নাতিরে।
ছোট ভাই ত্রিদিবের পুত্রদ্বয় অনিন্দ্য-সুনন্দ
জন্মিবার পরে
নাতিদের পেয়ে আমার মায়ের মনে
আনন্দ না ধরে।
তিন নাতি সহ ভরা সংসার ফেলিয়া
মাতা বিনোদিনী ছাড়িয়া গেলেন দেহ
কিছুদিন অসুখে ভুগিয়া।
মায়ের মৃত্যুর দু'বৎসর পরে
সেজদা ছাড়িল দেহ চিরকাল তরে।
ভাইদের মধ্যে একমাত্র ছোট ভাই
ত্রিদিব কুমার আছে বাঁচি
বোন চারিজন বৃদ্ধা হয়ে আজও
বাঁচিয়া রয়েছি।
পিতার-বংশের ইতিহাস
যতদূর জানি আমি করেছি প্রকাশ।
মোর মৃত্যু পরে আসিবে যাহারা

এ বংশের ধারা ধরে
এই বংশে-পরিচয় রাখিয়া গেলাম
তাহাদের তরে।

বাবা

মনে পড়ে আমার বাবাকে
"চান্নাবা" বলি ডাকিতাম তাঁকে,
চাঁদের মতন বাবা এই ভাব থেকে।
বাবা মোরে অতি স্নেহভরে
ডাকিতেন "সোনার পুতুল"
এই নাম ধরে।
বাবা আমাদের তরে আনিতেন কিনি ঘরে
খেলনা পুতুল নানাবিধ
যত্ন করে।
পুতুল পাইয়া মোরা সব ভাইবোনে
নাচিতাম একসাথে আনন্দিত মনে!
সকাল বেলায় বৈঠকখানায় গোল-টেবিলেতে
পড়িতাম সব ভাইবোন
বাবার নিকট এক সনে।
পড়া শেষ হলে
স্নান-খাওয়া করি সবে গিয়েছি ইস্কুলে।
বিকালে ইস্কুল থেকে ফিরে
খেলাধুলা করেছি সকলে একসাথে
সুমুখের মাঠে সব ভাইবোন জুটে।
সন্ধ্যায় আবার বাবার নিকটে পড়িতাম
পড়া শেষ হলে বাবা থেকে রূপকাহিনীর
অপরূপ সব গল্প শুনিতাম।
বাবার কখনও যদি অসুখ হইত
সব ভাইবোন মোরা হইতাম ভীষণ দুঃখিত।
থাকিতাম সারাদিন ধরে তাঁর বিছানার ধারে
জল-পটি দিতাম কখনও তাঁর
কপালের 'পরে।
বাবার স্নেহের কথা ভুলিব না সারা জীবন ভরিয়া
রহিবে তাঁহার স্মৃতি হৃদয় জুড়িয়া।

মনে পড়ে সেই ছেলেবেলা
রাত্রিতে খাবার পর পিড়িতে শুইয়া
হইতাম মোরা ভাইবোনে ঘুমেতে কাতর।
বাবা আসি অতি স্নেহে একে একে কোলেতে তুলিয়া
দিতেন সবারে বিছানাতে শোয়াইয়া
সেই সব দিনে আজ কেন মনে পড়ে
এত বেশি করে?
আজ বাবা আমাদের মাঝে আর নেই
দেখিব না তাঁহারে কখনও এই জীবনেই।
আজ শুধু বিধাতারে জানাই মিনতি
বাবার আত্মার তিনি করুন সদ্‌গতি।
পারিব না এ জীবনে ভুলিতে বাবারে
জীবন ভরিয়া বাবা থাকিবেন
আমার অন্তরে।

শিউলি

শরতের সোনালী প্রভাতে
ঝরে শিউলির ফুল অরুণ আলোতে।
বিছাইয়া শুভ্র শয্যা শিশির সজল
ধরণীর বুকে আপনার সুখে।
প্রভাতের বায়ু ভরি ওঠে মধুর সুবাসে
শারদীয়া জননীর আগমনী সুর
প্রাণে আসে।
শ্বেতবর্ণ দলগুলি রেখেছে ধরিয়া
পীত বৃন্ত তার
বিধাতার দান অপরূপ এ কুসুম
জগৎবাসীর তরে শারদ-উপহার।
দেবতা-চরণ লভিবারে
পুষ্পের জনম এ সংসারে।
সার্থক হইবে এই ফুলের জনম
পরশিয়া দেবতা-চরণ।

সাধনা

শৈশব হইতে মানব-জীবনে চলিছে সাধনা।
জ্ঞানলাভ তরে বাল্য হতে যৌবন অবধি
চলে তার এ সাধনা
বিদ্যা আরাধনা।
তারপরে প্রবেশি সংসারে চলে অবিরাম
সাধনা তাহার অর্থলাভ তরে।
অর্থকরী নানা বিদ্যার সাধন লাগি
করে সে যতন প্রাণপণ।
যৌবনের শেষে সংসার পালন
হয় তার সযত্ন সাধন—
আপন সংসার সহজ সুন্দর রূপে
পালন করার সাধনা সে করে—
একান্ত অন্তরে।
ধীরে ধীরে যবে বার্ধক্য নামিয়া আসে
সারা দেহ-মন ঘিরে—
সংসারের ভার ছাড়ি দিয়া বংশধরগণে
আপনার মনে সাধনা সে করে,
নির্জনে গোপনে স্মরি ভগবানে!
পরিণত বার্ধক্য আসিয়া স্মরণ করায়
অবিরত দেহের যাতনা
সেই কষ্ট জাগাইয়া তোলে মৃত্যুর বাসনা।
তখন মানুষ সব চেষ্টা ত্যাগ করি মগ্ন হয়
সত্যের সাধনে—
অন্তরের তলে সাধ্যবস্তু নিত্যসত্যে
লভিবার তরে
আমরণ সাধনা সে করে।

ঝরনা

অন্ধকার গিরিগুহা হতে বাহিরিয়া
রবির কিরণে উজলিয়া চলেছে ধাইয়া
ক্ষীণ জলধারা—
আপন অন্তর বেগে নামি
উপল-বিস্তীর্ণ সানুদেশে অতিক্রমি!

উচ্ছ্বসিত কলকল সংগীতমুখরা
ফেনিল রক্তধারা চলেছে ধাইয়া
হৃদয় আবেগে সম্মুখের পানে
কোন অজানার টানে।
সুদীর্ঘ প্রান্তর আর বিস্তীর্ণ শস্যের ক্ষেত
অতিক্রমি—
ছুটি চলে দুই কূল কাঁপাইয়া
অবিরাম বেগে,
মিলনের আশে তটিনীর পাশে।
দূর হতে ক্রমে পশিল শ্রবণে তটিনীর গম্ভীর গর্জন
আকুল করিয়া প্রাণ-মন,
জাগাইয়া প্রাণের মাঝারে
মিলনের মধুর স্বপন।
ধীরে আসে নয়ন-সীমায় অপরূপ সেই
তটিনীর রূপ—
আকুল আবেগে মিলনের আশে
তটিনীর বুকে ঝাঁপাইয়া পড়িল তখন
হইল মিলন। সার্থক জীবন।

কদম্ব

অপরূপ এই কদম্ব কুসুম
যার দরশনে মনে আনে গোকুলের স্মৃতি—
যেথা কদম্ব কাননে রাধাশ্যামে গোপীগণ সনে
লীলায় মগন হয়ে রহিতেন নিতি।
বর্ষণমুখর দিনে কেশর ফুলায়ে ফুটি ওঠে
তরুশাখে কদম্বের ফুল—
ঘনঘোর মেঘাচ্ছন্ন আকাশের পটে
অনুপম রূপে প্রাণ করিয়া আকুল।
রৌদ্রোজ্জ্বল দিনে কদম্ব কাননে
মধুলোভী অলিকুল গুঞ্জরিয়া ফিরে—
দলে দলে উড়ি আসে সারাদিন ধরে
অকাতরে ঘুরে ফিরে মধুপান করে।

বিশাল কদম্ববৃক্ষ শাখে শাখে জড়াইয়া
অন্ধকার ঘনাইয়া আনে কদম্বকাননে—
সুশীতল সমীরণ বহি যায় মর্মরিয়া
জাগাইয়া শিহরণ কদম্বের প্রাণে।
কদম্বকেশর ঝরি পড়ে ধরণীর 'পর—
কোমল সুবাস ভরি দেয় সন্ধ্যার বাতাস।
প্রাণমন ওঠে ভরি বেণুগোপালেরে স্মরি—
কদম্বকানন যাঁর লীলা নিকেতন!
কদম্ব ফুলের সাথে বিজড়িত রহিয়াছে
রাধাশ্যাম আর গোপীগণ—
এ ফুলের দরশন জাগাইয়া দেয় প্রাণে
তাঁহাদের লীলাভূমি সেই বৃন্দাবন!
ধন্য এই অপরূপ কদম্বকুসুম—
শ্রীহরি-চরণ লভি সার্থক হয়েছে
যাহার জনম।

কৃষ্ণচূড়া

কৃষ্ণচূড়া ফুল ভুবনে অতুল।
বিশাল বৃক্ষের শিরে যবে রাশি রাশি
আগুণ বরন ফুল ফোটে—
নিদাঘের ঘননীল আকাশের পটে
হেরি সেই শোভা হৃদয় আকুল হয়ে ওঠে।
রক্তবর্ণ ফুল রহিয়াছে পলাশ-শিমুল—
কৃষ্ণচূড়া সনে নহে তারা সমতুল।
আপন সৌন্দর্য লয়ে নিজ মহিমায়—
রহিয়াছে কৃষ্ণচূড়া সম্রাটের প্রায়!
বাগানের বহুতর রক্তবর্ণ পুষ্প সনে
হয় না তুলনা এ ফুলের—
অরণ্যের বৃক্ষে বৃক্ষে যত পুষ্প শোভে
বিবিধ বরন,
বর্ণে কৃষ্ণচূড়া তাহাদের মাঝে অতুলন!
ফুল ঝরিবার পরে এই বৃক্ষশাখে
হয় তার বীজের জনম—
বীজগুলি ঝুলি থাকে গাছের শাখায়
খর্ব তরবারির মতন।

কৃষ্ণবর্ণ শত শত পাকা বীজ এ বৃক্ষের
শাখায় শাখায়—
দোল খায় অবিরত সুশীতল
হাওয়ার দোলায়।
আশ্চর্য এ দৃশ্য মনে বিস্ময় জাগায়!
বীজ হতে কৃষ্ণচূড়া বৃক্ষের জনম—
সুবিশাল এই বৃক্ষ রূপে অনুপম।
পুষ্প আর বীজ দুই নহে সাধারণ—
বর্ণের বিচারে কৃষ্ণচূড়া অতুলন!

মধুকর

মৌমাছি বোলতা ভ্রমর—এরা মধুকর।
মধুপান তরে বনে বনে ফিরে—
ফুল হতে ফুলে বসি মধুপান করে।
মধু আহরণ তরে ওড়ে সারাদিন ধরে
না-হয়ে কাতর।
মধু সঞ্চয় করি সে মধু যতনে ভরি
রাখি দেয় সন্তানের তরে—
অরণ্যের বৃক্ষশাখে অভিনব মৌচাক রচিয়া
সেই মৌচাক মাঝারে।
মধুভরা মৌচাকের মাঝে—
একে একে বহু সন্তানের জন্ম দিয়া
মধু পান করাইয়া উহাদের রাখে বাঁচাইয়া,
ক্রমে বড় হয়ে তারা যায় চলি
বাহিরে উড়িয়া।
অপরূপ এই মধুকরের জীবন--
বহু কষ্ট করি আপন সন্তান লাগি
করে তারা মধু আহরণ!
বৃক্ষশাখে মৌচাক মাঝারে
রাখে উহা করিয়া যতন।
তার সেই কষ্টের সঞ্চয়—
মানুষ লোভের বশে
অপূর্ব কৌশলে কাড়ি লয়।

রাতের আঁধারে দল বাঁধি বনে গিয়া
জ্বলন্ত মশাল তুলি ধরি মৌচাকের নিচে—
তাড়াইয়া দেয় মৌমাছিকে।
তারপর বৃক্ষশাখা হতে মৌচাক
কাটিয়া আনে ধারাল অস্ত্রেতে।
মধুকর বিধাতার অপূর্ব সৃজন—
পুষ্পমধু আহরণ করি
কাটায় জীবন।

প্রকাশ

এ বিশ্বব্রহ্মাণ্ড জুড়ি যতদুর দৃষ্টি অবকাশ—
সর্বত্র নেহারি তোমার প্রকাশ।
ঊর্ধ্বে সীমাহীন নভোতলব্যাপী
নেহারি তোমারে—
কোটি কোটি নীহারিকা আর নক্ষত্র মাঝারে।
নিম্নে ধরাবক্ষ জুড়ি অরণ্য-পর্বত
সাগর-মেদিনী আর জীবগণ—
সবার মাঝারে পাই তোমার দর্শন।
দৃশ্যময় জগৎ মাঝারে বহুরূপে
দিতেছ নিয়ত দরশন—
সূর্যালোক আর বায়ুরূপে লভিতেছি
তোমার স্পর্শন।
প্রতি শ্বাসে প্রাণবায়ু রূপে করিতেছি তোমারে গ্রহণ—
সর্বব্যাপী তব অনুভূতি লভিতেছে মন
সর্বক্ষণ।
চেতনার রূপে তুমি আছ এই ব্রহ্মাণ্ড ব্যাপিয়া—
জীবগণ লভিছে চেতনা
তব চেতনার স্পর্শ দিয়া।
চেতনেরও চেতয়িতা তুমি, হে মহান,
সগুণ-নির্গুণ রূপে মহাবিশ্বে
আছ বর্তমান।
মহাশূন্য চিত্তাকাশ আর চিদাকাশ—
সর্বত্রই তোমার প্রকাশ।

স্থূল-সূক্ষ্ম ক্ষুদ্র ও বৃহৎ অণু-পরমাণু
যাহা আছে বিশ্ব জুড়ি—
সবই তুমিময়।
তুমি ছাড়া কিছু নাই কিছু নাহি হয়।

শিবচতুর্দশী

ফাল্গুনের কৃষ্ণাচতুর্দশী ভক্তগণ থাকি উপবাসী
পুজে তোমা ভক্তিভরে গঙ্গাজল আর
বিল্বদলে—
প্রহরে প্রহরে সারানিশি ধরে।
এই শুভদিনে বিল্ববৃক্ষ-স্থিত নিষাদের
অশ্রুজল আর বিল্বদল গ্রহণ করিয়া তুষ্ট
সদাশিব, তুমি, আশিস্ দানিয়াছিলে
সেই নিষাদেরে—
মুক্তি লভিবারে।
সেই হতে আজিও জগৎবাসীগণে
এই পুণ্যদিনে তোমার স্মরণে—
পুজে তোমা ভক্তিভরে থাকি উপবাসী,
রজনীর চারি প্রহরেতে চারিবার
জাগি সারা নিশি।
পরদিন উঠিয়া সকালে আমন্ত্রণ করি আনি
কোন অতিথিরে পারনার তরে—
ভোজন করায়ে অগ্রে সেই অতিথিরে
আপনারা করেন ভোজন সেই অতিথির পরে।
শিবচতুর্দশী যাঁরা করেন পালন—
অন্তরের ভক্তি-অর্ঘ্য দিয়া তোমা করেন পূজন,
হৃদয়-মাঝারে করি তব জাগরণ
সার্থক করিতে চাহে আপন জীবন।
অন্তর্যামী তুমি সদাশিব,
অন্তরের অনাবিল ভক্তি তব প্রিয়—
বাহ্য পূজা মিথ্যা আড়ম্বর
স্পর্শিতে পারে না কভু তোমার অন্তর।

সরল অন্তরে নিষ্ঠা-ভক্তি আর ভালবাসা দিয়া
পূজে যাঁরা তোমা অনন্য চিতে—
সদাশিব, তব কৃপা নিশ্চয়ই লভিবে তাঁরা
নিজ জীবনেতে।

নারী

বিধাতার অনুপম সৃষ্টি নারী ভুবন মাঝারে—
গড়েছেন তিনি তারে পুরুষ হইতে
স্বতন্ত্র আকারে।
পুরুষে গড়িয়াছেন অপূর্ণ করিয়া—
তাহারে পূর্ণতা দান করিলেন নারীরে সৃজিয়া।
দ্বিবিধ রূপেতে হেরি নারীগণে জগৎ মাঝারে—
মোহিনী মুরতি আর জননী আকারে।
মোহিনী রূপিনী নারী আত্মস্বার্থে নিমগ্ন রহিয়া
খোঁজে আপনার সুখ পুরুষেরে বিভ্রান্ত করিয়া।
মোহিনী নারীর মায়ার ছলনে বিভ্রান্ত পুরুষ
অন্যায়ের পথে যায় চলি অতি ধীরে—
দুঃখ-বিপদের মাঝে পড়ি অবশেষে
আত্মগ্লানি অনলেতে পুড়ে।
এ হেন নারীর জন্ম সংসারের বিনাশের তরে—
ভোগ-বাসনার উত্তাল তরঙ্গ মাঝে ডুবাইয়া
পুরুষেরে জীবনের সত্যপথ হতে টানি লয় দূরে।
নারীর পূর্ণতা হেরি তার মাতৃভাবে—
জননী হইতে শ্রেষ্ঠ নাহি কোন নারী এই ভবে।
শিশুকাল হতে মাতৃভাবে পূর্ণ রহে বালিকার মন—
আপনার ভ্রাতা-ভগ্নীদের যত্ন করে
মায়ের মতন।
বিধাতার শ্রেষ্ঠ সৃষ্টি মাতৃরূপা নারী
সংসারের কেন্দ্রে থাকি রাখে নিজ সংসারেরে ধরি।
আপনার সংসারের প্রতিটি জনেরে—
সেবা করে অকাতরে নিঃস্বার্থ অন্তরে।
মাতৃরূপা নারী বিশ্বজননীর প্রতিনিধি—
বিশ্বের কল্যাণ তরে
সৃষ্টি করেছেন তারে বিধি।

রানী রাসমণি

ভুবন-পূজিতা মাতা রানী রাসমণি—
ভগবতী জননীর অষ্টসখী মাঝে
অন্যতমা তিনি।
শিবানী মাতার স্বপ্নাদেশ লভি প্রতিষ্ঠিল গঙ্গাতীরে
মাতা ভবতারিণী মন্দির অপূর্ব সুন্দর।
মন্দিরের বিশাল চত্বরে গঙ্গার উপরে
দ্বাদশ শিবের প্রতিষ্ঠা হইল—
ভিন্ন ভিন্ন দ্বাদশ মন্দিরে।
আরও প্রতিষ্ঠিত হোল লক্ষ্মীনারায়ণ—
দেবী মন্দিরের পাশে ভিন্ন মন্দিরেতে
করিয়া যতন।
পুণ্য-স্নানযাত্রা দিবসেতে অভিষেক করি—
মাতা ভবতারিণীরে আরম্ভিলা নিত্যপূজা
ভক্তি সহকারে।
পূজক ব্রাহ্মণ রামকুমারের হস্তে করিলেন
সে পূজার ভার সমর্পণ।
রানীর মাধ্যমে মাতা ভগবতী করিলেন তাঁর
অপরূপ লীলার প্রকাশ—
এই মন্দির মাঝারে গঙ্গাতীরে
দক্ষিণেশ্বরে।
সেই পূজারীর ভ্রাতা নাম গদাধর—
রামকুমারের সনে মন্দিরে আসিলে,
রানীমাতা দেখি গদাধরে
আনন্দিত হয়ে দিলেন তাঁহারে ভার
লক্ষ্মীনারায়ণে নিত্যপূজা করিবার।
দাদার মৃত্যুর পর রানী রাসমণি—
ভবতারিণী মাতার নিত্যপূজা ভার
ন্যস্ত করিলেন গদাধরের উপরে—
সুযোগ্য পূজারী রূপে চিনিয়া তাঁহারে।
গদাধর জননীরে পূজিতেন নিত্য অশ্রুজলে—
খাওয়াইয়া দিতেন দেবীরে আপনার হাতে
কহিতেন আপনার মনে জননীর সনে
নানা কথা আনন্দে মাতিয়া।

অদ্ভুত পূজারী এই গদাধরে হেরি—
মন্দিরের যত কর্মচারী নালিশ জানাল
রানী মাতার সদন জানবাজারেতে।
সব কথা শুনি পাঠালেন রানী
পুত্রতুল্য জামাতা মথুরে—
উপযুক্ত ব্যবস্থা করিতে।
ভাগ্যবান মথুরমোহন পাইলেন অপূর্ব দর্শন—
গদাধর দেহে শিব-কালী একসঙ্গে
রয়েছে দু'জন।
সেই কথা শুনি রাসমণি গদাধরে চিরদিন তরে
রাখিলেন ধরে দক্ষিণেশ্বরে
ভবতারিণী মন্দিরে।
কর্তব্য করিয়া শেষ রানী রাসমণি
পরিতৃপ্ত আর প্রশান্ত অন্তরে—
সকল দায়িত্ব মথুরের 'পরে সমর্পিয়া
নিত্যধামে গেলেন চলিয়া।
রানী রাসমণি পার্থিব সম্পদে শুধু
ছিলেন না ধনী—
অন্তরের অতুল ঐশ্বর্য তাঁর
নহে বর্ণিবার।
দেশবাসী প্রজাদের রানীমাত্র
নহেন তো তিনি—
বিশ্বজন হৃদয় আসনে
আছেন আসীন,
রানী রাসমণি।

জন্মদিনের স্মরণে

হে রামকৃষ্ণ, যুগ-অবতার,
প্রণমি তোমারে আমি বারবার
আজি তব শুভ জন্মতিথির স্মরণে—
ফাগুন শুক্লা-দ্বিতীয়ার শুভদিনে!
প্রভাতরবির পুণ্যকিরণ
ঘোষিল ধরায় তব আগমন—
সারা দিক্‌দেশ মুখর করিয়া
মধুর শঙ্খ ধ্বনিল!
জগৎবাসীরা শুভসংবাদ শুনিল।
কলির তমসা করিতে হরণ
হইল জগতে তব আগমন—
সারা বিশ্বের আঁধার নাশিয়া
আলোর জোয়ার আনিলে,
কলির কালিমা মুছালে!
সত্য ও ত্রেতা-দ্বাপর যুগেতে
এসেছিলে তুমি এই ধরণীতে—
ধ্বংস করিয়া অসুর শক্তি
ধর্ম রক্ষা করিতে সাধু-সজ্জনে বাঁচাতে!
মরদেহ ত্যজি লুকালে আড়ালে—
ভুলিতে পারিনি তোমারে সকলে,
কাতরে স্মরণ করিতেছি আজ
তব জন্মের প্রভাতে
বহু আশা লয়ে মনেতে!
আসিও ফিরিয়া আমাদের মাঝে
নবযুগে পুনঃ নবতর সাজে—
অধর্ম নাশি ধর্ম স্থাপন করিতে,
কলি ঘুচাইয়া সত্যযুগেরে সূচিতে!

পথ

সভ্যতার উষাকাল হতে হইয়া চলেছে
পথের সৃজন—
মানুষের প্রয়োজনে হইতেছে নিত্য নব
পথের জনম।
নিত্য-প্রয়োজনে একস্থান হতে অন্যস্থানে
গমন করার ফলে হইতেছে অগণিত
পথ আবিষ্কার।
এইরূপে শতশত বৎসর ধরিয়া
কতশত পথ সৃষ্ট হইয়াছে—
কে রাখিবে হিসাব তাহার।
আদিযুগে শুধু স্থলপথ আর জলপথ
হত ব্যবহার—
সভ্যতার অগ্রগতি সনে হইয়া চলেছে
নিত্যনব পথ আবিষ্কার।
এঞ্জিনের আবিষ্কারে রেলপথ হইল তৈয়ার—
আকাশযানের প্রয়োজনে বায়ুপথে
চলাচল হইল তাহার।
ভূগর্ভে পথের সৃষ্টি মানুষের বিচিত্র রচনা—
সাগর অতলে হইয়াছে যত পথ
না-হয় বর্ণনা।
মানব-মনের তলে কোন পথ আছে
কে তাহা জানিবে?
আত্ম-দরশন লাগি কোন পথে
চলিতে হইবে কে সন্ধান দিবে?
জীবনের সর্বশেষ পথ এই আত্মানুসন্ধান—
সদ্‌গুরু একমাত্র দানিবেন
এই আত্মজ্ঞান।

বিচিত্র সৃজন

কোন পশু আকাশেতে ওড়ে রাতের আঁধারে?
বাদুর উহার নাম, সন্ধ্যার আঁধারে
দেখা যায় তারে।
দিনের আলোকে তার দৃষ্টি অন্ধ থাকে—
তাই কভু দেখি না তাহাকে।
কোন পাখি পশু-নাম ধরে পৃথিবীর পরে?
উটপাখি উড়িতে না পারে—
পাখি হয়ে সে বিচিত্র পশু-নাম ধরে।
কে দিয়েছে এই নাম উপহাস করে?
কাছিম মাছ কি পশু ভেবে বল দেখি?
জলে থাকে সাঁতরে বেড়ায় ছোট পোকা খায়—
নদীচরে বালির উপরে রাখে ডিম পেরে।
উভচর প্রাণী যারা থাকে জলে ও ডাঙ্গায়—
কাছিমকে তাহাদের দলে ফেলা যায়।
জাল পেতে শিকারের তরে কোন প্রাণী
খায় পোকা ধরে?
মাকড়সা জাল পাতে পেট থেকে
সূতো বার করে—
সেই জালে যত পোকা পড়ে
খায় সব মেরে।
কোন প্রাণী নিজ জীবনের এক স্তরে
পেট থেকে সূতো টানি বাসা বুনি
তাতে বাস করে অন্ধকারে?
গুটিপোকা রেশমের সূতা দিয়া বাসা বুনি
বাসার ভিতরে বাস করে—
তারপরে বাসা নাশি চলে যায়
জীবনের অন্যস্তরে প্রজাপতির আকারে।
আরও কত বিচিত্র সৃজন ভরেছে ভুবন!
সৃষ্টিকর্তা অপরূপ এক শিশুর মতন—
রহিয়াছে সৃজনের খেলায় মাতিয়া,
অন্তহীন এই খেলা যুগান্তরে চলেছে বহিয়া।

শ্রীশ্রীবাবাঠাকুর

কলি ঘোর অবসান তরে—
পুনঃ অবতরি আসিলেন হরি
শ্রীশ্রীবাবাঠাকুর নাম ধরি
মর্ত্যের এ মাটি আলো করি।
বিশ্বজননীর বরপুত্র সত্যমূর্তি
স্বসংবেদ্য স্বানুভবদেব শ্রীশ্রীবাবাঠাকুর
কলির কালিমা বিদূরিতে—
মা'র শ্রীমুখের সানাই-রূপেতে
আসিলেন এই ধরণীতে।
জ্ঞানমূর্তি দেবী সরস্বতী মর্ত্যবাসীগণের আহ্বানে—
নামেন ধরায় যেই শুভ শ্রীপঞ্চমী দিনে,
সেই পুণ্যক্ষণে অবতরি আসিলেন শ্রীশ্রীবাবাঠাকুর
উদ্ধারিতে জগ-জনগণে—
অতীব দুর্লভ তত্ত্বজ্ঞান দানে।
বিশ্বজননীর তত্ত্ববাণী শুনাইতে জগৎবাসীরে
রচিলেন অভিনব "তত্ত্বালোক" মহাগ্রন্থ
মায়ের মহৎ ইচ্ছা পূর্ণ করিবারে।
এই অনুপম গ্রন্থ রচিত হয়নি সাধারণ জনগণ তরে—
সেই সব মহাজন যাঁরা করিছেন প্রাণপণে
তত্ত্ব অন্বেষণ আপন অন্তরে,
এই গ্রন্থ একমাত্র তাঁহাদের তরে।
"তত্ত্বালোক" মহাগ্রন্থ পাঠে যেইসব মহাজন
লভিবেন আপন অন্তরে সে মহান তত্ত্বজ্ঞান
অতি ধীরে ধীরে—
তাঁহাদের দ্বারা ক্রমে ঘটিবে এ জগতের
বিবর্তন নবযুগ সূচনার তরে।
জনমনে নবীন চেতনা উদ্বুদ্ধ করিয়া
ক্রমে তাহাদের তত্ত্ব-অভিমুখী করি
সত্যযুগ সূচনা করিতে—
এসেছেন নিজে হরি শ্রীশ্রীবাবাঠাকুর নাম ধরি
এ মর-জগতে।
বহু পুণ্যে এই জন্মে যেই সব ভাগ্যবান
পেয়েছেন বাবাঠাকুরের দরশন—
সার্থক হয়েছে তাঁহাদের
এ নশ্বর মানব-জীবন।

অচেনা

কেমনে কবিতা লিখিতেছি এত—
সেকথা তো আমি জানি না,
আমারে লইয়া কে করিছে খেলা
তাহারে তো আমি চিনি না।
হে অজানা, তুমি আমার মাঝারে
রয়েছ গোপনে কতদিন ধরে—
জনম ভরিয়া তুমিই কি মোরে
সম্মুখ পানে ঠেলিছ?
তোমার মনের যত কথা সব
মোর মুখ দিয়া কহিছ?
মৃত্যুর মুখ হতে টানি মোরে
লইয়া আসিলে পুনঃ সংসারে—
কেন যে এ কাজ করিয়াছ তুমি,
সেকথা তো আমি জানি না।
আমি যে তোমারে চিনি না।
হে অচেনা, যদি কৃপা করিয়াছ
গোপনে লুকায়ে কেন রহিয়াছ?
দেখা দিয়া মোরে পুরাও বাসনা—
পরশিতে দাও শ্রীচরণ।
দর্শন দানে সার্থক কর এ জীবন।

প্রতিমা

ছোট মেয়ে প্রতিমা সুন্দরী
এসেছে মোদের বাড়ি—
বড় দিদি মেনকার বিবাহের পরে
আপনার বাবা মা'কে ছেড়ে—
ছোট-খাট সব কাজ করিবার তরে।
প্রতিমা আসার পর
কেটে গেল একটি বৎসর।
প্রতিমা এখন
হয়ে গেছে আপনার জন।

ভোরবেলা ঘুম থেকে উঠে
বাগানে সে যায় ছুটে—
ফুল তুলিবারে আমাদের তরে।
কিছু ফুল নিয়ে দিতে যায় ধেয়ে—
প্রতিবেশী দাদুর বাড়িতে
আনন্দেতে মেতে।
ভালবাসে প্রতিমাকে দাদু-দিদা দুইজনে—
মেনকার ছোট বোন জেনে।
মেনকা কাটিয়ে গেছে বারোটি বৎসর
আমাদের ঘরে মিষ্ট ব্যবহারে।
সুন্দর স্বভাব দেখে বেসেছিল ভাল ওকে
বাড়ির ও পাড়ার সকলে—
এখনও যায়নি ওকে ভুলে।
প্রতিমা এখনও ছোট মেয়ে—
সব কাজ করে মন দিয়ে।
আদর পায় সে ছোট বলে সকলের কাছে—-
তাই বুঝি বাবা-মা ও বাড়ি ভুলে আছে।
আমাদের সকলকে দিদা বলে ডাকে—
আমরাও স্নেহভরে খুকী বলি তাকে।
প্রতি বছরেতে একবার যায় তারা দেশে—
সব ভাইবোন মিলে মহানন্দে ভেসে।
ছোট খুকী প্রতিমাকে যখন না-দেখি—
কাঁদে প্রাণ তার তরে কেন তা না বুঝি।
একটি বছরে সে যে হয়েছে আপন—
তাই তারে না-দেখিলে
কেঁদে উঠে মন।

"সম্ভবামি যুগে যুগে"

হে পার্থসারথি, সত্যবদ্ধ আছ তুমি
জগতের কাছে—
আসিবে ফিরিয়া পুনঃ নবরূপে যুগান্তরে,
অধর্মে বিনাশি ধর্ম প্রতিষ্ঠার তরে।
সে সত্য পালনে আসিয়াছ বারে বারে—
যিশুখ্রিস্ট মহম্মদ প্রণবানন্দ আচার্যশংকর বুদ্ধ

শ্রীচৈতন্য নানক আদি বহুতর রূপে যুগে যুগে
আবরিয়া আপন স্বরূপে নব কলেবরে।
তোমার এ আগমন সংঘটিত হইয়া চলেছে
যুগ হতে যুগে—
আজিও যাহার বিরতি হয়নি একবার।
কলিঘোর তমসা নাশিতে—
আসিয়াছ নামি দেশকাল গণ্ডী অতিক্রমি।
কামারপুকুর গ্রামে জন্ম নিলে গদাধর নামে—
গয়াধামে দিলে স্বপ্ন পিতারে তোমার
ভগবান বিষ্ণু আসিছেন পুত্ররূপে তাঁর।
শৈশব কালেতে তব আনুড় গ্রামের পথে
সহসা হইল দিব্যজ্যোতির দর্শন—
যার ফলে অচৈতন্য হয়ে
প্রথম সমাধি লাভ হইল তখন।
ক্রমে ক্রমে বারবার এ অপূর্ব সমাধি হইতে—
জানিল জগৎ নহ তুমি সামান্য মানব।
নির্বিকল্প সমাধি হইতে প্রত্যাগত যেইজন—
অবতার ভিন্ন সেই নহে সাধারণ।
বিশ্বব্যাপী প্রচারিত হল মহিমা তোমার—
বেদান্তের সত্যধর্ম পুনঃ প্রচারিতে
আগমন করেছ আবার।
জানাইলে তুমি যত জগৎবাসীরে—
সর্বজীবে প্রকাশিছে চৈতন্যস্বরূপ
বিশ্ব-আত্মার চেতনা,
মায়া-আবরণে শুধু জীব তাহা জানিতে পারে না।
সাধনা করিয়া যদি পারে করিবারে
আপনার স্বরূপ দর্শন—
দুঃখময় মানবজীবন হতে
মুক্তিলাভ হইবে তখন।
বিশ্বময় এই মহাধর্ম প্রচারিয়া
জগৎবাসীরে আলোকের সন্ধান দানিয়া—
গেলে চলি আত্মদর্শী পুরুষ মহান
তুমি ভগবান আপনার স্বরূপে মিশিয়া।
এবারে আসিলে তুমি তপঃশুদ্ধ দিব্যদেহে
বাউলের বেশে—

বিশ্বজননীর শ্রীমুখের "সানাই" বলিয়া
ঘোষিলে নিজেকে।
জননীর তত্ত্ববাণী শোনাইতে শত শত তত্ত্বগীতি
উদ্গীত হইল সে সানাই হতে।
মরতের জনগণে উদ্ধারিতে নবরূপে
করি আগমন—
শ্রীশ্রীবাবাঠাকুর নাম করিলে গ্রহণ।
যে-বিশেষ নামে সম্বোধন করিত তোমারে
জননী সারদা তব পূর্ব অবতারে।
মায়ের মহৎ ইচ্ছা পূর্ণ করিবারে
"তত্ত্বালোক" মহাগ্রন্থ করিলে সৃজন—
প্রকাশিলে সেই তত্ত্ব যাহা বিশ্বজননীর
শ্রীমুখের "সানাই" হইতে
হল উদ্গীতন।
হে পার্থসারথি, আরও কত কত বার
আগমন হইবে তোমার—
কলির কালিমা বিদূরিয়া ধর্ম প্রতিষ্ঠিতে।
তোমার এ আগমন, জানি, শেষ হবে না কখন—
যুগ হতে যুগে অবিরাম
বহিয়া চলিবে।

গাজরের ফুল

বাগানের মাঝে গাজরের গাছ আলো করি—
ফুটিয়াছে গাজরের ফুল।
ছোট ছোট সাদা সাদা ছাতার আকারে
শোভাতে অতুল।
কে জানিত এই ফুলে শুধুমাত্র কৌতূহলে
গাজরের শির কেটে পুঁতেছি বাগানে—
অবাক বিস্ময়ে দেখি সেই গাজরের গাছে
শতশত সাদা ফুল ফুটেছে কেমনে।
মাটি থেকে হাত-তিন উঁচু গাছগুলি—
হাওয়ার দোলায় জড়াজড়ি করে
দুলি দুলি।

অপরূপ শোভা তার নয়নেতে হেরি
প্রাণমন উঠিছে আকুলি।
গাজর খেয়েছি বহু বৎসরে বৎসরে—
কিন্তু গাছ তার দেখিনি কখনও
এই জীবন মাঝারে।
সরু সরু পাতাগুলি নরম ডাঁটায়—
বায়ুভরে উঠে দুলি জড়াইয়া
ফুলে ও পাতায়।
এ-গাছের নিচে মাটির ভিতরে—
জন্মিছে গাজরগুলি অতি ধীরে ধীরে।
মূল যবে পরিপূর্ণ হবে উপরের গাছগুলি
শুকাইয়া যাবে।
মূলো আলু এদের মতন—
মাটির গভীরে হয় গাজর ফলন।
সব্জী রূপেতে হয় গাজর রন্ধন—
আরও নানারূপ সুখাদ্য ব্যঞ্জন।
মিস্টান্ন রূপেতে গাজর হইতে হয় হালুয়া তৈয়ার—
চিনি কিশমিশ আদি উপাদান তার।
ধন্য মানি বিধাতারে —
কত না বিচিত্র খাদ্য সৃজেছেন
এ জগতে মানুষের তরে।

তুমি কোথা তুমি কতদূর?

এই মহাবিশ্ব দ্যুলোক ভূলোক যতদূর দেখি
আর জানি—
তোমার চৈতন্য আর তোমার শক্তিতে
সৃষ্ট সবই তাহা মানি।
জন্মকাল হতে এই বার্ধক্য অবধি যতকিছু
দেখা-শোনা-জানা হইয়াছে হইতেছে
নিরবধি সবেতেই রহিয়াছ তুমি—
তব ইচ্ছা তব শক্তি চালনা করিছে মোরে
তাহা মনে জানি।

অনুপম এ বিশ্বপ্রকৃতি জল-স্থল-আকাশ-বাতাস
সর্বত্রই তব চেতনা ও শক্তির প্রকাশ।
তোমার শক্তিতে চলিতেছে জীব-জগতের
যত প্রাণী—
অচেতন যাহা তাহাতেও পরমাণু-রূপে
রহিয়াছ তুমি।
আমার অন্তরে যত চিন্তা রাশিরাশি
তাহাও করাও তুমি অন্তরেতে বসি।
তুমি আছ সকলের অন্তরে-বাহিরে
ভ্রান্ত আমি খুঁজে মরি "তুমি কোথা, তুমি কতদূরে?"
কেন এই ভ্রান্তি আন আমার অন্তরে
তোমার বক্ষেতে থাকি খুঁজি তোমা দূরে?
মনে মনে জানি আর মানি—
এ বিশ্বজগৎ শুধু তুমিময়,
তুমি ছাড়া কিছু নাই, কিছু নাহি হয়।
হে মহান,
আমার অন্তরে দাও তব অনুভূতি
প্রতি শ্বাসে যেন পারি জানিতে তোমারে।
সমস্ত হৃদয়-মন পরিপূর্ণ করি
তোমার আনন্দে তোল ভরি!
মোর এ হৃদয় করি দাও শুধু তুমিময়!

ডালিম

হরিৎ চিক্কণ সরু সরু পাতার আড়ালে
রক্তবর্ণ অনুপম ডালিমের ফুলগুলি দোলে।
প্রভাতের স্নিগ্ধ সমীরণ আর অরুণ কিরণে
দেখি সেই শোভা পুলক জাগিয়া ওঠে মনে।
দ্বিবিধ বর্ণের সমাবেশে বাগানের স্নিগ্ধ পরিবেশে
ডালিমের গাছখানি অপরূপ
শোভা করিয়াছে।
কাকলিমুখর যত চড়াইয়ের দল উড়িয়া বেড়ায়
ডালিমপাতার ফাঁকে হইয়া চঞ্চল।

কোন কোন ডালে থোকা থোকা কাঁচা ফল
বাতাসেতে দোলে—
ফুল আর ফল প্রভাত রবির করে
করে ঝলমল।
সুপক্ক ডালিমফল ভরি থাকে রসাল দানায়—
সুমিষ্ট সে ফল খেয়ে মহানন্দে
প্রাণ ভরে যায়।
রূপে আর স্বাদে প্রাণে-মনে তৃপ্তিদান করে—
ডালিম সবার প্রিয় এ গুণের তরে।
বিবিধ ফলের মাঝে ডালিমের ফল অনুপম
গুণের বিচারে এই ফল অতুলন।
ধন্য বিধাতার সৃষ্ট এ অপূর্ব
ডালিমের ফল—
মানুষের তরে তাঁর স্নেহ
দানায় দানায় করে টলটল।

লেবু

আমাদের দেশে যত টক ফল আছে
লেবু সকলের চেয়ে উপকারী বলি
গণ্য হইয়াছে।
রোগীর পথ্যেতে এই লেবু ব্যবহার
রোগীর রুচির তরে অতি চমৎকার।
গ্রীষ্মের দুপুরে চিনি-জলে লেবুরস দিয়া
পান করি শান্তি ও তৃপ্তিতে ভরে হিয়া।
ভাতের সহিত এই লেবুরস গরমের দিনে
অপরূপ তৃপ্তি আনে প্রাণে।
এ কারণে বাগানেতে লেবু চারা করেছি রোপণ
ধীরে ধীরে বাড়ি উহা লভিয়াছে
যৌবন এখন।
সাদা সাদা কুঁড়ি আর ফুলের সুবাস
সন্ধ্যার বাতাসে ভাসি
প্রাণমন করিছে উদাস।

আরও ধীরে দেখা দিল একখানি
অতি ক্ষুদ্র ফল—
সে ফল দেখিয়া প্রাণ আনন্দেতে
হইল চঞ্চল।
কত আশাভরে করেছি রোপন এই লেবুর চারারে
যদি মোর জীবন থাকিতে পারি দেখিবারে
শুধুমাত্র একটি ফলেরে।
সে আশা হয়েছে পূর্ণ আজ এই ফলটি দেখিয়া।
মনে মনে সংকল্প করেছি—
এই প্রথম লেবুটি সার্থক করিব
দেব-ভোগে দিয়া।
মোর জীবনের এই শেষের প্রহরে
স্বহস্তে রোপিত বৃক্ষে লেবুর ফলন
স্বচক্ষে দেখিয়া মহানন্দে পূর্ণ হল মন।
আশা-পূরণের তৃপ্তি উহার কারণ।
কৃতজ্ঞ অন্তরে আজ তাই—
বিধাতারে ভক্তিভরে প্রণাম জানাই।

চা

চা-কফি-কোকো এ তিনের মাঝে
চায়ের আদর বেশি বাঙালীর কাছে।
অতি শিশুকালে চা খেতে শিখেছি মোরা
দুধের বদলে।
মায়ের নিকটে চা অতি প্রিয় ধন—
তাই মা শিখাল আমাদের
জানিয়া আপন।
মোর মেজকাকা ডাক্তার রূপে যোগ দিয়েছিল
প্রথম বিশ্বরণে ব্রিটিশের সনে।
সেথা হতে ফিরি মায়েরে আমার
শিখাইল চা-পান করিতে বারবার।
সেই কাল হতে মার মনে চায়ের অপূর্ব আকর্ষণ
রয়ে গেল ভরিয়া জীবন।
আজ মোর বার্ধক্যের শেষের প্রহরে
সেই পুরাতন স্মৃতি জাগে বারে বারে।

চায়ের আসক্তি রবে মোর জীবন ভরিয়া
বাঁচিব না কভু আমি চা-খাওয়া ছাড়িয়া।
চা-গাছ দেখার সাধ জেগেছিল মনেতে আমার
আশা ছিল সে সাধ পূরণ হবে
বেড়াইতে গিয়া শিলং পাহাড়।
সে সাধ আমার হয়নি পূরণ
শিলং পাহাড়ে হয় না কখনও
চায়ের ফলন।
আসামের সমতলে এই চাষ রয়েছে প্রচুর
দার্জিলিং শিলিগুড়ি আদি স্থান
চায়ের বাগানে ভরপুর।
বৃদ্ধকালে অবশেষে দেখিলাম
চা-ফুলের সনে চায়ের বীজেরে
দেখাল আমার ছেলে শিলিগুড়ি
চা-বাগান হতে এনে মোর তরে।
অপূর্ব চায়ের ফুল অতি মনোরম
মধ্যভাগে পীতবর্ণ কেশরে ঘিরিয়া
রহিয়াছে চারিখানা শ্বেতবর্ণ দল
অপূর্ব সুষমা বিস্তারিয়া।
জীবনের শেষ প্রান্তে এসে দেখিলাম অবশেষে
টিভির মাঝারে সারি সারি
চায়ের বাগান মনোহারী।
দল বাঁধি যত পাহাড়ী রমনী চয়ন করিতে রত
চা-গাছের পাতা যত—
মাথার-পিছনে বাঁধি কোণাকৃতি ঝুড়ি,
ঝুড়ি মাথে চলে সারি সারি।
সফল জানিনু মোর চা-বাগান দেখার স্বপন
টিভি মাঝে দেখি এই অপরূপ
চায়ের জীবন।
আশা পূরণের আনন্দে ভরিয়া গেল মন
সার্থক মানিনু বিচিত্র এ টিভির সৃজন।

একফালি সাঁঝের আকাশ

বাড়ির পূর্বধারে টানা বারান্দাতে
একখানা আরামকেদারা রহিয়াছে।
সম্মুখে বাগানে ফুলে ফুলে ওড়ে
যত ভ্রমর ও প্রজাপতিগণে
ক্ষণে ক্ষণে!
সেই কেদারায় বসি আকাশে চাহিলে
ঘন নীল একফালি আকাশেরে
দেখি অবহেলে।
প্রত্যহ বিকালে চা-খাওয়া হইলে—
তাকাইয়া থাকি সেই আকাশের নীলে।
ধীরে ধীরে সন্ধ্যা নামে আকাশের কোলে—
ঝাঁকে ঝাঁকে পানকৌড়ি উড়ে যায় চলে।
কোণাকৃতি হয়ে পুব হতে পশ্চিমের পানে।
তাকাইয়া থাকি আমি অবাক নয়নে!
সুইফ্‌ট পাখিরা ওড়ে দলে দলে
তীব্রবেগে উড়ি এরা বিস্ময় জাগায়
হঠাৎ মিলায় কোথা বোঝা নাহি যায়!
অন্ধকার ঘনাইলে আকাশের কোলে
চামচিকা আর বাদুরেরা ওড়ে দলে দলে।
মাঝে মাঝে নিশাবক ডেকে উঠে ওক্ ওক্
আড়ালে থাকিয়া—
হঠাৎ সে ডাক শুনে যাই চমকিয়া।
ক্রমে রাত্রি আসে নেমে আকাশের গায়
সন্ধ্যাতারা পুবাকাশে আঁখি মেলে চায়।
পূর্ণিমা-সন্ধ্যায় তাম্রথালা সম অপরূপ
নিশানাথ উদিত হইয়া—
সুস্নিগ্ধ কিরণ-স্পর্শ দিয়া
মোহময়ী পরীরাজ্যে চায় চলি
আমারে লইয়া।

ঘর ও বাহির

শৈশব হইতে আবদ্ধ ঘরের মাঝে
পারিনি থাকিতে।
সম্মুখের কর্ণফুলী নদী আর উন্মুক্ত প্রান্তর
নিয়ত ডাকিত মোরে "আয় চলে আয়"—
ওদের ভাষায়, ইসারায়।
তাদের সে নীরব আহ্বান স্পর্শ করেছিল মোর প্রাণ।
তাই ঘর হতে ছুটি উন্মুক্ত প্রান্তর ছাড়াইয়া
জোয়ারের জলে নামি করিয়াছি খেলা
সারাবেলা।
নির্দিষ্ট সময় শুধু ঘরে রহিয়াছি
ঘুম-খাওয়া আর পড়াশুনা নিয়ে
যতক্ষণ আছি।
বাড়ির পিছনে পুকুর ও সুবিশাল ফলের বাগানে
সারাদিনে বহুবার ঘুরিতে গিয়াছি।
যৌবনের কর্মব্যস্ত দিনে যতটুকু অবসর পেয়েছি যখন—
ছুটে চলে গেছি বিশাল দেশের
যত পুণ্যতীর্থ স্থানে
বাহিরের হাতছানি আর নীরব আহ্বানে।
আজ মোর জীবনের সায়াহ্ন বেলায়
শুনিতেছি বাহিরের ব্যাকুল আহ্বান,
নীল আকাশের হাতছানি প্রাণ মোর লইতেছে টানি
সুদূরের পানে—
ঘরের বাঁধনে বাঁধা থাকিব কেমনে?
দেহের বার্ধক্য মোরে রাখিয়াছে ঘরে—
প্রাণেতে জাগিছে ব্যাকুলতা বাহিরের তরে।
অসহায় নিরুপায় গৃহ-আঙিনায় অবশেষে
রচনা করেছি সামান্য বাগান এক
ফুল আর কয়েকটি গাছে।
সুশীতল সমীরণ আর রবির কিরণ
নিয়ত প্রবেশে মোর এই বাগানেতে—
উপরের নীলাকাশ ডাকে মোরে হাতছানি দিয়া
আনন্দে আকুল করি হিয়া।

জীবনের শেষপ্রান্তে এসে আজ শুধু এ বাগানখানি
দিতেছে নিয়ত বাহিরের হাতছানি
যাহা পেয়ে শান্ত মনে থাকিতে পেরেছি
আমি ঘরের বাঁধনে!
ইচ্ছা জাগে মোর মনে জীবনের শেষদিনে
এই নির্জন বাগানে তুলসী-গাছের নীচে শুয়ে
ঈশ্বর-স্মরণ করি যেন পারি
মুদিতে নয়ন!
এ মহৎ ইচ্ছা মোর কখনও কি হইবে পূরণ?

আকাশের ডাক

খোলা আকাশের ডাক শুনেছে যে-জন
ঘরছাড়া হয়েছে সে ছিঁড়িয়া বাঁধন।
জন্মিয়াছে যেই জন উদার উন্মুক্ত মন নিয়া
তাহার প্রাণই শুধু অসীমের ডাকে
ওঠে ব্যাকুলিয়া।
অসীম সাগর আর নিঃসীম আকাশ
জানায় নিয়ত সুদূরের আবাহন—
তাহাদের নীরব আহ্বান শুনিতে
পায় না সাধারণ।
এ আহ্বান শুনিবার কান আর প্রাণ নিয়া
জন্ম যাহাদের—
তাহারাই দেয় সাড়া অসীমের
এই আহ্বানের।
এ জগতে দেশে দেশে ঘরছাড়া কত আছে
কে করে হিসাব তার?
জানিবার প্রয়োজন হয় না কাহার।
সুদূরের নীরব ইসারা শুধু তাহাদের প্রাণে
জাগাইতে পারে সাড়া—
গৃহসুখ চাহে না যাহারা।
মহাবিশ্ব নিয়ত ডাকিছে জনগণে
বাহিরে আসিয়া মিলাইতে প্রাণ
তার সনে।

প্রকৃতির সনে যার প্রাণ রহে মিশি
ক্ষুদ্র গণ্ডী অতিক্রমি যায় সে চলিয়া দূরে
উন্মুক্ত প্রান্তর নদ-নদী অরণ্যে পাহাড়ে।
তাহাদের মাঝে খুঁজিয়া পাইতে আপনারে।
অনাবিল সুনীলিম আকাশে চাহিয়া
আপনারে ফেলে হারাইয়া
সে সুদূর অসীমের মাঝে।
মুক্তির আনন্দ জাগে প্রাণে
অসীমের সনে মিলিত হইয়া!
এ মিলন কত যে মধুর তাহা শুধু সেই জানে
আপনার অন্তর-গহনে!

ইসারা

সভ্যতার আদি যুগে বাক্য আর ভাষার সৃজন
হয়নি যখন—
মনোভাব প্রকাশের তরে ভাষার বিকল্প রূপে
সংকেত বা ইসারার ছিল প্রচলন।
মানুষের যতবিধ প্রয়োজন সবই
ইসারা সহায়ে একে অন্যেরে জানাত—
হৃদয়ের যত ভাব আনন্দ-বেদনা
রোগ-দুঃখ-কষ্ট সবই ইসারায়
প্রকাশ করিত।
কালক্রমে কণ্ঠস্বর বিবিধ ভঙ্গীতে
ব্যবহার শুরু হল ইসারা জানাতে।
হয় তো এ থেকে ক্রমে শব্দ সৃষ্টি
হল দেশে দেশে—
মিলিত শব্দেতে বাক্য সৃষ্টি হল শেষে!
ভাষা সৃষ্টি হয়ে গেলে ইসারা কমিল—
গোপন কথার তরে কেবল রহিল।
ইসারা এখনও আছে দেশে প্রচলিত—
বিশেষ বিশেষ স্থানে হয় ব্যবহৃত।

ইসারার প্রয়োজন মানুষের কাছে চিরদিন আছে—
অদ্যাবধি প্রয়োজন ফুরায়নি তার।
ভাষা আর ইসারা চলিছে পাশাপাশি
চিরদিন চলিবে উভয়ে মিলিমিশি।

বেলফুল

বাগানে বেলের দীর্ঘ লতা ভরি
সাদা সাদা বেলফুল ফুটেছে বাগান
আলো করি।
রবির কিরণ স্পর্শে কুঁড়িগুলি একে একে
নয়ন মেলিছে—
প্রভাতের স্নিগ্ধ সমীরণ ফুলের সুবাসে
ভরি আছে।
শ্বেতবর্ণ ফুলগুলি লতায় লতায়
বায়ুভরে অবিরত হেলিছে দুলিছে—
শত শত মৌমাছি আর প্রজাপতি
উড়িয়া উড়িয়া মধু পান করিতেছে।
বেলের লতার পাশে ঝোপাকৃতি ছোট ছোট
বেলফুল গাছ বাগানে শোভিছে—
উভয় গাছেতে একই রূপ গুচ্ছ গুচ্ছ
ফুল ফুটিয়াছে।
গ্রীষ্মকালে এইসব বেলফুল ফোটে—
স্নিগ্ধ মৃদু সুবাসে বাতাস ভরি ওঠে।
অপূর্ব ফুলের শোভা বাগানের মাঝে
বহুতর ফুলে ফুলে বাগান সেজেছে।
সাদা বেলফুল সনে অপরাজিতার নীল রঙ
ধরেছে মোহন রূপ অতি মনোরম।
লাল লাল জবাফুল গুলি—
সবুজ পাতার কোলে আছে মুখ তুলি।
পীতবর্ণ ছোট ছোট অজানা কুসুম
ফুটেছে বাগান আলো করি—
মধুলোভী ভ্রমরেরা উড়িছে তাদের
ঘিরি ঘিরি।

সে শোভা অতীব মনোহারী।
শুভ্রবর্ণ কুন্দফুল ঝোপের উপরে মাথা তুলি—
চাহিছে রবির পানে
উজ্জ্বল কিরণে ঝলমলি।
কাঞ্চন ফুলের গাছে
শ্বেতবর্ণ কাঞ্চন কুসুম শত শত
আলো করি রহিয়াছে—
লুব্ধ ভ্রমরের দলে
করিয়া মোহিত।
পুষ্পের জীবন ধন্য হয়
পরশিয়া দেবতা চরণ।
প্রস্ফুটিত হয় পুষ্প দেবতার তরে—
সৌরভের ভক্তি-অর্ঘ্য দিয়া
দেবতার পায়ে আপনারে
নিবেদন করে।

চৈত্র

ধরণীর বুক হতে উতলা ফাগুন
বিদায় লইয়া যেতে যেতে—
উদাসী চৈত্রের আগমন ধ্বনিত হইয়া
ওঠে বিশ্বপ্রকৃতিতে।
চৈত্রের সে আগমন ধ্বনি
কান পেতে শুনিছে বনানী—
উতলা হাওয়ায় ডালে ডালে
শিহরণ জাগে,
অঙ্কুরিত হয় যত বৃক্ষ আর বনলতা
শুনি সে বারতা।
ধরণীর বুকে তৃণ-প্রান্তরে
শ্যামলিমা জাগে ধীরে ধীরে—
তরুশাখে দেখা দেয় নব-কিশলয় সনে
নবীন মঞ্জরী—
নবরাগে তরুলতা কাঁপে থরথরি।

চৈতি হাওয়া জানাইয়া যায় বনে বনে—
নব অতিথির আগমনের বারতা কানে কানে।
তার সেই গোপন বারতা বহি আনে
নবীন প্রাণের সাড়া
বনানী ও প্রান্তরের প্রাণে।
নিখিলের প্রাণে বাজে নব অতিথির আগমনী সুর—
বসন্তের আগমন নহে বেশি দূর,
শোনা যায় তার আগমন ধ্বনি
কানে বাজে তার চরণের নূপুর, শিঞ্জিনী।
জানিল ভুবন—
নব বসন্তের আগমন
কোকিল কূজনে পাপিয়ার গানে
মুখরিত হোল দিক্ দেশ
আনন্দে মগন হল বিশ্ব-পরিবেশ।
বসন্ত ঋতুর এই অনুপম লীলা
রবে কতদিন?
উত্তপ্ত নিদাঘ আসি অকস্মাৎ
নিঃশেষিবে তাহার জীবন।
এ জগতে কোন প্রাণ নহে চিরন্তন—
জীবনেরে চিরদিন মৃত্যু আসি
করে আলিঙ্গন!

কস্তুরীমৃগ সম

কস্তুরীমৃগ আপন নাভির অপূর্ব সুবাসে
আকুল হইয়া—
দিশাহারাপ্রায় দিকে দিকে
ভ্রমিয়া বেড়ায়!
জানে না কোথায় সেই সুগন্ধের উৎস রহিয়াছে—
কতদূরে নিকটে বা কাছে
কোথা আছে?
অবশেষে অশান্ত চঞ্চল মনে ঘর্ষণ করিয়া চলে
নিজ দেহ বৃক্ষকাণ্ড সনে—
যার ফলে কস্তুরী অকালে যায় ঝরি
মুক্তি দানি অশান্ত মৃগেরে
শান্ত করি!

সেই মত মানুষ খুঁজিছে ভগবানে অরণ্যে বিজনে—
পর্বতগুহায় বসিয়াছে তাঁর ধ্যানে;
কোথা আছ তুমি হরি দেখা দাও দয়া করি—
কাতরে স্মরিছে রাতেদিনে।
অবোধ পাগল প্রায় জানে না তাহারা হায়—
সে কৌস্তুভমণি রহিয়াছে আপনার
হৃদয়গুহায়!
বাহিরে বিশ্বের মাঝে তাঁহারে খুঁজিতে গিয়া
অমূল্য জীবন তার বৃথা কেটে যায়।
শক্তি আর চেতনার মিলিত স্বরূপ যিনি
জগতের স্রষ্টা ভগবান—
তাঁরই পরমাণু হতে সৃজিত হয়েছে
যত প্রাণীদের প্রাণ!
তাঁহারে বাহিরে খুঁজি পাইবে না কেহ কোনদিন—
স্থির মনে শান্ত চিত্তে অন্তরগুহায় খুঁজি
দিব্য অনুভূতি মাঝে হইবে বিলীন!
এ মহান অনুভূতি লভিবারে পারে যেইজন—
আপন জীবনে নিষ্ঠা-সহকারে করি তাঁর আরাধন,
অনুপম সেই দিব্য অনুভূতি লভি যায় মিশি
বিশ্ব-আত্মা সনে লবণ-পুত্তলী সম,
আপনার দেহ ত্যজি সেইক্ষণে!

শুকতারা

সন্ধ্যার গগনতলে
শুকতারা মেলিল নয়ন—
সবার প্রথম।
অন্য তারকার দল তখনও মেলেনি আঁখি,
ধীরে ধীরে একে একে—
শুরু করিয়াছে দেখা দিতে
অন্ধকার আকাশের পটে।
রাতের আকাশ যত গাঢ় হয়ে চলে—
উজ্জ্বল নয়ন মেলি ফুটি ওঠে তারা দলে দলে।
নিঃসীম আকাশতলে তারার নয়ন জ্বলে—
সর্বোজ্জ্বল শুকতারা তাহাদের মাঝে
স্নিগ্ধ হাসি লইয়া বিরাজে।

অন্ধকার রাতের গভীরে দূর আকাশের গায়ে
দেখা দেয় শুকতারা আপন উজ্জ্বল মহিমায়—
সে তীব্র ছটায় তারাদল ম্লান হয়ে যায়।
মধ্যরাতে দেখি তারে গগনের সর্বোচ্চ সীমায়—
ধীরে পরিক্রমি অর্ধপথ এসেছে হেথায়।
পশ্চিম আকাশে চাহি ভাবে বুঝি মনে—
অবরোহণের কাল শুরু তার হইবে এক্ষণে।
নিশা শেষে ম্লান হেসে শুকতারা বিদায় জানায়—
অস্ত-সাগরের পানে যাত্রা শুরু
করার বেলায়।
সন্ধ্যাকালে পূর্বাকাশ হতে যাত্রা শুরু করি
সম্পূর্ণ গগন-পরিক্রমা শেষ হলে—
কর্তব্য করিয়া সমাপন
শুকতারা যাবে অস্তাচলে!

আষাঢ়

আষাঢ় গগনে পুঞ্জ পুঞ্জ কৃষ্ণমেঘ
গম্ভীর গর্জনে ধায়—
প্রবল বর্ষণ আনি ধরাবক্ষে
নদী-নদ-প্রান্তর ভাসায়।
বজ্রের গর্জন সনে বিদ্যুৎ ঝলক
প্রাণে আনে শঙ্কা অজানিত—
পথিকেরে পথমধ্যে অকস্মাৎ
করি চমকিত!
বরিষণ আনে ধরণীর প্রাণে আশার বারতা—
গ্রীষ্মতাপে উষ্ণ ধরা হরষিত হয়ে
বর্ষারে জানায় স্বাগতম্,
ঊষর প্রান্তর-বন শুষ্ক যত জলাধার
পরিপূর্ণ হয়ে হয় আনন্দে মগন!
বৃষ্টি দানে আশীর্বাদ ধরণীর বুকে—
সুজলা-সুফলা ধরা ভরি ওঠে সুখে।
শস্যপূর্ণ হয়ে পৃথ্বী লক্ষ্মীমন্ত হয়—
দেশবাসী বর্ষার কল্যাণে সুখে রয়।

কৃষক ও গ্রামবাসী বর্ষারে মঙ্গলদাতা জানে—
বর্ষার আশায় গরমের কষ্ট
সহ্য করে প্রাণপণে।
বসন্তেরে সৌন্দর্যের তরে
ঋতুরাজ বলে সর্বজনে—
প্রাণদাতা ঋতু বলি
বর্ষারে সকল লোক মানে।
ছয়ঋতু মাঝে বর্ষাঋতু অন্যতম—
প্রতিটি ঋতুই এই জগতের
মঙ্গল কারণ।
বিধাতার সৃষ্ট এই ছয়ঋতু মাঝে
বর্ষা শ্রেষ্ঠতম—
মানবের কল্যাণের তরে বিধি
করেছেন বর্ষার সৃজন।

তোমার আহ্বান

তোমার আহ্বান শুনি পেতে কান—
মহাবিশ্ব নিয়ত ডাকিছে জগৎবাসীরে
মিশাইয়া প্রাণ তার প্রাণে
সাড়া দিতে তোমার আহ্বানে।
তব শক্তি তোমার চেতনা হতে
জগতের প্রাণী যত লভিতেছে আপনার
শক্তি ও চেতনা অবিরত।
কিন্তু তারা জানে না তোমায়—
তোমার আহ্বান তাই শুনিতে না পায়।
হে মহান, তোমার আহ্বান যার শ্রবণে পশেছে
ক্ষুদ্র গৃহাঙ্গন পারেনি তাহারে
বাঁধিয়া রাখিতে—
গেছে চলি তোমার আহ্বানে সাড়া দিয়া
গৃহের বাহিরে মহাবিশ্বের অঙ্গনে।
তুমি আছ জগৎবাসীর অন্তর মাঝারে
বাহিরে রয়েছ তুমি মহাবিশ্বের অন্তরে
ওতপ্রোত হয়ে—
তুমি আছ সর্বত্র ব্যাপিয়া,
তোমারে জানিতে ব্যাকুল হয়েছে মোর হিয়া।

হে মহা-আনন্দময়, তোমার আহ্বানে
সাড়া দিতে পারি যেন—
সেই শক্তি দাও মোর প্রাণে,
তব অনুভূতি দিয়া ভরি দাও আমার হৃদয়,
তোমার পরশ দানে
আমার জীবন
পূর্ণ করি লও।

রজনীগন্ধা

শ্বেতবর্ণ ঋজুকায় রজনীগন্ধা ফুল
সৌরভে মাতায় অলিকুল।
রাতের বাতাস আকুলিয়া
ফোটে ফুল মুগ্ধ করি হিয়া।
প্রভাত রবির উজ্জ্বল কিরণে
হেরি তারে নয়ন ভরিয়া—
গুচ্ছ গুচ্ছ শ্বেতপুষ্প স্নিগ্ধ সমীরণে
উঠিছে দুলিয়া।
মধুলোভী ভ্রমরেরা দলে দলে উড়ে আসে
রজনীগন্ধার গন্ধে আকুল হইয়া—
গুন গুন রবে গুঞ্জরিয়া
রত হয় মধুপানে আনন্দে মাতিয়া!
অনুপম রজনীগন্ধারে—
ব্যবহার করে কেহ প্রিয়-উপহারে।
শ্রাদ্ধবাসরেও দেখা যায়
রজনীগন্ধার সমাদর—
উৎসব সজ্জায় আনে এই ফুলে করিয়া আদর।
গৃহের সজ্জায় পুষ্প-পাত্রে রজনীগন্ধারে দেখা যায়—
এ ফুলের ব্যবহার সর্বত্রই নয়ন জুড়ায়!
দেবতার পূজার লাগিয়া
হয়নি এ ফুলের জনম—
গাছ আলো করি ফুটি
জন্মদাতা বিধাতার পায়ে
সৌরভের অর্ঘ্য দিয়া আপনারে করে নিবেদন।
সার্থক করিয়া তোলে আপন জীবন।

কাকের বাসা

চৈত্র-শেষে কাক দলে দলে
খড়কুটা কুড়াইয়া আপন আপন
বাসা বুনি চলে।
গাছের শাখায় রচে তারা
আপন কুলায়।
বহু যত্নে বাসা শেষ করি—
কাকমাতা সে বাসায় বসে স্থির হয়ে
সন্তানের কামনায় ডিম পাড়ে
বসি সে কুলায়ে।
এই ডিমে বসি কাকমাতা
তাপ দিবে ডিমে অবিরত—
সে তাপ পাইয়া ধীরে ধীরে
শাবকের দেহ ডিমের ভিতরে হবে
সম্পূর্ণ গঠিত।
অতি ধৈর্য ধরে কাকমাতা তাপ দেয়
সারাদিন ডিমের উপরে—
মাত্র একবার তারে আহারের তরে
ডিম ছাড়ি উড়িয়া যাইতে হয়
বাসার বাহিরে।
ডিমের ভিতরে শাবকের দেহ পূর্ণরূপে
গঠিত হইলে—
জননী তাহার অনুভবে বুঝিয়া লইবে।
অতি সাবধানে ঠোঁট দিয়া
ডিম ফাটাইয়া
শাবকেরে মুক্ত করি লবে।
ক্বচিৎ কখনও কোকিলেরা কাকের বাসায়
ডিম পাড়ি যায়—
কাক জননীর অজানায়।
বোকা কাকমাতা আপন ডিমের সনে
অতি যত্নে কোকিলের ডিমে
তাপ দিয়া ফুটাইয়া তোলে।
কাকের বদলে কোকিল শাবকে যবে
দেখিবারে পায়—
ক্রুদ্ধ কাকমাতা ঠোঁটের আঘাতে
তারে বাহিরে তাড়ায়।

মাতৃহারা কোকিলশাবক
কখনও বাঁচিয়া থাকে—
কভু মারা যায়।
স্বার্থমগ্না কোকিলজননী
বাৎসল্যের স্বাদ নাহি জানে—
বিধি তারে বঞ্চিত করেছে
মাতৃস্নেহ দানে।

চিত্র

পুরাকালে জমিদারগণ তৈলচিত্র করাতেন
আপন আপন—
শিল্পীগণে আনি ঘরে করিয়া যতন।
সাধারণে এ খরচ পারিবে না করিতে বহন—
শুধুমাত্র ধনীগৃহে এইরূপ চিত্র অঙ্কনের
প্রথা আছিল তখন।
বিবিধ বর্ণের সমাহারে হত এই চিত্রের সৃজন—
দেহের সমান আয়তনে করা হত
এ চিত্র অঙ্কন।
গৃহে পশি সহসা এ চিত্র দরশনে
কভু বা হইত ভ্রম—
বুঝি গৃহস্বামী দাঁড়াইয়া
আছেন সামনে।
সে যুগ নিঃশেষ হয়ে গিয়েছে এখন—
সেই সব শিল্পীদের খুঁজিয়া বাহির করা
যাবে না কখন।
নূতন যুগের সৃষ্টি নূতন নিয়ম—
দেহ অনুলিপি যন্ত্র হয়েছে সৃজন।
যন্ত্রের সুমুখে স্থির হয়ে বসিতে হইবে
শান্ত ধীর মুখচ্ছবি যন্ত্রের মাঝারে
প্রতিবিম্বিত হইবে।
এ ছবিরে ফটোগ্রাফ বলে সব লোকে জানে—
দেশে দেশে এই অভিনব চিত্রগ্রহণের
প্রথা হয়েছে এক্ষণে।

বিগত জনের মুখচ্ছবি ফটোগ্রাফে ধরা রহিয়াছে—
পুত্র-পরিজন সেই ফটোগ্রাফ মাঝে
নিয়তই তাঁহারে স্মরিছে।
এইরূপে বিদেশে চলিয়া গেছে যারা
তাহারাও হইবে না হারা—
ফটোর মাঝারে নিয়ত পাইবে তাহাদের
নিজ আত্মীয়েরা।
বর্তমান যুগে এই ফটো উন্নতির শিখরে উঠেছে—
রঙীন রঙীন ছবি দিয়া চিত্রনাট্য
সৃজিত হয়েছে।
আরও অভিনব যন্ত্র টেলিভিশনের মাঝে
চিত্রের চরমতম বৈচিত্র্য বিরাজে!
চিত্র আজ শুধুমাত্র প্রাণহীন প্রতিবিম্ব নয়—
জীবন্ত মানুষরূপে আজ এ চিত্রের পরিচয়।
বিগত যুগেতে আর বর্তমান যুগে
যত শিল্পী জন্ম লভিয়াছে—
সৃষ্টিকর্তা বিধাতার চেতনা ও শক্তি
লয়ে তাহারা জন্মেছে!
আজিকার চিত্রশিল্প বিশ্বের বিস্ময়—
বিধাতার শক্তি ছাড়া
অন্য কিছু নয়।

কাঁঠাল

গরমের অন্যতম ফল কাঁঠাল রসাল—
স্বর্ণবর্ণ সুগোল গড়ন রসেভরা কোষগুলি
অতি অনুপম।
কোষের মাঝারে বড় বড় বীজগুলি আছে—
এই বীজ হতে কাঁঠাল গাছের জন্ম হয়।
সুস্বাদু সুন্দর এই বীজ
রন্ধনেতে ব্যবহার হয়।
কাঁঠালের গাছ অতি দীর্ঘ নয়—
বড় বড় ঝোপাকৃতি গাছ
সমতল দেশে বেশি হয়।

হরিৎ চিক্কণ গোল গোল কাঁঠালের পাতা
সুন্দর গড়ন অতি মনোরম।
গ্রীষ্মকালে কাঁঠাল গাছের শাখা আর বৃক্ষকাণ্ড
কাঁঠালের ফুলে ভরি যায়—
গাছের শিকড় সহ সারা গাছে
কোন স্থান বাদ নাহি রয়।
নধর সুন্দর কাঁঠালের ফল
বৃক্ষকাণ্ডে থাকে যবে ঝুলি—
মনে হয় বুঝি মা'র কোল আঁকড়িয়া
বসিয়া রয়েছে শিশুগুলি।
দেবতার ভোগে কাঁঠালের সমাদর
সব ফল আগে—
নারায়ণ আর শনিঠাকুর পূজায়
কাঁঠাল রসের "সিন্নি"
সর্বত্রই দেখা যায়।
সুস্বাদু ফলের মাঝে সুপক্ক কাঁঠাল অন্যতম—
সকলে মানেন এই রসাল
কাঁঠাল অতুলন।

চোর

চোরের জীবন দুঃখের ভীষণ—
সারাটা জীবন চুরি করে আর জেল খেটে
ভুলেছে সে শান্তির জীবন।
লোভ আর অভাবের বশে
পরের জিনিস চুরি করা
অভ্যাস হয়েছে ক্রমে তার—
সে অভ্যাস ছাড়িতে পারে না আর।
সুপথে থাকিয়া কায়ক্লেশে দিন কাটাইতে
ইচ্ছা তার হইবে না কোন মতে।
চুরির অভ্যাস ছাড়িতে না-পেরে
জীবন ভরিয়া শুধু জেল খেটে মরে।
যতবার জেল থেকে ছাড়া পেয়ে বাহিরে আসিবে—
পুনরায় চুরি করি জেলে ঢুকে যাবে।
শিশুকাল হতে সুশিক্ষা না-পেলে
জীবন ভরিয়া দুঃখ ঘটিবে কপালে।

শিশুর সমাজ-শিক্ষা হয় শৈশবেতে—
পিতা ও মাতার কাছ হতে।
উচিত ও অনুচিত কাজের মাঝারে
পার্থক্য কোথায়—
পিতামাতা শিক্ষা দিয়া শিশুরে জানায়।
শৈশবে সুশিক্ষা পেলে সারাটা জীবন
কেটে যাবে শান্তি আর আনন্দের মাঝে।
কিন্তু যদি কুশিক্ষা লইয়া চলে সংসার জীবনে
কোনজন—
দুঃখ ও বেদনা লাভ হবে তার
ভরিয়া জীবন।
অনাথ শিশুরা কখনও বা কুশিক্ষা হইতে
চলে যায় ধীরে ধীরে অন্যায়ের পথে।
মাতা-পিতৃহারা শিশুর জীবন—
কখনওই সুষ্ঠুরূপে হয় না গঠন।
সুশিক্ষা পাইয়া সুপথে চলিলে
দুঃখভোগ হবে না তাহার
কোন কালে।
ভাগ্যবান সুখ লভে জীবন ভরিয়া—
দুর্ভাগারে দুঃখ-কষ্ট
লইবে টানিয়া।

বার্ধক্য

মানুষের জীবনের তিনটি প্রহর—
বার্ধক্য যৌবন আর শৈশব সুন্দর।
প্রথম শৈশবে মাতে শিশু
খেলাধূলা নিয়ে।
খেলার সহিত লেখাপড়া শুরু করে
ক্রমে বড় হয়ে।
তারপরে কৈশোর লভিয়া—
খেলার সহিত দেহচর্চা শিক্ষা করে
আনন্দে মাতিয়া।
পড়াশুনা সনে নীতিশিক্ষা দেয় গুরুজনে।
ধীরে ধীরে সে কিশোর আসিয়া দাঁড়ায়
জীবনের শ্রেষ্ঠকাল যৌবন সীমায়।

যৌবনে প্রবেশি উচ্চশিক্ষা করে সে গ্রহণ—
সুপথে থাকিয়া জীবিকা অর্জন তরে
করে সে চিন্তন।
ক্রমে পূর্ণ-যৌবনে প্রবেশ লাভ করি—
গ্রহণ করিতে হয় তারে সংসার জীবনে,
আসিয়া সংসারে জড়াইয়া পড়ে
সেথা সহস্র বন্ধনে।
দীর্ঘকাল সংসার জীবন কাটায় সে
সুখে-দুঃখে রোগে-শোকে আনন্দ-বেদনা ভরা
শান্তি আর অশান্তির মাঝে—
সংসার অঙ্গনে।
সংসার হইতে দূরে সরিয়া যাইতে
ইচ্ছা হয় তার মনে প্রাণে।
ক্রমে আসে নামি বার্ধক্য তাহার দেহেমনে—
শক্তির অভাব অনুভব করে প্রতিক্ষণে।
সৃষ্টিকর্তা বিধাতারে পড়ে তার মনে—
কাতরে স্মরণ করে দেহমুক্তি
দানিতে এক্ষণে।
রাত্রি-দিন বিধাতারে স্মরি
দেহমন তাঁর শ্রীচরণে করিয়া অর্পণ—
কাটাইতে হয় তারে দেহকষ্ট সহ্য করি
সমস্তটা বার্ধক্য জীবন।
কর্মফল ভোগ যতদিন শেষ না-হইবে—
দুঃসহ দেহের কষ্ট সহ্য করি
বাঁচিয়া থাকিবে।
কর্মফল ভোগ যবে শেষ হয়ে যাবে—
জীবনের পারে গিয়া মরণের মাঝে
শান্তি পাবে।
পুনরায় নবজন্ম তরে প্রস্তুত হইতে হয় তারে।
ফিরে ফিরে আসা আর যাওয়া
শেষ তার হবে না কখন—
মানুষের জীবনের ইহাই নিয়ম।

চৈত্র অবসানের বেলায়—
নব-বৎসরের আগমন ধ্বনিত হইল
এ ধরায়।
দিকে দিকে শাঁখ আর উলুধ্বনি রব
জাগিয়া উঠিল—
দেশবাসী নব-বৎসরেরে
স্বাগত জানাল।
বৈশাখ আসিল ধরা 'পরে—
উষ্ণশ্বাসে উত্তপ্ত করিয়া চরাচরে।
অরণ্য-প্রান্তরে দগ্ধ করি—
নিদাঘ আসিল রুদ্রবেশ ধরি
নগরে প্রান্তরে।
নদ-নদী তড়াগ সকল শুষ্কপ্রায় হইল ধরায়—
গরমের কষ্ট সহ্য করে শ্রাবণের
জলের আশায়।
গ্রীষ্মঋতু নববেশে আসিল এক্ষণে—
তাপক্লিষ্ট ধরাবক্ষে নব-কিশলয় আর
নবীন মঞ্জরী অঙ্কুরিত হয়ে
ভরি দিল বৃক্ষলতা বনে-উপবনে।
নবীন বৈশাখ নিয়ে এলো ধরণীতে নবীন আশ্বাস—
বিগত বৎসর যা-কিছু অপূর্ণ ছিল
এই ধরা 'পরে তাহারে পূর্ণতা দানি
করিবে সুন্দর।
অশুভে বিনাশি বিশ্বে মঙ্গল আনিবে—
জগৎবাসীরা শান্তি আর আনন্দ লভিবে।
সার্থক হইবে নব-বৎসরের আগমন—
ধন-ধান্যে পরিপূর্ণ হইবে ভুবন।

ময়ূর

পক্ষিকুলে ময়ূরের সমাদর রূপের লাগিয়া—
অপরূপ সুষমায় নাচে তারা
তরুশাখে পেখম মেলিয়া।
গুরুগুরু মেঘের গর্জন শুনি মেলিয়া পেখম—
নাচে আপনারে ভুলে,
পুচ্ছভরা লক্ষ আঁখি দোলে
তালে তালে।
ময়ূরপুচ্ছের শোভা অতি মনোহারী—
শিরের ভূষণ রূপে এই পুচ্ছ ধরেছেন
স্বয়ং শ্রীহরি।
রূপে মুগ্ধ হয়ে কুমার কার্তিক
করেছেন নির্বাচন —
ময়ূরেরে আপন বাহন।
সকল পক্ষীর ন্যায় ডিম হতে ময়ূর জন্মায়।
উত্তর ভারত ব্যাপী সমগ্র অঞ্চলে
ময়ূরেরা বসবাস করে দলে দলে।
পরম নির্ভয়ে আপনার খাদ্য অন্বেষিয়া
ঘুরিয়া বেড়ায় কুতূহলে।
বর্ষা ময়ূরের প্রিয় ঋতু—
মেঘের গর্জন শুনি ময়ূরের প্রাণ ওঠে নাচি।
বহুবর্ণ পেখম মেলিয়া নাচে ময়ূরীরে ঘিরি ঘিরি
আপনারে যাচি।
বিধাতার সৃষ্ট আপরূপ সুন্দর ময়ূর—
রূপের লাগিয়া জগৎ ভরিয়া সমাদর
পায় সে প্রচুর।
প্রাণের আনন্দে নাচে পেখম মেলিয়া—
মেঘের গর্জন সনে আপনা ভুলিয়া।
পক্ষিকুলে শ্রেষ্ঠ এই বিহগ ময়ূর—
কিন্তু তার কণ্ঠস্বর কেকারব .
ভীতি সনে বিস্ময় জাগায়,
অতীব কর্কশ রবে বনের মাঝারে
চিৎকার করিয়া বনেরে মাতায়।

গোলাপ

রূপে-গুণে অতুলন গোলাপের ফুল—
ভারতের গর্ব এ কুসুম জগতে অতুল।
সারাদেশে এই অনুপম গোলাপ জন্মায়—
রূপে আর সৌরভে এ ফুল জগৎ মাতায়।
সমতলে চাষ হয় বাগান ভরিয়া—
সৌরভে আকুল হয়ে ধায় অলিকুল উড়িয়া উড়িয়া।
সাদা লাল গোলাপী ও নানান বরন
অপরূপ এ কুসুম নয়নলোভন।
প্রিয়জনে হৃদয়ের প্রীতি জানাইতে—
গোলাপ কুসুম উপহার দেয় হৃষ্ট চিতে।
গৃহের শোভায় গুচ্ছভরি গোলাপ সাজায়—
স্নিগ্ধ সৌরভেতে গৃহের বাতাস ভরি যায়।
প্রভাত কিরণে গোলাপ বাগানে অনুপম শোভা দরশনে—
বিমুগ্ধ অন্তরে স্মরি গোলাপের জন্মদাতা
সেই ভগবানে।
সৌরভে আকুল হয়ে অলিকুল ধায়—
ফুলে ফুলে উড়ি বসে মধুর আশায়।
দেবতা-পূজায় গোলাপেরে কেহ নাহি চায়—
শতবিধ পুষ্প আছে পূজার লাগিয়া
বাগান ভরিয়া।
মনোবেদনায় গোলাপ জানায় দেবতার পায়ে—
আপন প্রাণের ভক্তি সৌরভের বিনম্র অর্ঘ্যেতে
নিবেদিত চিতে।

বঙ্গভূমি

ভারতমাতার স্নেহের দুলালী
তুমি বঙ্গভূমি
অন্য সব সন্তান হইতে
রূপে-গুণে শ্রেষ্ঠতমা তুমি।
রৌদ্রোজ্জ্বল হিমাদ্রিশিখর
রচে তব কনক-কিরীট সমুজ্জ্বল
নিম্নে সিন্ধুবারি ধোয়ায় নিয়ত
চরণযুগল।

শ্যামলিমা ভরিয়াছে সর্ব অঙ্গ তব
ফুল-ফল ধান্য শস্য জন্মিছে নিয়ত
অভিনব।
পুণ্যতোয়া ব্রহ্মপুত্র পূর্ব হতে পশ্চিমে নামিয়া
মিলিয়াছে ভাগীরথী সনে
তোমার সকল অঙ্গে স্নিগ্ধতা দানিয়া,
মিশিয়াছে তোমার চরণে
সাগরসঙ্গমে।
উত্তর সীমায় তব চা-পাতার চাষ
অতি মনোহারী
ধান্যশস্য আদি চাষে
রহিয়াছে মধ্যভাগ ভরি।
পশ্চিমের লালমাটি ভরি ওঠে মহুয়ার ফুলে
পূর্বদেশে যত চাষ হয়
কর্ণফুলী নদীর দু'কূলে।
আজ তব পুণ্যভূমি দ্বিখণ্ডিত হয়ে
বিচ্ছিন্ন করেছে তব সন্তানেরে
পূর্ব ঐক্য ভুলে।
বিদেশী শাসক স্বীয় স্বার্থসিদ্ধি তরে
ভরিয়াছে তব পুণ্যভূমি
জাতি বিদ্বেষের ঘৃণ্য হলাহলে।
হে বঙ্গজননী, তব পুণ্যক্রোড়ে
জন্মিয়াছে যুগে যুগে যত মহাজন—
শ্রীচৈতন্য শ্রীরামকৃষ্ণের মত
অবতার কত না-হয় বর্ণন।
আরও কত মহাজন লভিবে জনম
তব পুণ্যভূমে
সার্থক করিয়া তোমার জীবনেঁ

পদ্মফুল

দীঘির শীতল জলে ফুটিয়া রয়েছে
বিবিধ বর্ণের পদ্মফুল—
সুমিষ্ট সৌরভে প্রভাতের অলিকুলে
করিয়া আকুল।

গুন্‌গুন্‌ রবে অলি উড়িয়া উড়িয়া
ফুলে ফুলে মধুপান করিয়া বেড়ায়
প্রভাতের সমীরণে পদ্মের কোরকগুলি
হেলিয়া দুলিয়া পড়ে কুসুমের গায়ে।
অনুপম এই পদ্মফুল রূপে-গুণে ভুবনে অতুল—
দীঘি-জল আলো করি ফুটিয়া রয়েছে
দীঘি ভরি,
অপরূপ এ শোভার নাহি কোন তুল।
সুবিশাল পদ্মপত্র থালার আকার—
ভাসিয়া রয়েছে জলে
হাওয়ার দোলায় চলে,
কী অপূর্ব শোভার আগার।
শরৎ ঋতুতে ফোটে পদ্মফুল দীঘি আলো করি
শারদীয়া জননীর পূজার লাগিয়া
আসে পদ্মফুল ভার ভরি।
দেবী দুর্গা পর্বতদুহিতা
অতসী অপরাজিতা আর পদ্মফুলে
হন হরষিতা।
পদ্মের জনম সার্থক হইয়া ওঠে
পরশিয়া মায়ের চরণ।

টিয়াপাখি

বনচর টিয়াপাখি সবুজ বরন
ঝাঁকে ঝাঁকে উড়ি আসি ফসলের ক্ষেত নাশি
করি যায় উদর পূরণ।
ভরা পেটে উড়ি যায় আনন্দে মগন।
বনচর পাখি যত বনে শোভা পায়
বন হতে ধরি আনি মানুষ তাহারে
পুরিবে খাঁচায়।
বন্দী পাখি মুক্তি লাগি অধীর চেষ্টায়
ডানা ঝাপ্টায়—
অবশেষে নিরুপায় দাঁড়ে বসি জল-ছোলা খায়।

উজ্জ্বল সবুজ বর্ণ টিয়াপাখি দল
তীক্ষ্ণ বাঁকা লাল ঠোঁট দিয়া ফসল কাটিয়া খায়
যত নিজে খায় তার বহুগুণ মাটিতে ছড়ায়।
নিরুপায় কৃষকেরা করে হায় হায়।
বনচর স্বাধীনজীবন ময়না ও টিয়াপাখিগণ
খাঁচায় বন্দী হয়ে হয়ে যায় বিষাদমগন।
বনের পাখিরে বন হতে ধরি আনি
বন্দী করা এক মহাপাপ
যাহারা বোঝে না ইহা তাহারা পাখিরে বন্দী করি
আপন জীবনে নানাভাবে পায়
শুধু দুঃখ মনস্তাপ।
বিধাতা গড়িয়াছেন এই পাখিদের স্বাধীন করিয়া—
নৃশংস মানুষ সে স্বাধীন জীবে
বন্দী রাখে খাঁচায় পুরিয়া।
তার এই অন্যায়ের ফল
লভিতে হইবে তারে আপন জীবনে—
বন্দী-জীবনের দুঃখভোগ হতে
মুক্তি তার হবে না কখনও।

জানালা

মানুষেরা আপনার তরে কুটীর তৈয়ার করে
রোদ-বৃষ্টি-ঝড় হতে রক্ষা পাইবারে।
সেই গৃহে আলো-হাওয়া প্রবেশের লাগি
দরজা ও জানালা বসায় চারিধারে।
বাহিরের আলো-হাওয়া অবাধ-গতিতে
প্রবেশে তাহার গৃহে—
জানালা ও দরজার পথে।
জানালা হইতে দেখা যায় বাহিরের উন্মুক্ত প্রকৃতি—
আকাশ ও পাখি তরুলতা মাঠ-বন-নদী
পথ আর পথিকের চলিবার গতি।
দূরে নারিকেল গাছে নারিকেল ফলিয়াছে
আমগাছে কচি আম দুলিতেছে হাওয়ার দোলায়
কাক আর শালিকেরা আহারসন্ধানে
গাছে গাছে উড়িয়া বেড়ায়।

ঘন নীল আকাশের গায়ে ছোট ছোট কালো পাখি
সারাদিন উড়িয়া বেড়ায়
কাক-চিল কিংবা অন্য পাখি
বোঝা নাহি যায়।
জানালার মাঝে বাহির-জগৎ প্রকাশিছে
চড়ুই পাখিরা গাছে গাছে উড়িয়া বেড়ায়
ছোট ছোট পোকা আর কচিপাতা খায়।
মাটিতে নামিয়া দলে দলে অপূর্ব কৌশলে
বালি-স্নান করে তারা মহা কোলাহলে।
দূরে নিমগাছের শাখায় নিমফুলগুলি দোলে
হাওয়ার দোলায়।
অদূরে জামের গাছে কাক বাসা বাঁধিতেছে-
খড়-কুটা কুড়াইয়া ডিমের আশায়।
সন্ধ্যাবেলা বসি জানালায়—
শুকতারা ওঠে ফুটি আকাশের গায়,
একে একে তারাদল আঁখি মেলি চায়।
রাতের গভীরে উজ্জ্বল নক্ষত্ররাজি
আকাশ ভরায় নিজ মহিমায়।
ঘরে বসি জানালার মাঝে
প্রকৃতির বিচিত্র পরশে
প্রাণমন পূর্ণ হয়ে যায়।

গাড়ি

রাজপথ বাহি চলিতেছে শত শত গাড়ি
বাস ট্রাম সাইকেল রিক্‌শা ও লরি,
কত রকমারি।
সকাল হইতে শুরু করি বিরাম হয় না রাতভরি—
মানুষের প্রয়োজনে গাড়িগুলি ছুটিয়া বেড়ায়,
প্রয়োজন কভু না ফুরায়।
চাকা আবিষ্কার প্রথম আসিয়াছিল মনেতে কাহার?
কীরূপে হইল এই চাকা আবিষ্কার?
ধন্য সেই অজানা পুরুষ
প্রথম-চাকার জন্মদাতা,
সেই আবিষ্কার হতে প্রকাশিল আজিকার
এই মানব সভ্যতা।

দুই-চাকা হতে শুরু করি
তিন-চাকা চার-চাকা বহু-চাকা কত শত গাড়ি
চলিয়াছে অবিরাম রাজপথ ধরি,
দিনে দিনে উন্নত আকারে
চড়িতেছে উন্নতি শিখরে!
সুসভ্য মানবগণ করিতেছে নিত্য নব গাড়ির সৃজন।
গাড়ির কল্যাণে দূর আর দূর রহে নাই—
নিকট হইয়া গেছে আজ সব ঠাঁই।
পুরাকালে পদব্রজে তীর্থ-দরশন করিত মানবগণ
বহু কষ্ট করিয়া স্বীকার
অন্তরে গোপন আশা পুণ্য লভিবার।
গাড়ির সহায়ে আজ পুণ্যলাভ হইয়াছে সহজ ব্যাপার!
বিধাতার শ্রেষ্ঠ সৃষ্টি আজিকার এ মানুষগণ
অভিনব আবিষ্কারে করিতেছে
অসাধ্য সাধন!

কৃষ্ণপক্ষ

পূর্ণিমা নিশার অবসানে কৃষ্ণপক্ষ ধরণীতে নামে
প্রতিদিন এক কলা করি হ্রাস পায় চাঁদ,
ক্রমে আসে অমানিশা রাত।
ঘন ঘোর অন্ধকারে ব্যাপ্ত করি চরাচরে
জল স্থল মহাশূন্যে রহে না তফাৎ!
এ ঘোর নিশায় মহাকালী মহাকাল বুকে
মাতেন লীলায়—
সুগভীর তমসায় ধরাতল ছেয়ে যায়
পক্ষিকুল নীরব হইয়া যায় বৃক্ষের শাখায়,
স্তব্ধ সারা দিক্‌দেশ আঁধারে বিলীন
ধরাবক্ষ আলোক-বিহীন।
ঊর্ধ্বে আকাশের গায়ে তারাদল সভয়ে তাকায়—
আঁখি মেলিবার বুঝি সাহস না পায়।
একমাত্র শুকতারা সমুজ্জ্বল আঁখি মেলি
ধরাপানে চায়!

আঁধারের মহিমায় গ্রাসিয়াছে ধরা
ঊর্ধ্বে মহাকাশ তারায় তারায় হইয়াছে হারা।
এই আঁধারের রূপ ধরিয়াছে অপরূপ
মুরতি মহান—
স্তব্ধ বিস্ময়ের মাঝে হারাইয়া যায় মনপ্রাণ।
স্রষ্টার বিচিত্র সৃষ্টি আঁধার ও আলোকেতে ভরা—
বিপরীত দুই রূপে পরিপূর্ণ রহিয়াছে ধরা।
শুক্ল আর কৃষ্ণপক্ষ তাহারই প্রতীক
অখণ্ড সৃষ্টির দুই বিপরীত দিক।

শঙ্খ

সমুদ্র অতলে শঙ্খকীটের জনম
তার সুকোমল দেহ-রক্ষাকারী
কঠিন যে শ্বেত আবরণ,
তাহারেই শঙ্খ বলি জানে বিশ্বজন!
শঙ্খের মুখেতে ফুৎকারিলে—
শান্ত সুগম্ভীর ধ্বনি বাজে কর্ণমূলে।
মনে হয় শঙ্খের নিনাদ দিল আনি
অপরূপ সুগম্ভীর ওঁকার ধ্বনি।
দেবতার পূজার অঙ্গনে
শঙ্খের নির্ঘোষ মঙ্গল বারতা
বহি আনে।
যত পুণ্য-অনুষ্ঠান সর্বত্রই শঙ্খের সম্মান।
আপদে-বিপদে হিন্দুগণ—
শঙ্খধ্বনির নির্ঘোষে তাহা
করেন ঘোষণ।
প্রতি হিন্দু ঘরে মঙ্গল শঙ্খেরে
রাখা হয় যত্ন সহকারে।
গৃহসজ্জায় আর নারীর ভূষণে
শঙ্খ ব্যবহৃত হয় সুপবিত্র জ্ঞানে।
জীবনে মরিয়া শঙ্খকীট ধন্য হয়।
দেবতার করুণা লভিয়া।
ধন্য শঙ্খ "পাঞ্চজন্য" শ্রীকৃষ্ণ যাহারে
করিয়া ধারণ—
করেছিল নিয়ন্ত্রণ কুরুক্ষেত্র মহারণ।

শ্রীবিষ্ণু স্বয়ং শঙ্খ আপনার করে
করেন ধারণ
সার্থক করিয়া শঙ্খের সৃজন।

সংসারী

মানুষেরা সংসারে জন্মিয়া সংসার আবর্তে পড়ি থাকে
ভগবানেরে ভুলিয়া।
শৈশব জীবনে ব্যাকুল হইয়া খুঁজিয়া বেড়ায়
আপনার মাতা ও পিতায়।
বাল্যকালে জননীরে চায় আর খেলাধূলা
লয়ে মাতি রয়।
কৈশোর বয়সে আপনার বিদ্যাভ্যাস আর
খেলা মাঝে কাটায় সময়।
ক্রমে ক্রমে যৌবন-উন্মেষে সংসারে প্রবেশ করিবারে
আকুলতা বাড়ে।
সংসার জীবনে পুত্র-কন্যাগণেরে লইয়া
বিব্রত হইয়া রহে ভগবানেরে ভুলিয়া।
জীবনের একমাত্র স্থান এই সংসার অঙ্গন
প্রাণপণে চেষ্টা করে ভোগ করিবারে আনন্দে মাতিয়া
এই সংসার জীবন।
মানব জন্মের সার্থকতা ভগবান লাভে—
এই মহাসত্য ভুলি কাটায় জীবন সংসার মাঝারে
পুত্র-কন্যা আত্মীয়জনেরে লয়ে বিব্রত হইয়া,
আপনার জীবনের উদ্দেশ্য ভুলিয়া।
মৃত্যুকালে কাতর অন্তরে গৃহ-পরিজন তরে
ব্যাকুল হইয়া চিন্তা করে
ভগবানে রহে সে ভুলিয়া।
অবশেষে কাল প্রবেশিয়া লয়ে যায় তাহারে টানিয়া।
অবিদ্যার সংসারের এই পরিণতি—
যাহা হতে কভু সে-ই পায় না মুকতি।
কিন্তু জ্ঞানী যারা বিদ্যার সংসার করে তারা।
রাজর্ষি জনক করিয়াছিলেন নিজে
বিদ্যার সংসার জ্ঞান আর কর্মের মিলনে।
আজিকার লোক কেহ

তাহা নাহি জানে।
বিদ্যার সংসার যারা করে
একহাত ঈশ্বরের চরণে রাখিয়া
অন্য হাতে সংসার করিবে অনিত্য জানিয়া।
নিত্যসত্য একমাত্র ভগবানে
স্মরণ রাখিয়া চলিবে সত্যের পথে
জীবন ভরিয়া।

সন্ন্যাসী

জন্মকাল হতে সংসার যাহার কাছে
মিথ্যা মনে হয়—
সংসারী হইতে নাহি চাহে যার মন,
নিত্যসত্য ভগবানে করে অন্বেষণ
প্রাণমন দিয়া,
তাহারে সকলে জানে সন্ন্যাসী বলিয়া।
যোগভ্রষ্ট হয় যেই জন—
সামান্য ভোগের লাগি পুনঃ সংসারে অসিতে
হয় তারে সেই ভোগ করিতে গ্রহণ।
তাহারাই আজন্ম সন্ন্যাসী রূপে
লভয়ে জনম।
সংসারে থাকিয়া অনাসক্ত মনে—
দিন কাটে তাহাদের ঈশ্বর-চিন্তনে।
সংসার তাদের কাছে পাতকুয়া বলি মনে হয়—
আত্মীয়-স্বজনে কালসাপ বলি জানে,
সভয়ে চলিয়া যায় সংসার ত্যজিয়া
অনাসক্ত উদাসীন মনে।
যেই ভোগ লাগি তার জন্ম হইয়াছে
সে ভোগের নিবৃত্তি হইলে তার
দেহনাশ হবে।
দেহমুক্তি লভি সে সন্ন্যাসী
ঈশ্বরের স্বরূপে মিলিবে।

কালোজাম

সুরসাল ছোট ছোট কালো জামগুলি
জ্যৈষ্ঠের বাতাসে দুলি দুলি
পড়িতেছে টুপ্‌টাপ্‌ গাছের তলায়—
কাক আর বুলবুলি ঠুক্‌রিয়ে খায়।
নিদাঘের দ্বিপ্রহরে রসেভরা কালোজাম খেলে—
দেহ-মন হতে সব ক্লান্তি যায় চলে।
পাখিদের তরে গাছে গাছে কালোজাম ধরে—
মানুষেরা গাছতলা হতে
সেই জাম কুড়াইয়া খায়!
গাছে উঠি পারিতে লাগিলে
পাকা জাম টুপ্‌টাপ্‌ নিচে পড়ি যায়।
সুবিশাল বৃক্ষশাখে হয় এই জামের ফলন—
উজ্জ্বল-চিক্কণ ডিম্বাকৃতি পাতাগুলি
অতি মনোরম।
জাম ফুল গাছে যবে ফোটে—
মৌমাছি দল আসি জোটে।
কচি জাম সবুজ বরণ থলো থলো
ঝুলি থাকে গাছের শাখায়—
পাকিবার পর কৃষ্ণবর্ণ আঙুরের মত
শোভা পায়!
গ্রীষ্মকালে এই দেশে যত ফল ফলে—
কালোজাম অবশ্যই তাহাদের দলে।
দেবতা পূজায় কালোজাম শোভা পায়—
সুরসাল এই ফল দেবতার ভোগে
আনন্দ যোগায়।

হংসরাজ ফুল

বসন্তের বিদায়-লগনে হংসরাজ
ফুলের মুকুল ছুরির ফলার মত
মাটি ভেদ করি ওঠে—
হরষেতে হইয়া আকুল।

দিনে দিনে বাড়ি একহাত প্রায়
উঁচু হইয়া দাঁড়ায়—
প্রতিটি বোঁটায় গেরুয়া বরন
অপরূপ ফুল শোভা পায়।
হংসরাজ ফুল সৌন্দর্যে অতুল—
গুচ্ছভরা ফুলগুলি ফুটি ওঠে একসাথে
অশান্ত ভ্রমরগণে করিয়া আকুল।
ছোট ছোট সানাইয়ের মত হংসরাজ ফুলের মাঝারে
হলুদ পরাগরেণু মন মুগ্ধ করে।
ক্রমে সেই ফুলে ঘিরি ছুরির মতন
দীর্ঘ পাতাগুলি মাথা তোলে
একে একে রূপে অনুপম।
গুচ্ছভরা হংসরাজ ফুলে ফুলদানি সাজাইয়া রাখে
ঘরের সৌন্দর্য বৃদ্ধি তরে।
এই পুষ্পে গুচ্ছভরি দেয়া হয় প্রীতি উপহারে।
দেবতা পূজায় হংসরাজ ফুল
শোভা পায়—
অতি মনোরম এই ফুলের জনম
দেবতার তরে—
যাঁহার চরণ-স্পর্শ লভি
ধন্য হয় এ কুসুম
চিরদিন তরে।

তুলসী

তুলসী গাছেরে নারায়ণ-জ্ঞানে পূজা করে
হিন্দুগণ ভক্তিযুত মনে।
সকল রকম দেবতা-পূজার তরে
ব্যবহার করে সবে দূর্বা-বিল্বপত্রসহ
তুলসী পাতারে।
গঙ্গাজল সম সুপবিত্র তুলসী গাছেরে
গৃহ আঙিনায় মঞ্চ রচি তাহাতে বসায়।
স্নান করি পবিত্র অন্তরে
তুলসীর মূলে জল ঢালি—
নিত্য পূজা করে।

প্রতি গৃহস্থের ঘরে তুলসীর গাছ রাখে
যত্ন সহকারে—
সন্ধ্যাকালে ধূপ-দীপ জ্বেলে
প্রণাম জানায় তুলসীর মূলে।
মৃত্যুপথযাত্রীদের শিয়রের ধারে—
পরিজনগণ রাখে তুলসী গাছেরে।
তুলসীপাতায় গঙ্গাজল লয়ে
ফোঁটা ফোঁটা দেয় তার শুষ্ক ওষ্ঠাধরে।
মনে ভাবে যত জনগণ—
মৃত্যুকালে তুলসী-পরশে
নিশ্চিত লভিবে সেই শ্রীবিষ্ণুচরণ।
সূর্যগ্রহণের কালে জল আর খাদ্য যাহা থাকে—
পবিত্র তুলসীপাতা তাহার উপরে দিয়া রাখে।
যার ফলে গ্রহণের দোষ নাহি থাকে।
দেবতা-পূজার তরে তুলসী জন্মায়
ধরা 'পরে—
আমরণ পরশিয়া দেবতাচরণ
সার্থক হইয়া ওঠে
তাহার জনম।

প্রদীপ

সন্ধ্যাকালে ঘরে ঘরে
প্রদীপ জ্বলিয়া ওঠে
আলোকের তরে।
বহুতর প্রদীপের ব্যবহার আছে—
দেশে দেশে মানুষের কাছে।
আদিযুগে আলোর লাগিয়া
মশালের ব্যবহার ছিল প্রচলিত—
ক্রমে তাহা হতে প্রদীপ সৃজন
হয়ে চলিল নিয়ত।
তারপর ধীরে—
হ্যারিকেন ব্যবহার
হল ঘরে ঘরে।

আরও পরে—
গ্যাসের সৃজন হল
আলোকের তরে।
ক্রমে এলো হ্যাজাক্ ডেলাইট বাতি—
সর্বশেষে বিদ্যুতের আলো আসি
রাতের আঁধারে দিল নাশি!
সারাদেশব্যাপী আজ বিদ্যুতের ব্যবহার
আলো আর হাওয়া দানে—
মানুষের জীবনেতে
তৃপ্তি দিল এনে।

উপনয়ন

ব্রাহ্মণ সন্তানগণ এগার ও তের বৎসরেতে
দ্বিজত্ব লাভের আশে যজ্ঞসূত্র করেন ধারণ।
মাঙ্গলিক এই অনুষ্ঠান সমাজ-বিধান অনুসারে—
"উপনয়ন" বলে তারে।
কিশোর ব্রাহ্মণপুত্র যথাবিধি যজ্ঞসূত্র
করিয়া ধারণ করেন পালন তিনদিন
সুকঠোর দন্ডীর নিয়ম।
অনুষ্ঠান শেষ হলে পরে প্রতিদিন তারে
ত্রিসন্ধ্যা জপিতে হবে গায়ত্রীর পুণ্যমন্ত্র
শ্রদ্ধা সহকারে।
ব্রাহ্মণসন্তান এইরূপে ব্রাহ্মণ বলিয়া
পরিচিত হইবে সমাজে।
যাগ-যজ্ঞ-পূজা আদি যত মাঙ্গলিক কাজে
জন্মিবে তাহার অধিকার—
যেই অধিকার রহিয়াছে তাহার পিতার।
বর্তমান এই কলিযুগে ব্রাহ্মণগণের উপনয়নের
এই প্রথা প্রচলিত আছে।
কিন্তু এইরূপে যথার্থ ব্রাহ্মণ
কেহ পারে না হইতে।
যথার্থ ব্রাহ্মণ হবে সেই জন—
আপন জীবনে করিয়া সাধন
ব্রহ্ম-অনুভূতি যার হইবে অর্জন।

এ ঘোর কলিতে সকল নিয়ম সর্ব অনুষ্ঠান
প্রাণশূন্য আচারসর্বস্ব প্রায়
হইয়া গিয়াছে।
তাই আজ আর যথার্থ ব্রাহ্মণ
কোথা নাহি দেখা যায়—
যুগের নিয়ম মানি আজিকার এ ব্রাহ্মণ
লয়ে সমাজে সকল অনুষ্ঠান
নির্বাহিত হয়।

বন্ধু

উৎসবে সঙ্কটে রাজরোষে আর শ্মশানভূমিতে
একান্ত আপন রূপে স্বার্থশূন্য যেই জন
সঙ্গে সঙ্গে থাকে—
বন্ধু বলি তাকে।
জনক-জননী দুই জনে প্রত্যেক জাতক
শ্রেষ্ঠ বন্ধু বলি মানে।
তারপর ভাইবোনে—
পরস্পর বাঁধা থাকে নিঃস্বার্থ বন্ধনে।
সংসার-জীবনে চলাকালে ভাগ্যগুণে
কখনও বা নিঃস্বার্থ সরলপ্রাণ বন্ধু
যায় মিলে।
দ্বৈত জীবনেতে কাহারও কখনও
জীবনসঙ্গিনী হয় বন্ধু শ্রেষ্ঠতম।
কখনও কাহারও নিজপুত্র সর্বশ্রেষ্ঠ
বন্ধুরূপে হয় পরিণত।
নিঃস্বার্থ সরল প্রাণ লয়ে দাঁড়ায় যে
দুখে-দুঃখে পাশে সর্বক্ষণ—
সর্বশ্রেষ্ঠ বন্ধু তিনি হন।
ভাগ্যগুণে কাহারও জীবনে এইরূপ বন্ধু যায় মিলে।
কিন্তু মানুষের ক্ষমতা সীমিত—
শুভ ইচ্ছা থাকিলেও সাধ্য নাহি হয়।
করিতে বন্ধুর হিত।

বয়সের পরিণতি সনে জাগে মনে—
শ্রেষ্ঠ বন্ধু একমাত্র ভগবান হন,
তাঁহারে স্মরিয়া তাঁহার উপরে
সর্বভার সমর্পিয়া শান্ত চিতে
কাটিবে জীবন।
তিনি ছাড়া বন্ধু আর নাই কোন জন।

আকাশের রঙ

আকাশের রঙ ফেরে প্রহরে প্রহরে—
সকাল হইতে সন্ধ্যা দিনে বহুবারে।
প্রভাত-আকাশ ভরি থাকে শুভ্রবর্ণ নীলের আভাসে,
ক্রমে পূর্বগগনের রক্তিম অরুণচ্ছটা
তাহারে বিনাশে।
সূর্যের উদয় আর বিলয়ের সাথে
আকাশের রঙ থাকে বদল হইতে।
এ পরিবর্তন স্পষ্ট হয় আকাশে চাহিলে—
বিচিত্র এ লীলা আকাশের
সারাদিন চলে।
আকাশের গায়ে কিন্তু কোন রঙ নাই
দূর হতে দেখি রঙ ভ্রম হয় তাই।
যেমন সাগর-জল কালো রঙ মনে হয়।—
হাতে জল তুলি দেখি কোন রঙ নাই।
সেইরূপ দূরের আকাশ সারাদিন নানা রঙ ধরে—
কিন্তু আকাশের যেই অংশ রহিয়াছে
ঘরের ভিতরে কিংবা আঙিনায়—
তার দেখি কোন রঙ নাই।
আকাশ কেবলি শূন্য কোন রঙ নাই—
দৃষ্টির সীমায় তার সীমা খুঁজে পাই।
নীল রঙ যাহা দেখি সে-ও ভ্রম শুধু—
বর্ণহীন মহাশূন্য করিতেছে ধু-ধু।

রামধনু

বর্ষার আকাশতলে সহসা কেমনে
জেগে ওঠে রামধনু গগনের কোণে।
সাত রঙা অর্ধ-গোলাকার
অপরূপ রূপ দেখি তার।
সূর্যের সাতটি রঙ বরিষার মেঘে
রামের ধনুর মত অপূর্ব শোভাতে
রয় জেগে।
কে দিয়েছে এই নাম কবে কী কারণে?
ভাবি মনে মনে।
ত্রেতাযুগ-অবতার শ্রীরামের হাতে—
ভেঙেছিল হরধনু জনক-সভাতে।
যার ফলে জানকীরে লভিলেন রাম—
রামধনু দেখি আজ রামে স্মরিলাম।
সূর্যের অনল-তলে কী অপূর্ব সাত রঙ জ্বলে—
বেগুনী ও ঘননীল আর শুধু নীল
হরিৎ হলুদ কমলা ও লাল মিলে
ধরেছে কী অনুপম শোভা
গগনের তলে।
বিধাতা রচিয়াছেন এ জগৎ ভরি
কত রূপ কত শোভা কিবা মনোহারী।
যাঁর সৃষ্টি বিচিত্র এ বিশ্ব অনুপম—
না জানি সে বিশ্বস্রষ্টা
কিবা নিরুপম।

বিশ্বস্রষ্টা

এই মহাবিশ্বে মহাকাশে গ্রহতারা-চন্দ্রসূর্য
নীহারিকাপুঞ্জ সবে ধাইয়া চলেছে
অন্তহীন আকাশের বুকে—
যুগ যুগ ধরে।
এ চলার বিরতি হবে না কভু—
ধাইয়া চলিবে চিরদিন তরে।

কার সৃষ্ট এ বিচিত্র বিশ্বচরাচর?
উর্ধ্ব-অধঃব্যাপী সীমাহীন মহাশূন্য
রচনা কাহার?
কেবা সেই বিশ্বস্রষ্টা কোথা তাঁর বাস?
এ চিন্তার নেই কোন শেষ।
বিচিত্র এ বিশ্বরূপ করিয়া দর্শন—
বিস্ময়ে নির্বাক হয় বিশ্ববাসীগণ।
বাগানের সৌন্দর্য দেখিয়া সবে
মুগ্ধ হয়ে রয়—
বাগানের মালিকের খোঁজ নাহি লয়।
যিনি রচেছেন এই বসুধা বিপুল—
তাঁহারে জানিতে মন হয়েছে আকুল।
মায়াধীশ স্রষ্টা তাঁর মায়া আবরণে
রেখেছেন মুগ্ধ করি মানবসন্তানে।
তাঁর কৃপা হলে মায়া-আবরণ ঘুচি গেলে—
দিব্যদৃষ্ট লভি তাঁর দর্শন হইবে।
কৃপা বিনা দর্শন হবে না কোনকালে।
সে কৃপার তরে যুগ যুগ ধরে সাধনা করেন বিশ্বজন
কাতর অন্তরে—
মায়া-আবরণ দূর করি দেখা দাও
কৃপাময় হরি,
স্থান দিয়া তব শ্রীচরণে
সার্থক করিয়া লও আমার জীবনে!

বাঁশী

রাখাল ছেলে গোচারণে গাছের ছায়ায় বসি
বাজায় বাঁশের বাঁশী।
ছয় ফোকরের বাঁশী ধরি দুইটি হাতের মাঝে
বাজায় রয়ে রয়ে সকাল হতে সাঁঝে।
প্রান্তর আর বনের নীরবতা—
বাঁশীর উদাস সুরে হারিয়ে যায় কোথা।
একলা বসে রাখাল তার সুরের তরী বায়—
কোন সে অজানায়!

আকুল করা বাঁশীর রবে পথিক ভোলে
কোথায় যাবে—
থামিয়ে চলা স্তব্ধ হয়ে দাঁড়ায় কিছুক্ষণ।
বাঁশের বাঁশী রাখাল ছেলের অতি আপন জন—
তারই সাথে কাটায় নিতি গোচারণের ক্ষণ।
মোহন-সুরে বাজে বাঁশী আকুল করি মন—
সেই সুরেতে মুগ্ধ করি ফিরায় ধেনুগণ।
দিনের শেষে ফিরে আসে ক্লান্ত বাঁশী হাতে—
ধেনুগণের সাথে আপন গ্রামের পথে।
বাঁশীর সুরে মনে পড়ে বেণুধরের স্মৃতি—
উদাস-করা বাঁশীর গানে
চলে যেতো গোচারণে
মা যশোদা কাতর প্রাণে
দিতেন অনুমতি।
বাঁশীর তানে জাগায় প্রাণে
সেই গোকুলের স্মৃতি।

বধু

বাঙলার গ্রামে গ্রামে আজও দেখি বধুগণে
শান্ত ধীর অচঞ্চল মনে—
নিত্যকর্ম করে রাতে দিনে।
স্বামীর সংসারে লক্ষ্মীশ্রীমণ্ডিত করিবার
চেষ্টা করি চলে প্রাণপণে।
স্বামী আর শ্বশুর-শাশুড়ীগণে সেবা করে রাতে দিনে
ক্লান্তিহীন মনে—
অন্তরের আনাবিল স্নেহধারা
ঢালি দেয় তাঁদের চরণে।
ঘরে আছে যত পোষাপ্রাণী তাহাদের সেবা করে
অকাতরে প্রাণমন ঢালি।
ঘরে ও বাহিরে চলে নিত্যকর্ম তার—
স্বামীর সংসার তার বড় আপনার।
ক্রমে বধু মাতৃত্ব লভিয়া—
আপন সন্তানগণে সেবা করে আপনা ভুলিয়া।
সুকঠোর পরিশ্রম করি তৃপ্ত করে
সংসারের সকল জনেরে আপন জানিয়া।

বাঙলার গ্রামবধু বিতরে মাতৃত্ব-মধু
শান্ত মনে সংসারের প্রতি জনে জনে।
সকলেরে তৃপ্ত করি সকলের শেষে
আপন ক্ষুধার অন্ন গ্রহণ করে সে।
বাড়িতে অতিথি যদি আসে—
তাদের সবারে সমভাবে সেবা করে যত্ন-সহকারে।
বধুর কোমল প্রাণ সংসারের প্রতিটি জনের লাগি
আপনারে করিবে সে দান।
গৃহলক্ষ্মী-স্বরূপিনী এই গ্রামবধু—
কোমল হৃদয়ে তার ভরা আছে মধু।
তার ব্যবহারে লক্ষ্মীমাতা বাঁধা থাকে
গ্রামের সে ঘরে।
বধুর কল্যাণে গৃহ লক্ষ্মীমন্ত হয়—
গৃহবধু সংসারের কেন্দ্রে স্থির রয়।

পথিক

সম্মুখে সুদীর্ঘ পথরেখা রয়েছে পড়িয়া—
পথিকেরা যায় চলি সে পথ বাহিয়া।
পথিকের এ চলার বিরতি হয় না—
ব্যস্ত জীবনের প্রয়োজনে রাতে দিনে
চলে আনাগোনা।
পথ বাহি চলে যারা তারাই পথিক—
চলিতে হইবে তারে দীর্ঘপথ হইয়া নির্ভীক।
আপন গন্তব্য পানে লক্ষ্য রাখি শান্ত মনে
ধীরপদে যাত্রা শুরু করি—
চলিতে হইবে তারে দীর্ঘপথ
ক্লান্তি পরিহরি।
অনুরূপ গতিময় জীবনের পথ—
জন্মকাল হতে শুরু হবে যে যাত্রার
শৈশব-যৌবন আর বার্ধক্যের পথে
চলিতে চলিতে—
অন্তিম লগন আসিবে যেখানে
যেতে হবে থেমে সেইখানে।

জীবনের পথে কতদূর যেতে হবে কার
জানে না কেহই—
মহাকালের ইচ্ছায় নিয়ন্ত্রিত হয়
প্রতি জীবের জীবন।
চলিতে চলিতে কালের আহ্বান শুনিবে যে-জন
থামিতে হইবে তারে ঠিক সেইক্ষণ।
জীবন-পথের পথিক আমরা যত প্রাণী—
জন্মলগ্ন হতে চলিতেছি জীবনের দীর্ঘপথ বাহি
নাহি থামি।
বিরতি হইবে এ চলার শুধু একবার—
কালের নিষ্ঠুর বাঁশী যখনি পশিবে আসি
যাহার শ্রবণে অর্ধপথে যেতে হবে থেমে।
জীবন-পথের এই মহাসত্য কালের আহ্বানে—
শির পেতে নিতে হবে মেনে।

সিদ্ধিদাতা

শুভ নববৎসরের মঙ্গল প্রভাতে—
ভগবান গণেশেরে পূজে হিন্দুগণ বিধিমতে।
গণেশের বধু কদলীবৃক্ষেরে যথাবিধি
গঙ্গাস্নান করাইয়া নববস্ত্রে বিভূষিতা করি—
স্থাপন করেন তাঁরে গণেশের বামে ভক্তি সহকারে।
যথাবিধি উপচারে পূজে ভক্তি-শ্রদ্ধা ভরে
ভগবতী জননীর স্নেহের সন্তানে।
মূষিক-বাহনে চড়ি কৈলাশ শিখর পরিহরি
আসেন গণেশ ধরাপর—
গ্রহণ করিতে পূজা মর্ত্যবাসীদের।
পূজা লভি সন্তুষ্ট অন্তরে প্রত্যেকের ঘরে অবস্থান করি—
পরম করুণাভরে সিদ্ধি দেন সকলেরে
যার যাহা অভিলাষ
সেই অনুসারি।
ভগবান গণেশের আরক্তিম দেহে
শ্বেতবর্ণ ঐরাবত হস্তীর মস্তক
শোভে অপরূপ সুষমায়—
শঙ্খ আর পদ্ম তাঁর ঊর্ধ্ব হস্তদ্বয়ে রয়
প্রসারিত নিম্ন হস্তে দেন বরাভয়।

প্রতি বৎসরের সূচনায়—
তাঁর আগমন এ ধরায়,
জগৎজনের 'পর এ কৃপার দৃষ্টি তাঁর
নহে ভুলিবার।

কালবৈশাখী

নিদাঘের খরতাপে ধরণীর বুক ফাটিয়া চৌচির—
মুহ্যমান যত ঘাসপাতা আর বৃক্ষলতা।
খাল-বিল-পুষ্করিণী উষ্ণতাপে শুষ্কপ্রায়—
রুক্ষ নিদাঘের রক্তচক্ষুর ছায়ায়।
প্রাণীকুল দাবদাহ সহিতে না-পেরে
বাদলের লাগি কাতর অন্তরে প্রার্থনা জানায়
বারে বারে—
রুদ্রের এ রোষদৃষ্টি সংবরণ তরে।
সহসা একদা এস্ত প্রাণীকুলে শঙ্কায় আকুল করি
রুদ্রের বিষাণ ধ্বনিত হইল ঘোর রবে।
বজ্রগর্ভ পুঞ্জপুঞ্জ মেঘদল ধাইয়া চলিল
বায়ুভরে—
মুহূর্মুহূ অশনিপতন ঘোষণা করিল
কালবৈশাখীর আগমন।
এস্ত রাখালেরা ধেনু লয়ে গৃহমুখে ধায়—
পথিমধ্যে পথিকেরা ভীতমনে চঞ্চল চরণে
খুঁজি ফিরে আশ্রয় কোথায়।
ঘোর কৃষ্ণ অন্ধকার মুহূর্তে ছাইল আকাশ-মেদিনী—
রুদ্ধদ্বার গৃহে গৃহস্থেরা স্মরিছে ঈশ্বরে
প্রাণে শঙ্কা গণি।
খেয়াপার জনহীন —
খেয়ামাঝি তরী রাখি তীরে ধায়
আশ্রয় আশায়।
নদীবক্ষ ফেনিল উচ্ছ্বাসে দু'কূল ছাপায়।
পথিপার্শ্বে বৃক্ষশাখা ভাঙি মাটিতে লুটায়—
দিশাহারা পথিকেরা ছুটে চলে আশ্রয় আশায়।
ভীত পশুপক্ষী যত কাতরে আশ্রয় খুঁজি ফিরে—
ভগ্ন বৃক্ষশাখা ত্যজি নিরাপদ আশ্রয়ের তরে।

প্রকৃতির অমিত শক্তির কাছে কত তুচ্ছ মানুষ ও প্রাণী—
কালবৈশাখীর রুদ্রলীলা হেরি
মনেপ্রাণে এই সত্য মানি।

গাঁদাল লতা

প্রাচীরের গায়ে গাঁদালের লতাগুলি
প্রভাত হাওয়ায় দোল খায়—
রবির কিরণে অপরূপ হরিৎ বরনে
প্রাচীর জুড়িয়া আছে অপূর্ব শোভায়।
কটুগন্ধভরা এই গাঁদালের পাতা—
গুণের লাগিয়া তার আদর সর্বথা।
ভেষজের তরে এই পাতা ব্যবহার হয়—
রন্ধনেতে গুণ লাগি গৃহস্থেরা খায়।
কটুগন্ধ সহ্য করি সমাদর করে সবে
গাঁদাল পাতারে—
রক্ত পরিষ্কার করি এ পাতার রস
বাড়ায় রক্তেরে।
গুণের বিচারে তিক্ত নিমপাতা আর
এই গাঁদাল পাতার সমাদর—
নির্গুণ সুন্দরে কেহ করে না আদর।

দ্বৈত জীবন

সংসারে আসিয়া জীবগণ আপনার জৈব প্রয়োজনে
গ্রহণ করেন দ্বৈত জীবন।
মানুষেরা বহু যত্নে বহুল চেষ্টায়
নির্বাচন করি আনে আপন সঙ্গিনী
কিংবা সঙ্গীগণে।
জীবনসঙ্গীরে লয়ে জীবন কাটায়—
সুসময়ে দুঃসময়ে সর্ব অবস্থায়।
তাহাদের মিলিত ইচ্ছায় পুত্রকন্যাগণ আসে
তাহাদের স্নেহের ছায়ায়।

সাধ্যমত চেষ্টা করে সন্তানেরে সুশিক্ষা দানিতে—
সংসার জীবন তাহাদের সুন্দর করিতে।
পিতামাতা উভয়ের সম ব্যবহার
সার্থক করিয়া তোলে সন্তানের জীবন তাহার।
ভাগ্যবান সে সব সন্তান যাহাদের পিতামাতা
সমচিন্তা সমচেষ্টা দিয়া লালন করেন
আপন সন্তানে—
জীবন তাদের ভরি ওঠে অপার কল্যাণে।
কিন্তু যদি বিরূপ ভাগ্যেতে দ্বৈত জীবনের মাঝে
যথার্থ মিলন নাহি হয়—
সেই দুই জীবনের বিফল ক্রন্দনে
সে দ্বৈত জীবন ব্যর্থ হয়।
সেই দম্পতির সন্তানেরা মাতাপিতৃস্নেহে বঞ্চিত হইয়া—
জীবন ভরিয়া চলে ব্যর্থ-জীবনের
অভিশাপ বহন করিয়া।
দ্বৈত জীবনের সফলতা আর বিফলতা
নির্ধারিত হয় দৈবের বিধানে—
নিজ নিজ কর্মফল অনুসারে
দৈবের বিধান ব্যর্থতা ও
সার্থকতা আনে।

বিবাহ

বিবাহবন্ধন মানব জীবনে সম্পূর্ণতা আনে।
পুরুষেরে সৃজেছেন বিধাতা স্বয়ং অপূর্ণ করিয়া—
পূর্ণতা দানেন তারে নারীরে সৃজিয়া।
নারী আর পুরুষের অপূর্ণ জীবন
সার্থক করিয়া তোলে বিবাহবন্ধন।
সভ্যতার ঊষালগ্নে বৈদিক যুগের নরগণ—
অগ্নি আর নারায়ণে সাক্ষী করি
পত্নীরূপে নারীগণে করিত গ্রহণ।
আজিকার এই যুগে একই প্রথা চলিতেছে হিন্দুর সমাজে—
পুত্র আর কন্যাগণে নারায়ণ আর হুতাশনে
সাক্ষী রাখি বাঁধিতেছে বিবাহবন্ধনে।

মানবের একক জীবন নারী কি পুরুষ—
সার্থকতা লভিবারে পারে না কখন।
সংসারজীবনে একমাত্র বিবাহবন্ধন
আনি দেয় নারী ও পুরুষে সার্থক জীবন।
এ কারণে মানুষেরা আপনার সংসার জীবনে
বাঁধা রয় সুপবিত্র বিবাহবন্ধনে।
মাঙ্গলিক অনুষ্ঠান সহকারে
সংসার মাঝারে বিবাহ সাধিত হয়।
প্রতি ঘরে ঘরে।
আপন আপন পুত্রকন্যাগণে পিতামাতা যত্ন করি
বাঁধি দেন বিবাহবন্ধনে।
জীবনেরে সফল ও সার্থক করিতে—
বিবাহের প্রয়োজন হয় সংসারেতে।
পবিত্র অন্তরে ভগবানে স্মরণ রাখিয়া
বিবাহ করিতে হবে জীবনের
পূর্ণতা সাধিয়া।

প্রকৃতি

ঊর্ধ্বে মহাকাশ আর নিম্নে এই ভূপৃষ্ঠ ব্যাপিয়া
দেখি যেই বিপুলা প্রকৃতি
বিরাজিছে চরাচর জুড়ি—
বিস্ময় মানিতে হয় তাহার বিচিত্র রূপ হেরি!
ভূপৃষ্ঠ ব্যাপিয়া যতদূর স্থলভাগ আছে—
তাহার ত্রিগুণ প্রায় জলময় সাগরের দ্বারা
বেষ্টিত রয়েছে।
পাহাড়-পর্বত নদী আর নদ অরণ্য গভীর—
সব মিলি প্রকৃতির কী বিশাল রূপ!
স্তব্ধ বিস্ময়ের মাঝে মন রহে চুপ।
অতি ক্ষুদ্র মানুষ আমরা বিপুলা এ ধরণীর মাঝে—
প্রকৃতির সীমাহীন অপরূপ শোভা কী মহিমময়,
ভাবিতে হৃদয়ে জাগে অপার বিস্ময়।

ঊর্ধ্বে চাহি নিঃসীম নীলিমা মাঝে হারাইয়া যায় মন ধীরে—
অসীম অনন্ত শূন্যে কোটি কোটি গ্রহতারা নীহারিকা
কী বিপুল বেগে ধাইয়া চলেছে অবিরাম
দৃষ্টির বাহিরে।
হিমানী-কিরীট শিরে হিমাদ্রি-শিখর
রবির কিরণে জ্যোতির্ময় রূপ ধরি
বিরাজিছে নিজ মহিমায়—
শত শত নদী-নদ উৎসারিয়া তার বক্ষ হতে
চলেছে ধাইয়া সাগরের সনে
মিলন আশায়।
প্রকৃতির শান্ত রূপ অতি মনোহারী—
কিন্তু তার ভীম রুদ্র রূপে
বিশ্ববাসী কাঁপে থরহরি।
অগ্ন্যুৎপাত ভূকম্পন ঘূর্ণী ঝঞ্ঝাবায়ু
বন্যা আর অনাবৃষ্টি নাশে
মানুষের পরমায়ু।
মহাবিশ্বব্যাপী সীমাহীন প্রকৃতি সুন্দরী—
রহিয়াছে আপনার সৌন্দর্য বিস্তারি
অপরূপ মৌন-মুখর মহিমায়।
যাঁর সৃষ্ট এ বিরাট রূপ তিনি কিবা অপরূপ—
ভাবিয়া বিস্ময়ে প্রাণ
স্তব্ধ হয়ে যায়।

পুরুষ

লীলাময়ী বিশ্বপ্রকৃতি মাতিয়া আছেন আপন লীলায়—
সৃষ্টি-স্থিতি-প্রলয়ের মহাখেলা লয়ে।
অন্তহীন তাঁর এই খেলা বিরামবিহীন—
যুগে যুগে আবর্তিছে হইয়া নবীন।
মহাশক্তিময়ী এই বিশ্বপ্রকৃতি
সত্তার বুকের পরে করিছেন স্থিতি।
সত্তা তাঁর পাদপীঠ রূপে
ধারণ করিয়া আছেন তাঁহাকে।
সত্তা বিনা শক্তির এ লীলার প্রকাশ
কভু না সম্ভবে—
যুগলের মিলনেই পূর্ণতা আসিবে।

সত্তা পুরুষের রূপে নারীরূপা প্রকৃতির সনে
রহেন মগন দ্বৈত লীলায়—
একের অভাবে লীলা প্রকাশ না পায়।
উভয়ের মিলিত প্রকাশ হয় জীবগণ লয়ে মহাবিশ্ব মাঝে—
নর-নারী আর স্ত্রী-পুরুষ প্রাণী যত জগতে বিরাজে।
শিব রূপে সত্তা নিজে রহেন নিষ্ক্রিয়—
শক্তিরূপা প্রকৃতি তাঁহার সহায়ে
রহেন সক্রিয়।
এ দ্বৈত-লীলার প্রকাশ জগৎ ব্যাপিয়া—
শিবহীন শক্তি কোথা রহে না বাঁচিয়া।
অগ্নি আর দাহিকা-শক্তির মাঝে প্রভেদ কোথায়?
শক্তি আর সত্তা অভিন্ন রূপেতে আছেন সেথায়!
সর্পের তির্যক গতি সর্পেরই প্রকাশ—
সচল অচল রূপে আছে একই সাপ।
মুদ্রার উভয় পীঠ লয়ে এক মুদ্রারই স্বরূপ—
সত্তা আর শক্তির বিকাশ তারই অনুরূপ।
সত্তা আর শক্তির মিলনে মহাবিশ্বের সৃজন—
দ্বৈত শুধু "রূপে-নামে-ভাবে"
কিন্তু "বোধে" একজন।

ফুলকলি

প্রভাত-পাখির কূজনে যখন ধরণীতে
সাড়া জাগে—
ফুলকলিগুলি মুখ তুলি চায়
অরুণের অনুরাগে।
হেলিয়া দুলিয়া সমীরণ ভরে
প্রাণের পুলক প্রকাশিতে নারে—
রোধিবারে চাহে দল-বেষ্টনে
হৃদয়ের সৌরভে।
ধীরে অরুণের উজ্জল কিরণ
প্রকাশে গগন-ভালে—
সেই কিরণের পরশ লভিয়া
ফুলকলিগুলি হরষে মাতিয়া
একে একে সবে উঠিল ফুটিয়া
সুনীল গগনতলে।

হৃদয়ের ধন মধু-সৌরভ
ফুলের জীবনে অতুল বিভব—
বিলাইয়া দিল অকাতর প্রাণে
প্রভাতের সমীরণে।
ধন্য মানিল জীবন তাহার
দেবতা-চরণে দিয়া উপহার
আপন শ্রেষ্ঠ ধনে।
বিধাতা-চরণে হৃদয় সঁপিয়া
সার্থক হল ফুলকলি হিয়া—
মধু-সৌরভে প্রাণের ভক্তি
দেবতারে নিবেদিয়া।

নবীন

সৃষ্টির বিচিত্র লীলা এ বিশ্ব ব্যাপিয়া
আবর্তিছে যুগ যুগ ধরে—
পুরাতন বিদায় লইয়া নবীন আকারে
পুনঃ আসিতেছে ফিরে।
দিবসের বিদায়ের পরে রাত্রি নামে ভুবন জুড়িয়া—
সে রাত্রির শেষে পুনরায় দিবা আসে ফিরি
মধুর হাসিয়া।
সাগরের জলরাশি মেঘরূপে ওঠে ভাসি
নভোনীলিমায়—
সেই মেঘ বারিরূপে পুনরায় ফিরি চুপে
ধরণী ভাসায়।
একই জল নব নব রূপে খেলিয়া বেড়ায়।
সৃষ্টির মাঝারে যাহা কিছু পুরাতন যায় নিঃশেষিয়া—
তাহারাই আসে ফিরি নবীনের রূপ ধরি
নূতন হইয়া।
মৃত্যু আনে জীবদেহে মরণের পালা—
সে পালার অবসানে ফিরে আসে
সেই প্রাণ নবদেহ লয়ে নবীন হইয়া।

এ জগতে কোনকিছু হারায় না কভু—
ফিরে আসে বার বার নবরূপ লয়ে।
অরণ্যের ফুল পাতা ঝরিয়া আবার
নিশা শেষে ফিরে আসে
নবীনের বেশে।
বিশ্বস্রষ্টা আপনার লীলায় মাতিয়া
খেলিছেন ভুবন ব্যাপিয়া—
সৃষ্টি-স্থিতি-প্রলয়ের খেলা।
পুরাতনে নিঃশেষিয়া তাহাদের নববেশে
পুনরায় আনি ফিরাইয়া—
করিছেন অভিনব লীলা।

প্রাচীন

সৃষ্টির এ বিচিত্র নিয়ম—
প্রাচীনের বুকে নবীনের আগমন।
প্রাচীনের হৃদয়-বিভব উজার করিয়া
দিয়া নবীনের বাড়ায় গৌরব।
প্রাচীনের বীজ হতে অঙ্কুরিত হয় যত নবীন সৃজন—
প্রাচীনের যতকিছু সকলই লভিয়া
সার্থক হইয়া ওঠে নবীন জীবন।
প্রাচীনের পাদপীঠে ভিত্তি করি
নবীন আসিয়া দাঁড়ায় সেথায়—
প্রাচীনের সহায়ে নবীন সার্থক হইয়া ওঠে
নিজ মহিমায়।
এ বিপুল মহাবিশ্ব জুড়ি সৃষ্টির নিয়ম
বহিতেছে অবিরাম একই ধারায়—
পুরাতনে সরাইয়া ধীরে ধীরে নবীন
আসিয়া দাঁড়ায় সেথায়।
যে ফুল ঝরিয়া গেল বিগত সন্ধ্যায়—
সে তরুর শাখে উষার আলোকে
দেখা দিল নব কুসুমের রাশি অপূর্ব শোভায়।

পক্কশস্য আপনারে নিঃশেষে দানিয়া—
ধরাবক্ষ ভরি দেয় নবীন হরিৎ শস্য দিয়া।
নদ-নদী-স্রোতস্বিনী অবিরাম বেগে বহি
মিশায় তাহার বারিরাশি সাগরের সনে—
পর্বত-শিখর-উৎস হতে নব জলরাশি আসি
পূর্ণ করে পুরাতন স্থানে।
শীতের শিশির ঝরাইয়া দেয় পুরাতন পত্ররাশি
যত বৃক্ষশিরে—
বসন্ত আসিয়া পুনঃ সেই বৃক্ষসব
ভরি দেয় নব পত্রভারে।
জীবনের যত অভিজ্ঞতা আনন্দ-বেদনা রূপে লভিয়াছে
পুরাতন আপন জীবনে—
সে সকলে সযতনে দান করে নবীনেরে
সার্থক করিয়া দিতে তাহার জীবনে।

বিশ্বজননী

আনন্দরূপিনী তুমি হে বিশ্বজননী,
আপন আনন্দে মাতি বিশ্বপিতা সনে
প্রকাশিছ আপনাকে অপরূপ মহাবিশ্বরূপে।
"রূপে-নামে-ভাবে" আকাশ মেদিনী আর
প্রাণীগণ মাঝে সৃজিয়াছ আপনাকে—
আবরিয়া আপন স্বরূপে।
মহাকাশে যত রবিশশী গ্রহতারা পুঞ্জপুঞ্জ নীহারিকা সনে
ধাইয়া চলেছে অবিরাম
সে সবার রূপে প্রকাশিছ আপনাকে
আত্মানন্দে পূর্ণ করি প্রাণ।
শক্তি আর চেতনার যুগল প্রকাশে
প্রকাশিছ তুমি ভুবন ব্যাপিয়া
বহু রূপে বহু নামে বহু ভাবে প্রাণী মাঝে
আপনারে প্রচারিয়া।
ওগো লীলাময়ী, অপার আনন্দে মাতি খেলিতেছ অবিরাম
সৃজন-পালন আর বিনাশের খেলা, ক্লান্তিহীন
যুগে যুগে অন্তহীন লীলা।

আমার মাঝারে অন্তরে-বাহিরে প্রকাশিছ তুমি—
জন্মলগ্ন হতে মোর মাঝে তোমার প্রকাশ
যত কথা যত কাজ আনন্দ-বেদনা
সকলই তোমার রূপ তোমার চেতনা।
বিশ্বজুড়ি সকল প্রাণীর মাঝে তোমারই প্রকাশ—
তোমার চেতনা হতে লভিছে চেতনা বিশ্বময় যতেক চেতন।
শক্তিমান তারা তোমার শক্তিতে অনুক্ষণ।
তোমার আনন্দধারা ভুবন ভরিয়া সকল প্রাণীর প্রাণে
জাগাইছে আনন্দের সাড়া।
হে বিশ্বজননী, চির-আনন্দরূপিনী,
অপার আনন্দে মাতি প্রকাশিছ আপনাকে
ক্ষুদ্র-খণ্ড অণু-পরমাণু হতে বিশাল বিপুল
মহিমার রূপে।
যত রূপ যত নাম যত ভাব রহিয়াছে
এ বিশ্বজগতে
সে-সকল মাঝে তুমি
প্রকাশিছ আপনাকে,
আপন লীলায় মগ্ন রহি আপনাতে।

বর্ষা

আজি প্রভাত হইতে ঝরিছে বারি
রিম্‌ঝিম্ রিম্‌ঝিম্।
ওই আকাশের বুকে মেঘের মেলা
যেন সূর্যেরে ঘিরে করিছে খেলা
যত বর্ষারানীর চপলা বালা
হরষ ভরে অসীম।
বুঝি তাদেরি কটিতে কিঙ্কিনী বাজে
রিম্‌ঝিম্ রিম্‌ঝিম্।
আজি নীপশাখা 'পরে লক্ষ কুসুম
কেশর ফুলায়ে ওঠে;

ওই ক্ষুদ্র তটিনী কল-কল-কলে—
যেন উদ্দাম হয়ে যৌবন-বলে
যত বন্ধন-বাধা দু'পায়েতে দলে
সম্মুখ পানে ছোটে—
বুঝি মিলনের তৃষা মিটাইতে চাহে
অসীমের পদে লুটে!
আজি উতল হয়েছে পরান মোর
বর্ষার শোভা হেরি—
ওই ঘনকৃষ্ণ অম্বুদ মাঝে
যেন শ্যামসুন্দর-বদন বিরাজে,
যত বিদ্যুৎ হাস্য তাঁর যে,
নয়ন চকোর-চকোরী।
বুঝি মেঘ-গর্জনে পাঞ্চজন্য
ঘোষিছে আহ্বান তাঁহারি।

প্রেম

ভালবাসি তোমারে যে আমি—
তাই ভাল লাগে এ ধরারে।
বর্ণে-গন্ধে-কিরণে উজ্জ্বল—
এ ধরণী প্রকাশে তোমারে।
শীতের শিশিরসিক্ত ফুলকলি,
বরষার নব মেঘভার,
বসন্তের মৃদু সমীরণ—
প্রাণে আনে আভাস তোমার।
প্রকৃতির নিত্য-নবরূপে
তোমার অনন্ত রূপ হেরি—
ধরণীরে ভালোবেসে তাই
মোর প্রেম চরিতার্থ করি।